SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.

Chief Editor : Dr. Jaygopal Mandal
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

ISSN:2394 4889 Vol : IV, Issue : VII 20th March 2018

প্রস্তাবিত আগামী পদক্ষেপ

পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অকাডেমি সভাঘরে আগামী ২৬শে মে ২০১৮, শনিবার সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ৯টা অবধি অনুষ্ঠিত হবে। সাহিত্য অঙ্গন সাহিত্য সম্মান প্রদান করা হবে কবি ও প্রাবন্ধিককে।

Published by : *Dr. Jaygopal Mandal,* C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara, Hirapur, Dhanbad, Jharkhand, Phone : 09830633202/09570217070
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com
sahityaangan@gmail.com, Website : www.sahityaangan.com

সাহিত্য অঙ্গন — ড. জয়গোপাল মণ্ডল

সাহিত্য অঙ্গন

ISSN:2394 4889
Vol : IV, Issue : VII
20th March 2018
DIIF Impact Value :1.028
Frequency : Halfyearly

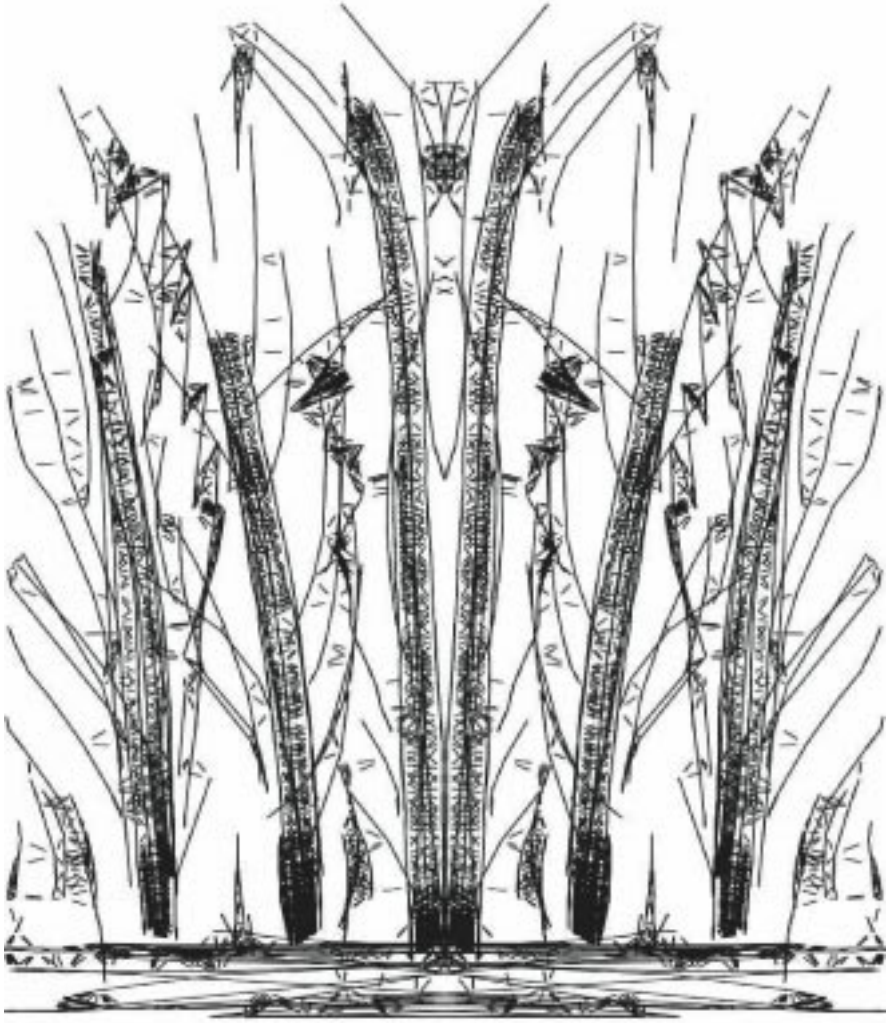

সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य अंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : IV, Issue : VII, 20th March, 2018

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : IV, Issue : VII, 20th March 2018

Chief Editor :

Dr. Jaygopal Mandal

C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,

Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

Advisory Board :

Dr. Tapas Basu, Dr. Prakash Kumar Maity, Dr. Suranjan Middey, Dr. Suman Gun, Dr. K. Bandyopadhyay, Dr. M. M. Panja, Professor A. Ghosal, Dr. A. Bhattacharya, Dr. N. Ghosal, Dr. J. N. Singh

Assistant Editor :

Dr. Kutub Uddin Molla, Dr. Samaresh Bhowmik, Dr. Mausumi Saha, Dr. Subhankar Roy.

Working Editorial Board :

Dr. Manaranjan Sardar, Jayanta Mistri, Sampa Basu, Dr. Soma Bhadra, Dr. Debashree Ghosh, Dr. Sovana Ghosh, Dr. Sandip Mondal, Dr. B. N. Singh, Dr. R. Pradhan, Dr. N. K. Singh, Dr. D. K. Singh.

Members from the other Countries :

Dr. Gulam Mustafa (Chittagong University, BanglaDesh)

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, BanglaDesh)

Professor Himadri Sekhar Chakraborty (USA)

Professor Barsanjit Mazumder (USA)

© Dr. Jaygopal Mandal

Cover : *Krishnadhan Acharyya*

Type Setting :

Manik Kumar Sahu,

Kolkata - 152

Phone : 9830950380

Price : R 100.00

Published by :

Dr. Jaygopal Mandal

C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,

Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

Phone : 09830633202/09570217070

E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com

Website : www.sahityaangan.com

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন এবং শিশু সাহিত্যিক রাসবিহারী দত্ত। পত্রিকার পক্ষ থেকে এই দুই সাহিত্যিককে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁদের প্রয়াণে আমরা বাক্‌রুদ্ধ।

অধ্যাপক, কবি, প্রাবন্ধিক ও কথা সাহিত্যিক ড. সোহারাব হোসেন
জন্ম : ২৫ নভেম্বর ১৯৬৬, মৃত্যু : ২রা মার্চ ২০১৮

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সংসদের সর্বভারতীয় সম্পাদক, কবি ও প্রাবন্ধিক ড. রাসবিহারী দত্ত
জন্ম : ১৭ এপ্রিল ১৯৪৯, মৃত্যু : ১৩ মার্চ ২০১৮

প্রসঙ্গ

সভ্যতার ঝকঝকে চকচকে শিখরে যেন পৌঁছে গেছে শরীর। তবুও এ বড় সুখের সময় নয়, জীবনের চোরাস্রোতে আনন্দ উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে মরুঝড় থেকে বাঁচতে চাইছে। কঙ্কালের শরীরে ঘুন লেগেছে। কঙ্কালের আত্মা, তাঁর দর্শনে ঘুন লেগেছে কি? — মৃত্যুর ভিতরে প্রবেশ করে মৃত্যু। দীর্ঘ লালিত মৃত মূর্তি সশরীরে প্রতিবাদের মুখোশে ধ্বংস হয়। যারা বুলডোজার চালায়, মাকড়সার গানও শোনে না, শোনে না মশাদের বাঁচার সঙ্গীত—জোনাকির আলোয় যতটুকু আশা জাগে তাও তাদের ধমনীতে ঈর্ষার আগুন ধরায়।

গণতন্ত্রের তন্ত্রে লেগেছে যাদুকরের কাঠির ছোঁয়া। গণ শুধু শোভা পায় চাটুকার রাজনীতিকের নকশা করা টুপিতে—ভুরি ভুরি মদ মাখানো মালা হাতে বিবাহের বাসর সজ্জা হয় মধ্যরাতে। পরদিন প্রাতে শীতের কুয়াশা না থাকলেও রহস্যময়তায় প্রকাশিত হয় সিংহাসন দখলের খবর। কত রং কত মেকি আনন্দ বাজনার তালে তালে মুখরিত করে নতুন জ্যোতিষ্কলোক। শিশুর শরীরে যৌন উল্লাসের হুল ফোটায় পুরুষ-জানোয়ারের পৌরুষ, আবার সেই শিশুই বয়ে নিয়ে যায় মড়কের মড়া শ্মশান ঘাটে। 'বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ' বরণ করে নবাগত রাজাকে। পা-থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে তার অধিকন্তু ভোগে —মহুয়ার গন্ধে ম' ম' করে রাজপথ —ফুটপাতে যারা শুয়েছিল আজ রাতে, তাদের আসন বদলে যায়। রাতারাতি পরিবর্তিত হয় সঙ্ঘের সাইনবোর্ড।

শাসকের রঙে সবাই একই পোশাক পরে। চেনা যায় না কে ছিল কার সাথে। শুধু মতবাদবাহী বাঁশের মাচা, সে একাই পড়ে থাকে চিতার পাশে—কান্নার আওয়াজ পৌঁছতে পারে না গামুইদের কর্ণকুহরে। মাচা থেকে খুলে নিয়ে শক্তপোক্ত বাঁশ—বেদড়ম পিটতে থাকে ; যে চলে গেছে সিংহাসন থেকে নিমতলা ঘাটে, কিংবা অন্য কোনো সীমানায়। কবি বলেন,

"অনেকদিন আমরা ভোগ করিনি চুম্বন মানুষের
অনেকদিন গান শুনিনি মানুষের
অনেকদিন আবোলতাবোল শিশু দেখিনি আমরা
আমরা অরণ্যের চেয়েও আরো পুরোনো অরণ্যের দিকে চলেছি ভেসে"।

—এ কোন সভ্যতার দিকে আমাদের যাত্রা? তোমার মত আলাদা, পথ আলাদা, তুমি তাই আমার শত্রু, তোমার স্থান মৃত্যুর ভেতরে মৃত্যু। তাই যতক্ষণ না তোমার চুলের ঝুঁটি টেনে নামিয়ে দেবো রাস্তায়, ঘুন ধরা শরীরের থেকে খুলে ফেলব দর্শন—ততক্ষণ তুমি দু'হাত তুলে মৃত্যুকে কুর্নিশ জানাবে। আমি বলব, 'হ্যাণ্ডস আপ'। বহুদিন করেছ বাস এ পৃথিবীতে—এবার আমি ভোগ করব। আমিই শাসক, ইন্দ্রজাল আমারই আঙুলে জড়ানো। আয়না আমরা দেখি না, আমরা প্রতি যুগের শোষক।

তবুও চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে মৃত্যুর ভেতরে বেঁচে আছেন ভাষা ও সাহিত্যের সুযোগ্য আলোচক উজ্জ্বল মজুমদার। তাঁর পথ কারো মত নাও হতে পারে। কিন্তু তাঁর মত কোনো পথের সন্ধান দিতে পারে। একটা ভ্রম থেকে গত সংখ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে না পারার বেদনা কুরে কুরে খায়।

চেনা বিষয়ের মধ্যে যিনি আবিষ্কার করেন নতুন চেতনা, নতুন বোধ, তিনিও হয়ে গেলেন ছবি, অকালে— তাঁর শাশ্বত মূর্তিতে সময় ও কালের রথচক্রে ঘটে যাওয়া আলোড়ন রূপ পায় লোকজ ভুবনের কারুকার্যে। কোন্ অলৌকিক শক্তি আছে এমন মৃত মূর্তির শাশ্বত চালচিত্রে কালি মাখায়।

জীবনের খেলাগাড়ি—খেলাবাড়ি নির্মাণে যিনি শিশুর শৈশবকে মহীরূহ করেন, সেই রাসবিহারী দত্ত তো শাসকের অঙুলে জড়ানো ইন্দ্রজালকে যেন এক লহমায় ছিঁড়ে ফেলতে পারেন। এবারের বোধ তাঁদের জন্য তাঁদের মৃত্যুর পরপারে সজীব মর্মরে উৎসারিত।

ড. জয়গোপাল মণ্ডল
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সূচি

প্রবন্ধ

আশিস সান্যাল

রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-ভাবনা ৯

শোভনা ঘোষ

এক স্বকণ্ঠ সন্ধানীর বিদ্রোহ ও অনুতাপ ১৬

সমীর মৈত্র

রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতা ও কিছু কথা ২৪

মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা

'রথের রশি'র রবীন্দ্রনাথ ৩০

মনোজ মণ্ডল

রবীন্দ্রনাথের লোক উপাদান সংগ্রহ ও পদ্ধতি ৩৪

বিশ্বজিৎ পোদ্দার

'লালনদর্শন ঃ গানের পথে' ৪৩

অভিজিৎ গাঙ্গুলী

যানে লবেজান হেন শিব্রাম ৫০

কবিতা ৫৯

তাপস রায়, সৌমিত বসু, নির্মল করণ, সুভাষরঞ্জন দাস, সুমন গুণ, সুশীল মণ্ডল, নির্মল সামন্ত, শ্রীজয়,তন্ময়ঘৃতকৌশিক চক্রবর্তী, তরুণ কুমার চৌধুরী, অলোক দাশগুপ্ত, অমরেশ বিশ্বাস, রবীন বসু,তাপস মাইতি, নীল রায়, চৌধুরী নাজির হোসেন, শঙ্খ অধিকারী, রমেশ পালিত, অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ত্রিদিবেশ চৌধুরী, অচিন মিত্র

প্রবন্ধ

চন্দনা মজুমদার

দিনেশ দাসের কবিমানস ও কবিতা ৭৫

পঞ্চানন নস্কর

লিঙ্গবৈষম, নারী ও সমাজ ঃ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা ৮৪

মনোরঞ্জন সরদার

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৯৩

ছোটো গল্প

সোহারাব হোসেন

ভেজা তুলোর নৌকা ১০০

রাসবিহারী দত্ত

খেলনা বাড়ি ১১৩

আনসার উল হক

নগর বাউলের চিঠি ১১৬

অনুষঙ্গ ঠাকুর

কে চোর? বলতো খুকি ১২১

সাহানারা খাতুন

মিনির রবীন্দ্রনাথ ১২৫

মদনচন্দ্র করণ বিদ্যালঙ্কার

ফেক্‌বুক্-ফেক্-লভ্-ফেক সোসাইটি ১২৭

প্রবন্ধ

মৌসুমী সাহা

'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প ঃ মানবমনের আখ্যান' ১৩৩

দেবশ্রী ঘোষ (বিশ্বাস)

চারণভূমি : ব্রাত্যজীবনের আত্মদর্শন ১৩৭

সাগরিকা ঘোষ

খাঁচার পাখির মুক্তি-উড়ান : প্রসঙ্গ 'হেমন্তের পাখি' ১৪৪

পীযূষ কান্তি অধিকারী

প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি চর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫১

সোমনাথ চক্রবর্তী

সমাজভাষা : প্রসঙ্গ আধিপত্য ১৫৫

রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-ভাবনা

আশিস সান্যাল

'মনে পড়ে আমাদের শারদ্যোৎসবের মহড়া প্রথম দিকে শুরু হয়েছিল দ্বারিক বাড়ির দোতলায়। দিনদা রোজগানগুলি দেখাতেন। গানে, অভিনয় করতেও প্রথম দিকে তিনিই শেখাতেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে আনন্দের ভাব প্রকাশ করে দাঁড়িয়ে উঠে গানগুলি আমাদের সঙ্গে গাইতেন... রবীন্দ্রনাথ গাইতে গাইতে দেখাতেন দু'হাতে কেয়াপাতার নৌকা গড়ার ভঙ্গি। তারপরে বাঁ হাতে যেন নৌকোটি ধরে ডান হাতে তাতে ফুল সাজাচ্ছেন, তারপর আবার দু'হাতে নৌকোটি ধরে দোলাতে দোলাতে গান গাইছেন ''চলবে দুলে দুলে''। এইভাবেই অল্প অল্প করে ভাবের নৃত্য শিখেছি আমরা তাঁরই কাছে'—অমিতা সেন : 'নৃত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ'।

ললিতকলাকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অন্যতম বাহন হিসেবে মনে করতেন। তাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি ললিতকলাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ঃ আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকি। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ করেছিলাম, সাধারণ মানুষের চিন্তাবর্গের বাইরে তার লক্ষ্যও ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে, তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থায় অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়।' এই ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকলার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে নৃত্যের যে স্বীকৃতি তিনি দিয়েছিলেন, তারই ফলশ্রুতি আজকের নৃত্যের অনুশীলন। তাঁর নৃত্য ভাবনায় ছিল ভারতীয় নৃত্যকলার অনুসরণ। কিন্তু তার সঙ্গে তিনি যুক্ত করে দিলেন বিশ্বের বিভিন্ন ভাবধারায় প্রতিপালিত নৃত্যধারাকে। 'জাভাযাত্রার পত্র' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে একটি চিঠির উল্লেখ করেছিলেন। চিঠিটি হলো— এদেশে উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ নাচ। এখানকার না নারকেলবন যেমন সমুদ্র হাওয়ায় দুলছে, তেমনি দেশের সমস্ত মেয়ে পুরুষ নাচের হাওয়ায় আন্দোলিত। এক একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক একটি বিশেষ পর্ব থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল, সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে তাকেই সঞ্চারের পথ পেয়েছে। এখনো সেটা লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা বলতে চায়। তখন সে নাচিয়ে তোলে, মেয়ে নাচে, পুরুষ নাচে....বিশুদ্ধ নাচও আছে।'

রবীন্দ্রনাথ নৃতের প্রচলন ও উন্নয়নে সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নৃত্যকলাকে নিয়ে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ কোনও মৌলিক নৃত্যধারার প্রবর্তন করেননি। নিজস্ব নৃত্যভাবনা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে তাঁর নৃত্য। শান্তিদেব ঘোষ একটি চিঠিতে বলেছেন; '...শান্তিনিকেতনের নাচের ব্যবস্থা দ্বারা কেবল নাচিয়ে

 Vol. IV Issue-VII / ISSN : 2394-4889

তৈরি করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদ্যা সমাজ জীবনকে যেমন উন্নত শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও যেন তাই করে।' ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তাঁর জীবনকালে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার প্রখ্যাত শিল্পীদের এনে নৃত্যশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু শান্তিনিকেতন প্রযোজিত নৃত্যধারার ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে ভিনদেশী নৃত্যধারায় সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার জটিলতা থেকে সুস্থ সহজ ছন্দে নৃত্য প্রয়োগের প্রথম পর্বে সর্বদা দক্ষ শিল্পীদের না পাওয়ায় তিনি নিজেই অনেক সময় নৃত্য শিক্ষা দিতেন। লোকনৃত্যকেও তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন কোথাও কোথাও।

১৮৮১ সালে 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য রচিত হয়। এই গীতিনাট্যে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এখানে থেকেই কবির মনে নৃত্যনাটকের বীজ অঙ্কুরিত হতে দেখা যায় তাঁর মধ্যে। ইংলণ্ড প্রবাসের অভিজ্ঞতা লক্ষ্যও করা যায় তাঁর মধ্যে। কারণ, তখন তাঁর মধ্যে ইউরোপীয় সঙ্গীত ও নৃত্যধারার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। তিনি বিলাতের বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে নিয়মিত যেতেন এবং সঙ্গীত সভায় অংশ নিতেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন — 'আমরা যেদিন ফ্যান্সিবলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলাম। কত মেয়েপুরুষ নানা রকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিলেন।....গত মঙ্গলবার আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। ইংরেজিনাচ দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক রকম হচ্ছে স্ত্রী পুরুষ মিলে ঘুরে ঘুরে নাচ, তাতে কেবল দুইজন লোক একসঙ্গে নাচে। আরেক রকম নাচে চারটি জুড়ি নর্তক নর্তকী...হাত ধরাধরি করে নানা ভঙ্গিতে চলফেরা করে বেড়ায়।...একটা ঘরে, সবে করো, চল্লিশ-পঞ্চাশ জুড়ি নাচছে, ঘেঁষাঘেষি, ঠেলাঠেলি, কখনো বা জুড়িতে জুড়িতে ধাক্কাধাক্কি। তবু ঘুর-ঘুর-ঘুর। তালে তালে বাজনা বাজছে। তালে তালে পা পড়ছে, ঘর গরম হয়ে উঠছে, (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, তৃতীয় পত্র)।

এই নৃত্যে কোনও কোনও উচ্চ সৌন্দর্য-চেতনা ছিল না। তবে ১৮৯০ সালে ইংলণ্ডে বসবাসকালে 'গন্ডোলিয়ক্স' অপেরা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নৃত্যভাবনাকে এই অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো। তিনি তাঁর নৃত্যভাবনায় ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তবে কত্থক নৃত্যধারা তাঁকে তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তিনি এই নৃত্যধারাকে মনে করতেন স্থূল অধিকসর্বস্ব নৃত্য। প্রতিমা দেবী এ সম্বন্ধে লিখেছেন— 'বিশুদ্ধ সৌন্দর্য রসের তাৎপর্য এমন সূক্ষ্ম পরিমাপনীর উপর দাঁড়িয়ে আছে যে তার কোনদিকে একটু স্থূলতার ভার চালালে গতি নিম্নগামী হবে। এই আশঙ্কায় অনেকগুলি প্রচলিত নৃত্যরীতিকে আমরা স্বীকার করিব।'

নৃত্য সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গিই রবীন্দ্র নৃত্য ভাবনাকে পরিপুষ্ট করেছিলো। তবে সে সময়ে তিনি এই পরিকল্পনাগ্রহণ করেছিলেন, তা এক অর্থে ছিলো দুঃসহাসিক। কারণ, তখন

বাঙালি সমাজ নৃত্যের কথা শুনলেই ভাবতেন একটা অশালীন বেলেল্লাপনার কথা। নাচ বলতে তখন তারা বুঝতেন, বাঈজিদের দেহভঙ্গিমা, কটি ও নিতম্বের দোলচাল, রাত্র-জাগা ফুলের মালায়ও কামের গন্ধ। বাড়ির ছেলে মেয়েরা নাচবে এ যেন ভাবতেই পারত না সেই সমাজ।

১৯২১-২২ সালে রঙ্গমঞ্চে 'সাগরনৃত্য' প্রদর্শন করে রেবা রায় প্রায় এক ঘরে হয়ে গিয়েছিলেন। 'নটীর পূজা' নাটকটির কথাও প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে। নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী এই নাটকে অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকে ভিক্ষু পাগল ছাড়া সব চরিত্রই ছিলেন নারী চরিত্র। নাটকে গান ছিলো ১১টি। শেষ গানটি হলো—

আমায় ক্ষমো হে যক্ষ্ম, নমো হে নমো
তোমায় স্মরিহে নিরুপম
নৃত্যরসে চিত্ত সম
উছল হয়ে বাজে।

গৌরী দেবীর অসামান্য নৃত্য ভঙ্গিমা এই গানের সঙ্গে সকলকে মুগ্ধ করেছিলো। বীণা বসু এর স্মৃতিচারণা করে বলেছেন : 'নটীর পূজা হলো জোড়াসাঁকোর উঠোনে। কবি এসে বসলেন স্টেজের একপাশে। কি চমৎকার অভিনয়—কি নাচগান। দিনদা বসেছেন পেছনে গানের দল নিয়ে, নন্দলাল বসুর কন্যা গৌরী দেবী 'মাস হে মাস' নাচলেন। কলকাতাবাসী স্তম্ভিত। মুগ্ধ। সেই প্রথম বোধ হয় মেয়েরা প্রকাশ্যে নাচলেন। কত সপক্ষ বিপক্ষ সমালোচনা নানা সংবাদপত্রে—কিন্তু যাঁরা দেখলেন, তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ। কিন্তু তখনো পর্যন্ত নারী পুরুষের একসঙ্গে অভিনয় করার সাহস হয়নি বঙ্গীয় সমাজের।'

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে সব সব সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তার থেকে 'নাচঘর' পত্রিকার একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা যাচ্ছে। পতিবেদনটিতে বলা হয়—'রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁহার গৃহে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ উপার্জন করিয়াছেন—যুবক-যুবতীদের চিত্ত ও চরিত্র বলিদান করিয়া যদি বিশ্বভারতীকে রাখিতে হয় তবে বিশ্বভারতীর প্রয়োজন নেই।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ সবের খুব প্রাধান্য দিলেন না। নিন্দুকেরা যাই বলুক না কেন, দেশের বিবেকবান মানুষ কিন্তু এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন। নাটকের প্রথম গানটি গেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন কবি। যে সব গান কলকাতার অভিনয়ে ছিলো, তার মধ্যে (ক) পূর্ব গগন ভাগে, (খ) বাঁধন কেন ভূষণ বেশে (গ) নিশীথে কী কয়ে গেল, (ঘ) তুমি এসেছ কি মোর ঘরে (ঙ) বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে। (চ) আর রেখো না আঁধারে, (ছ) পথে চলে যেতে যেতে (জ) হে মহাজীবন, হে মহামরণ, (ঝ) হার মানলে গো (ঞ) আমায় মাগো হে ক্ষম—গানগুলি ছিলো, তা ছাড়া 'সকল কলুষ তামস হয়' গানটি অভিনয়ের আগে রচনা করে এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে পরিবেশিত হয়েছিল। এই নাটকের অধিকাংশ গানের সঙ্গে সহজ পদছন্দে মূকাভিনয় করা হয়েছিলো। প্রতিমা দেবীর

ইচ্ছায় 'হে মহাজীবন, হে মহামরণ" গানটির সঙ্গে একটু নৃত্যও পরিবেশিত হয়েছিলো। কবি সাবধান করে বলেছিলেন। 'নাচ কিন্তু হাঁটুর উপরে উঠো না। ' তিনি চেয়েছিলেন, প্রথম থেকেই নটীর কোনও নাচ যেন উদ্দাম হয়ে না যায়। সেবার জোড়াসাঁকোয় 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়েছিল মোট চারদিন অর্থাৎ ১৪-১৮ মাঘ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। এই অভিনয় যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পরিমল গোস্বামী। তিনি তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন এভাবে। 'এ নাটকের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। এতে সবই নারী চরিত্র...এর বিস্ময়কর অংশ হচ্ছে এর শেষ দৃশ্য। "আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো" গানের সঙ্গে শ্রীমতীর নৃত্যদৃশ্য এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল রচনা করলো আমার সম্মুখে। এমন মন পবিত্র করা একটা দৃশ্য মঞ্চে দেখা যায় না। মনের মধ্যে এর রেশ নিয়ে ফিরলাম। সব যেন স্বপ্নবৎ মনে হতে লাগলো।' (রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া)।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গৌরী দেবীর নৃত্যের প্রশংসা করে লিখেছিলেন। তাঁর ভাষায় ঃ 'ও যখন নটী হয়ে নাচলো, সে এক অদ্ভুত নাচ। অমন আর দেখিনি।....নন্দলালকে বললুম। তোমার মেয়ে আজ আগুন স্পর্শ করেছেন, ওকে সাবধানে রেখো। (রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ : সমকালীন প্রতিক্রিয়া)

নাচের টেকনিকের সঙ্গে তেমনভাবে পরিচিত না হয়েও নটীর পূজায় গৌরী দেবী যে অসামান্য ভক্তিভাব ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা এককথায় ছিলো বিরল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গৌরী দেবীর নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন 'নটীর পূজা'র খুব নাম হয়েছে। তাই টাকার লোভে আবার নটবৃত্তিতে নাবতে যাচ্ছি। গৌরীর সুখ্যাতিতে কলকাতা শহর মুখরিত।' (গৌরী দেবীকে লিখিত পত্র, দেশ, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৬৭।) নৃত্য রচনায় গৌরী দেবীর সাহায্য করেন নৃত্যশিক্ষক নবকুমার সিংহ (ঠাকুর)। মণিপুরী নৃত্যধারায় তাকে প্রশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। প্রতিমা দেবীও অনেক সাহায্য করেছিলেন। আসলে এই সাফল্য অর্জনের জন্য অনেক সাহায্য করতে হয়েছে। সেই সাফল্যের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে গৌরী দেবী এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : 'কবি নিজে রিহার্সালের সময় নটীর চরিত্রটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। মাত্র ১৯ দিন রিহার্সেল করে 'নটীর পূজা' নাটকটি তৈরি হয়। অবশ্য দিনে একবার নয় কোন কোন দিনে দু' তিনবার করেও রিহার্সাল হত। সমবেত রিহার্সেল ছাড়াও কবি আলাদাভাবে আমাকে নিয়ে এই ভূমিকার জন্য তৈরি করেছেন। কবি সাধারণত নাচের তালিমের সময় থাকতেন না। কিন্তু নটীর নাচ যেমন হবে সে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন।' (দেশ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৬৭)।

গৌরী দেবী ছাড়াও যাঁরা তখন নৃত্যে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী দেবী, যমুনা দেবী, অমিতা দেবী, লতিকা দেবী, সুমিতা দেবী, হৈমন্তী দেবী, নন্দিনী দেবী প্রমুখ উল্লেখ্য। পুরুষদের মধ্যে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন শান্তিদেব ঘোষ।

কলকাতায় 'নটীর পূজা' অভিনয়ের শেষে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে।

এসেই দোল উৎসব নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দোল উৎসবে তিনি প্রথম 'ফাল্গুনী নাটকটির অভিনয়ের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাবে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়ালেন। তার পরিবর্তে নৃত্য গীতের একটি অনুষ্ঠান করবেন বলে স্থির করলেন। নতুন করে ছয় ঋতুর গান ও কবিতা রচনা শুরু করলেন। নাম দিলেন। 'নটরাজ'। এই প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন—'গুরুদেব প্রথমেই ঘোষণা করলেন। তিনি নটরাজের কবিশিষ্য এবং নটরাজের কাছে মুক্তির মন্ত্র নেবেন। নটরাজের কাছে আত্মনিবেদন করে বলবেন : 'প্রভু, এই আমার বন্দনা নৃত্যগানে আনিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু।' আরও বললেন, আমি নটরাজের চেলা। নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ' গানটি রচনা করে গুরুদেব কার্যসূচির প্রথমে রেখে গুরুদেব নটরাজকে বিশেষভাবে বন্দনা করে গান, কবিতা ও নৃত্য অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন। এই অনুষ্ঠানে মেয়েরাই সমবেত বা একক নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়— 'নৃত্যকে যেন দেবীরূপে নৃত্য আলোকমন্ডিত দেখিলাম। এত রূপ, এমন পবিত্র নীরস্ত্র সৌরভ, এমন হৃদয় আলো করা জ্যোতি কোথায় কোন গহ্বরে পড়েছিল।' (রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খণ্ড)

নৃত্য নাটক রচনার ক্ষেত্রে এভাবেই নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তৈরি করে নিলেন তিনি। রচনা করে চললেন একের পর এক নৃত্য নাটক। এই সময়ে রচিত কয়েকটি উল্লেখ্য নৃত্য নাটক হলো 'শ্যামা', 'শিশুতীর্থ', 'শেষবরণ', শাপমোচন', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনৃত্যধারাও ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে। মোহিনী আট্টমের তালিম দিতে কল্যাণী আম্মা এলেন শান্তিনিকেতনে। বেনু নায়ার এলেন কথাকলির তালিম দিতে। ভেলায়ুধ মেননও এলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের কথাকলি শেখাতে। শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার সঙ্গে লৌকিক নৃত্যধারার সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও চলতে থাকলো। আরও এসেছিলেন কৃষ্ণনকুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা কেবল দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইন্দোনেশিয়া থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন সোয়েকারা ও প্রহস্থকে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে শান্তিদেব ঘোষকে পাঠিয়েছিলেন ইন্দোনেশিয়ায় কান্তি নৃত্য শিখতে। অবশ্য এর আগে শান্তিদেব ঘোষ গিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কায় এই নৃত্যধারা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য। এছাড়াও নৃত্যের তালিম দিয়ে তৈরি করে নিয়েছিলেন পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী এবং সুমিত্রা সেন, শ্রীমতী ঠাকুর, নিবেদিতা বসু, নন্দিতা কৃপালনী, সুজাতা মিত্র, মঞ্জুলা দত্ত, চিত্রা সেন প্রমুখকে।

নৃত্যরচনার ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণভাবে তৈরি করে নিয়েছিলেন তিনি এর মধ্যে। রবীন্দ্রনৃত্য নাট্যের একটি প্রধান গুণ হলো সৌন্দর্য ও আনন্দের সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, 'এক ধরণের গায়ে পড়া সৌন্দর্য আছে, যা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতি লালিত্যগুণে সহজে আমাদের সব ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেইজন্য যে আর্ট আভিজাত্যের গৌরব করে। সেই আর্ট এই সৌন্দর্যকে অমল দিতে চায় না।' তথাকথিত নতুনত্বের প্রলোভনে চমক সৃষ্টি এবং কাব্যের মর্মকথাকে উপেক্ষা করে

চোখ ধাঁধানো দৃশ্য বা মন-মাতানো দেহভঙ্গিমা অথবা পরিমিতিহীনতা রসবিকৃতি ঘটায়। সাধারণ স্থূল দর্শকের কাছে তা জনপ্রিয় হতে পারে। কারণ, 'রসের যথেষ্ট পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ অছে।'

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য প্রযোজনার সময়ে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হত। নৃত্য, নাটক এবং কাব্যের অপূর্ব মিলন ঘটেছে তাঁর নৃত্যনাটকে। ভাবরূপের সার্থকতা যাতে নৃত্যরূপে সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে। তার জন্য রবীন্দ্রনাথ সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ভাবকে রূপ দেবার জন্য যতটুকু চালচিত্রের প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই দৃশ্যপট, আলোকসম্পাত, বেশভূষা ব্যবহারের পক্ষে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'জাভাযাত্রীর পত্র' রচনায় এ সম্বন্ধে বলেছেন 'নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায়-খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি, মনিবন্ধে সোনার সর্পকুণ্ডলী বালা, বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্ধ—তাকে এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায় সবুজে মেলানো আঁট কাঁচুলি, কোমরবন্দ থেকে দুই ধারায় বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মতো সামনে দুলছে. কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতোই বস্ত্র বেষ্টনী, সুন্দর বর্তিক শিল্পে বিচিত্র, দেখামাত্রই মনে হয় অন্তরের ছবিটি। এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছনতার সামঞ্জস্য আমি কখনো দেখিনি।' (জাভাযাত্রীর পত্র)

নৃত্য নাটকের প্রয়োজন ও পরিচালনা সম্বন্ধে আলোচনায় নাটক ও নৃত্য নাটকের মৌলিক পার্থক্যর পার্থক নিয়েও রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। প্রতিমা দেবী 'নৃত্য' গ্রন্থ এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন 'খাঁটি নাটকে সংসারের রূপ প্রতিরূপ প্রতিফলিত হতে থাকে, নৃত্য নাট্যে প্রয়োগ পায় তার অন্তর। অন্তঃ পূরবর্তী বর্ণনা ও বেদনার সেই নিগূঢ় চাঞ্চল্য, যাকে অর্থবান কথায় ধরা যায় না, রূপবান চিত্রকলায় যা বাঁধা পড়ে না। সংসারে ঘটনা তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতের বাস্তবের যে সুনির্দিষ্ট রূপ অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, তাকে প্রকাশ করা নৃত্যের কাজ নয়, বাস্তবের মধ্যে অবাস্তবকে উপলব্ধি করাই তার ধর্ম'।

নৃত্য নাটকের এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ধরা পড়েছে 'শাপমোচনে'। অবশ্য প্রতিমা দেবী অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে 'সব জায়গায় প্রকৃত নৃত্য-নাট্যের প্রকৃতি রক্ষা করতে না পারলেও সঙ্গীত ও মূক-অভিনয় মিলিয়ে জিনিসটি মনোরম হয়েছিলো।' কিন্তু 'শাপমোচন'এরপরে রবীন্দ্রনাথের নৃত্য-নাট্য রচনার প্রেরণা আরো সতেজ হয়। 'চিত্রাঙ্গদা'য় এসে তা একটা রূপ পরিগ্রহ করে। 'চণ্ডালিকা'য় ঘটল তার সম্পূর্ণ প্রকাশ। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'কে রবীন্দ্রনাথ কাব্য নাট্য ও নৃত্যনাট্য—এই দুইভাবেই করেছেন। কিন্তু 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের প্রযোজনা নৃত্যনাট্যের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত করেছিলো, প্রতিমা দেবীর ভাষায় :— 'চণ্ডালিকা'র কথাপকথনের ছন্দের মধ্যে সুরের সেই কারুকার্য মনকে টানে। কীর্তন বাউল থেকে আরম্ভ করে পূরবী, সাহানা, পদ্মা, ভৈরবী, বাগেশ্রী পর্যন্ত নানা প্রকারের সুর কথার অনুসরণে প্রতিপদে পরিবর্তিত

হয়েছে। সঙ্গীতে যে সব মিশ্রণ, নৃত্যেও হয়েছে ঠিক তাই। চতুর্বিধ তালনৃত্যই বিভিন্ন ভঙ্গির মধ্যে মিলিত হয়ে গল্পের ভূমিকাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই যে সংমিশ্রণ, এতে ঐক্য নষ্ট না হয়ে নৃত্যকলা ও সঙ্গীত সমভাবেই বৈচিত্র লাভ করেছে। এই রকমারি না থাকলে নাটক তৈরি হত না।... যদিও মণিপুরের নৃত্যে আঙ্গিকের উপর 'চিত্রাঙ্গদা'র ভিত তৈরি হয়েছে, তবুও দর্শক সমস্ত মণিপুর ঘুরেও 'চিত্রাঙ্গদা'র অনুরূপ জিনিস দেখবেন না। তেমনি আঙ্গিকে তৈরি 'চণ্ডালিকাতেও দক্ষিণীনৃত্যের মধ্যে চেনা যাবে না, সংমিশ্রণের তেমনি গুণ। (নৃত্য)

এভাবেই বাংলার সমস্ত নৃত্যধারাকে প্রভাবিত করেছে রবীন্দ্রনৃত্যধারা। রবীনন্দ্রনাথ যখন 'শাপমোচন-এর পরীক্ষা নিরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত, তখনই ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে নতুন মেজাজ নিয়ে আবির্ভূত হলেন উদয়শঙ্কর। তাঁর সামান্যক্ষতি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা হয়েছে। কেউ কেউ এর ভূয়সী প্রশংসা করলেও কারও কারও মতে এ সঠিক রাবীন্দ্রিক হয়নি। ত্রিশের দশকে আর একটি উল্লেখ্য ঘটনা হলো মধু বসু এবং কেশব সেনের কন্যা সাধনা বসু। 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স প্রতিষ্ঠা'। অভিজাত বাড়ির মেয়েদের নিয়ে তিনিই 'আলিবাবা' নৃত্যনাটকটির প্রযোজনা করেছিলেন। এভাবেই রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ভাবনা বাঙালির সংস্কৃতিকে মর্যাদা দিয়েছে।

এক স্বকণ্ঠ সন্ধানীর বিদ্রোহ ও অনুতাপ

শোভনা ঘোষ

বিংশ শতাদীর প্রত্যুষে যখন রবীন্দ্রনাথের আলোকসামান্য প্রতিভার ছটায় বাংলা সাহিত্য উদ্ভাসিত, যখন সর্বগ্রাসী রবীন্দ্র প্রতিভার প্রভাবে সমকালীন কবিরা রবিকক্ষপথেই একঘেঁয়ে আবর্তনে রত, তখন মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—এই তিন কবি কিছুটা ভিন্ন সুরে কথা বলতে সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হলেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থখানি নিয়েই যতীন্দ্রনাথের আগমন।

রবীন্দ্রনাথ তখন 'কল্পনা', 'নৈবেদ্য'—এ প্রাচীন ভারতে মানস পরিক্রমা শেষ করে 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'-র আধ্যাত্মিক সুরলোকে যাত্রা করেছেন। উনিশ শতকে বিহারীলাল যে কাব্যধারার সূচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তারই সৌন্দর্য বিলসিত পরিপূর্ণ রূপদান করেছিলেন তাঁর কাব্যে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য পিপাসা, রোমান্টিক নিরুদ্দেশ ব্যাকুলতা রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের অনিবার্যভাবেই আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করেছিলো। এই কাব্যকলার অনুসরণ করতে গিয়ে এই কবিরা বাস্তব সংসর্গবিচ্যুত, স্বকীয় ভাবনা বিরহিত পুচ্ছগ্রাহিতার শিকার হয়ে পড়লেন। এই সময়কার কাব্য প্রবণতা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন 'উপদেশ' কবিতায়—

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালোবাসা
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন
জোর করা ভাব আর ধার করা ভাষা। (সনেট পঞ্চাশৎ)

অর্থাৎ অপরের ভাব ও ভাষা মোটুমুটি করায়ত্ত ক'রে অর্থহীন প্রলাপ রচনা করতে পারলেই অনায়াসে প্রিয় কবি হওয়া যায়। রবীন্দ্রানুসরণ, জগৎ ও জীবনের বাস্তব অনুভূতি বিহীন নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য ব্যাকুলতা, ভাষা-ছন্দের সুলব পারিপাট্য ও বহু ব্যবহারে জীর্ণ আলংকারিকতার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরীর যে অভিযোগ ছিল বীজ আকারে, যতীন্দ্রনাথের মধ্যে তা প্রচণ্ড বিরোধের আয়োজনে দেখা দিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কবিতার নতুন পথ প্রদর্শনে যতীন্দ্রনাথই প্রথম ও সার্থক উদ্যোক্তা।

যতীন্দ্রনাথ দীর্ঘ-দিনের লালিত ললিত কাব্যাদর্শকে ভেঙে নতুনভাবে নিজের কথা বলতে চাইলেন। প্রেম-প্রকৃতি-ঈশ্বর-ন্যায়-নীতি-সমাজ—সবকিছুকেই তিনি নতুন আলোয় দেখতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রবীন্দ্র কক্ষপথ ভাঙার কাছে যতীন্দ্রনাথকে অনেক সময়, শ্রম ও মনোযোগ দিতে হয়েছে। প্রথম পর্বে ভাঙনের নেশায় যতীন্দ্রনাথ আবিষ্ট ছিলেন। তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধী সুর, তীক্ষ্ণ শ্লেষ, যুক্তিক্রম ও বাস্তবতা পাঠককে মুগ্ধ করল। কিন্তু তিনি প্রায় দশ বছর ঐ বৃত্তে আবদ্ধ রইলেন।

আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারা' গ্রন্থে একটি সোনার পাহাড় ও সেই পাহাড়ে বসবাসকারী কিছু পাখির গল্প বলেছিলেন। সূর্য উঠলে সোনার পাহাড়ে আলো প্রতিফলিত হয়ে সেই পাখিগুলি স্বর্ণবর্ণ ধারণ করতো। তখন কিছু পাখি মনে করলো, তারা এই সোনার পাহাড় ছেড়ে চলে যাবে নিজেদের মত হবে বলে। বাংলা সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথ হলেন সেই সোনার পাহাড়। এই সোনার পাহাড়ের প্রভাব অস্বীকার করে যে সব কবিরা নিজেদের মত হতে চাইলেন, নিজেদের কণ্ঠে প্রথম কথা বলতে চাইলেন তাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ অন্যতম। কোনো একজন বিরাট প্রতিভাকে অতিক্রম করার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হল ক্রোধ। যতীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে সেই ক্রোধ ও বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' ও মরুমায়া'—এই ত্রয়ীকাব্যে তিনি রবীন্দ্র উত্তরণের পথ পাওয়ার জন্য অক্লান্তভাবে রোমান্টিকতাকে ভেঙেছেন। সেই তিন কাব্যে যে জ্বালা আছে, বিদ্রোহ আছে, অস্থিরতা আছে—তা বাংলা কাব্যের পালাবদলের জন্য প্রয়োজন ছিল। তবে এই ত্রয়ী কাব্যের পরেই কবি তাঁর স্বরচিত মরুবৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। যে গভীর প্রশান্তির মধ্যে নিগূঢ় ভাবের স্ফূরণে কবিতার জন্ম হয় সেই দুর্লভ মুহূর্ত কবি পেয়েছেন তাঁর নিশাত্রয়ী কাব্যে—'সায়ম', 'ত্রিযামা' ও 'নিশান্তিকা'য়। নিশাত্রয়ীতেই কবির নতুন সৃষ্টির চর জেগে উঠতে শুরু করে। এই পর্বে সৌন্দর্য ও প্রেমান্বেষণে, প্রকৃতির আনন্দময় মাধুর্য প্রকাশে কবি অনেকটাই সমর্পণী। কবির এই দ্বিতীয় পর্বের কবিতাগুলির মধ্যে দিয়ে ধারাবাহিক যাতায়াত ক'রে মনে হয় না কি অনেক মরুপথ পার হয়ে স্বতন্ত্র পথ খুঁজতে খুঁজতে তিনি শেষপর্যন্ত প্রেম-সুন্দর-শান্তি-সমন্বয়ের সেই রবীন্দ্র দর্শনেই এসে মিলিত হলেন। এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বস্তু এটাই। রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্য সাধনার প্রথম উদ্যোগের প্রকৃত চিত্র কী ছিল?

'সায়ম' কাব্যগ্রন্থকে যতীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পালাবদলের কাব্য বলা যায়। পূর্ববর্তী কাবের সেই তীব্রদাহ আর নেই। সন্ধ্যার মৃদু আলোর রেশ এই কাব্যে ছড়ানো। যে সুন্দর তাঁর মরু কাব্যত্রয়ীতে ছিল উপেক্ষিত, 'দুঃখবাদী' কবিতায় যাকে তিনি বলেছিলেন—'সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা/ সত্যের সাঁস কালো বলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা'। সেই সুন্দরকেই কবি এই কাব্যের 'সুন্দর' কবিতায় আহ্বান করেছেন—

ওগো সুন্দর, আমার জীবনে
আনন্দ রূপে ফুটিবে না কি?
সজল এ চোখে রাখিবে না তব
হাস্য-উছল মোহন আঁখি',

যে সুন্দর কবির কাছে ছিল মায়া ফাঁদ মাত্র, তাঁর রূপ এখানেও আনন্দময় না হলেও দুঃখের বৃন্তে, বেদনার অশ্রুসাগরে সেই সুন্দর ফুটে উঠেছে—

শ্রাবণপাতে এ অশ্রুদহে
ফুটিল কমল নব নির্ম্মল

তারো চোখে হায় অশ্রু দহে।

এই কাব্যের প্রায় সব কবিতাতেই কবি হৃদয়ের নিভৃত বেদনা গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি হৃদয়ের এমন অনায়াস আত্মপ্রকাশ এর আগে হয়নি। সেইজন্য এই কাব্যে প্রথম প্রেম কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একদা কবি বলেছিলেন-

প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

অতীতে অস্বীকৃত প্রেম-যৌবন-যৌন্দর্য এই কাব্যে করুণ বিষণ্ণতায় ধরা পড়েছে। যৌবন ও সৌন্দর্য আজ পলাতক। সেই পলাতক সৌন্দর্যের অন্তরালে কবি চিরন্তনের রূপ খুঁজে পেতে আজ ব্যগ্র—

আজি নিশি শেষে বসে মুখোমুখি
নব পরিচয় দু'জনে লব।
নূতন করিয়া গুণ্ঠন তুলি
মিলাব নয়নে নয়ন তব। (বোঝা)

যে রোমান্টিক কল্পনা প্রবণতাকে কবি পরিহার করতে চেয়েছিলেন, বিদ্রুপ ক'রে বলেছিলেন—

'কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারমাস খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস।'
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে তুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশ, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি।

সেই রোমান্টিক কল্পনাকে আশ্রয় করেই কবি প্রিয়ার রূপ বর্ণনা করলেন—

কোন্ অশোকের চৈতী বরণ
ও কপোল-তলে শুকায়ে উঠে?
কোন্ পঙ্কের পঙ্কজ-কলি
গরিবী উরসে ফুটিয়া টুটে?
কোন্ শেফালির একটি রাতের
দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে?
কোন্ বকুলের একটি বাদল
ওই কেশ পাশে ঝুরিয়া মরে? (বোঝা)

কবি এতদিন বেদনার একরঙা চশমা চোখে দিয়েছিলেন, দেখেছিলেন—

সুখে মোড়া দুখে ভরা কত বড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল। (দুঃখী)

ভেবেছিলেন প্রেম-সৌন্দর্যের ধারণা আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র
অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁস বুনে,

মামুলি প্রেমের নেট্ মশারিটা টাঙিয়ে নে।

কিন্তু, সেই কবিই 'সায়ম' কাব্যগ্রন্থের 'মন্ত্রহীন' কবিতায় নিজের প্রিয়াকে দীক্ষাগুরুর আসনে বসিয়ে প্রেম ও জীবন ভোগের পাঠ নিচ্ছেন। এই কবিতায় কবির দেহাকুলতার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে।

হে আমার জ্যোতি হে আমার মতি
গৃহিনী, সচিব, সখি, হে প্রিয়া
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া।
.....
নমো নমো নমো সুন্দর তম
আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে যুগে দেয় পরমানন্দ,
নরকের দ্বার ব'লোনা কেহ।

'সায়ম' কাব্যগ্রন্থে হারানো যৌবনের জন্য কবির কোমল বিষাদ ও সুন্দরের জন্য কবির অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। আর 'ত্রিযামা' কাব্যগ্রন্থে কবি তাঁর প্রিয়ার যৌবন-বেদনা রসে উচ্ছল দিনগুলোকে মনে করেছেন ও বর্তমানের অসহায়তা ও অক্ষমতার কথা ভেবে কষ্ট বোধ করেছেন। প্রৌঢ় প্রেমের এমন হৃদয় আলেখ্য বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। একদিন কবির যখন যৌবন ছিল, তখন তিনি মরু দগ্ধতায় নিজেকে শুষ্ক ও রুক্ষ্ম ক'রে রেখেছিলেন। আর আজ অবসিত যৌবনে তিনি প্রেমকে সন্ধান করছেন যা আর আসক্তিময় নেই, বরং ঔদাস্যে বিধুর হয়ে গেছে। 'সমাধান' কবিতায় কবির এই আক্ষেপ—

যে দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম—
আজ মনে হয় এ দগ্ধভালে সেই ছিল মোর প্রেম।
যারে বলেছিলে—নাই
চেতনার কূলে বসি চিতামূলে গায়ে মাখি তারি ছাই।

কবি একদিন 'ঘুমিওপ্যাথি' আবিষ্কার ক'রে জীবনের ব্যথা-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'ত্রিযামা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ঘুমের সাথী'তে কবি বিগতযৌবনা নলিনীর মধ্যে ঘুমের সাথীর সন্ধান করেছেন—

অস্তাচলের এল সংবাদ—
ভেঙে পড়ে সেথা চেতনার বাঁধ
সুপ্তি সাগর প্লাবন নেশায়
সহসা উঠেছে মাতি
এই দুর্যোগে খুঁজে ফিরি সখি
আমার ঘুমের সাথী।

কিন্তু এই পড়ন্ত বেলায় প্রেম ও সঙ্গিনীর সন্ধান করতে এসে কবি দেখেছেন—

তোমার যৌবন গেছে
তবু আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময়;
আছি এই তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময়। (শপথভঙ্গ)

'মনোরমা', 'প্রত্যাবর্তন', 'বকুলতলার ঘাটে' প্রভৃতি কবিতাতেও কবির অতৃপ্ত রূপ ও প্রেম পিপাসা বিলাপের অশ্রুবাষ্পে রূপান্তরিত হয়েছে। যৌবনে প্রেম এসেছিল বৈরাগী বেশ ধরে, তখন কবি তাকে চিনতে পারেননি। আজ যদি কবি তাকে ক্ষণকালের জন্য পেতেন তবে—

চিবুক ধরিয়া কহিতাম—ক্ষমো
সারা জীবনের অপরাধ মম,
সাথে সাথে ছিলে সহচর সম তবু বলেছিনু—নাই;
বহু বিলম্বে এখন বুঝেছি
তোমারে ঠেলিয়া তোমারে খুঁজেছি
দূর দুর্গমে কত যে যুঝেছি যদি তব দেখা পাই।

তাহলে এককালে প্রেম-সৌন্দর্য-রোমান্টিকতাকে অস্বীকার ক'রে কবি যে রবীন্দ্র বিরোধিতার পথে যাত্রা করেছিলেন—তার সত্যতা সম্পর্কে, মূল্য নিরূপনে কবি কি সংশয়াকুল নন? শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"যে প্রেম ও যৌবনাবেশকে কবি প্রথম জীবনে সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন, এখন তাহাকে ঘিরিয়াই কত মধুর পূর্বস্মৃতি রোমন্থন, কি অপরূপ কল্পনা বিলাস, অনুশোচনা ও ভ্রান্তি স্বীকারের কি করুণ গুঞ্জন, ফিরিয়া পাইবার কি ব্যাকুল আকুতি উল্লসিত হইয়াছে!"

যৌবন, প্রেম ও জীবনাসক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছে। যৌবনে কবি প্রকৃতির প্রতিটি রূপে অন্তরালে দুঃখ ও যন্ত্রণার ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'দুঃখের কবি' কবিতাতে কবি সজল মেঘস্তরে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের রাঙা আলোকে ব্যথার রেখা বলে মনে করেছেন—

সজল মেঘস্তরে
শুভ্র রৌদ্র রক্তব্যথার পশরাই খুলে ধরে।
মুমূর্ষু চাঁদে বুকে ঢেকে কাঁদে কৃষ্ণা বাদল রাতি—
উপোসী রূপের অন্তঃপুরে কেঁদে জ্বলে মোমবাতি।

কবির তখন মনে হত সৃষ্টি বা প্রকৃতির বহিরাঙ্গিক সৌন্দর্যটা হল তার অন্তর্গত ব্যথাকে গোপন করার একটা ছলমাত্র। সমস্ত ভুবন হয়ে চলেছে এই লুকোচুরির খেলা। সৃষ্টির নিষ্ঠুর

সত্য গোপন করবার জন্যই এত সৌন্দর্যের ঘনঘটা।

বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা।
খাদ্যে খাদকে, বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য
ষঢ়ঋতু দলে ষড়রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য' (দুঃখবাদী)

'সায়ম', 'ত্রিযামা'-য় কবির অন্তরে প্রকৃতি মোহন রূপ ধারণ করেছেন। 'মরীচিকা'র শীত নিঃস্ব, রিক্ত ও শূন্যতার প্রতীক।

বিশ্বের বিরাট বক্ষে পাতি শবাসন
সাধিতেছ প্রলয় সাধন—
কে তুমি সন্ন্যাসী।

কিন্তু 'ত্রিযামা'-র শীত সম্পর্কিত কবিতা 'হিমভূমি' তে শীতের মধ্যে এই বসন্তের জন্য বাসনা মর্মরিত হয়ে উঠেছে—

'হাতে ধনু পৃষ্ঠে তূণ
কিশোর ফাল্গুন—কত দূর?

'হেমন্ত সন্ধ্যায়' কবিতায় আছে রোমান্টিক প্রকৃতি দৃষ্টি। সেই সঙ্গে আছে প্রকৃতি সম্পর্কে পূববর্তী মনোভাবের স্বীকারোক্তি—

'বসন্তে উপেখিনু ফুলে ফুলে মিনতি
বর্ষার মেঘে মেঘে আহ্বান,
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে মাঠে মন ধায়
কোন্ সুন্দরে কবির সন্ধান।'

যতীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কাব্য 'নিশান্তিকা'। 'নিশান্তিকা' কাব্য হিসাবে খুব সার্থক নয়। নতুন ভাবনা বা শিল্প কুশলতার অভিনবত্ব এ কাব্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু এ কাব্যের মূল আছে। কারণ এখানে কবিমন শুধু অতীত সুখী নয়, তিনি আত্মবিশ্লেষণে রত।

'নিশান্তিকা'-য় ও কিন্তু নিশার অন্ধকার কাটেনি। প্রেম ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কবির যে ধারণা 'ত্রিযামা'য় প্রকাশ পেয়েছিল এ কাব্যেও সেই একই ভাবনা প্রকাশিত। এখানেও তিনি জানেন যে, গোলাপ ও পদ্মের কাঁটায় যে ব্যথা ফুটে ওঠে—পাপড়ির নম্র পুটে তাই হয়ে ওঠে সৌরভ। যৌবনে তিনি যেমন পৃথিবীর রূপ-রস-হাসি-গানের অঞ্জলি দুহাতে ভরে নিতে পারেননি, আজও পারেন না। 'সুখভোগ' কবিতায় তাঁর এই মানসিকতার কথা বলেছেন কবি, একে বলেছেন এক 'বিদ্‌ঘুটে রোগ'।

বহু সুখ ভালে লিখিলে বন্ধু,
লিখিলে না সুখভোগ,
সাথে বেঁধে দিলে শিব অসাধ্য
বিদঘুটে এক রোগ।

এই রোগকে কেউ দুঃখবাদ, কেউ বা বায়ব্যাধি-ব'লে ব্যঙ্গ করে। এই মনোভাবের জন্য—

এ সুখের হাটে দিন মোর কাটে
মুখ পরশের দুখে,
যে ব্যথা আমার নহে আপনার
সেই ব্যথা কাঁদে বুকে।

এই বিচিত্র মনোভঙ্গি জন্য কবি সারাজীবন চোখের জলে সুন্দরকে খুঁজেছেন। শ্যামল-সজল বাংলায় বসে তিনি গোবি সাহারার ছবি এঁকেছেন। ছুটেছেন 'মরীচিকা'-র পিছনে। আলো, হাসি গান, প্রেম, প্রীতি চোখে ধরা দিল না; তাই নিজেকে কবি বলতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন—

আমার কবিতা হয়তো পড়নি কেহ,
পড়িলে কখনো বলিতে না মোরে কবি।
কবি যে হবে সে জেনো নিঃসন্দেহ
বাঙলায় বসে ভাবে না সাহারা গোবি।
চারিদিকে মোর শ্যামল গন্ধে গীতি,
কত হাসি মুখ, কত স্নেহ, কত প্রীতি
আলোছায়া সুখ-দুখ
সে সবে আমার নেশা ধরিল না চোখে—
মন বসিল না প্রেমের অলকা লোকে
ভরিল না খালি বুক।

জীবনের প্রথম পর্বে যতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহের একরোখা ভঙ্গিতে যা কিছু অস্বীকার করেছিলেন, জীবনের শেষপর্বে তারই কাছে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পন করলেন। কবি মানসিকতার এহেন মেরুস্মান বৈপরীত্য-র কারণ তাঁর সমকালীন যুগের মধ্যেই নিহিত। একদিকে রবীন্দ্র প্রভাবের আগ্রাসী সাহিত্যদর্শ থেকে জোর করে বেরিয়ে আসার চেষ্টা, অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধ পারবর্তী মানব মনোরাজ্যের পরিবর্তন। রবীন্দ্র-প্রদক্ষিণরত সে সময়ের কবি ও কাব্যকলার বাইরে নিজের মত ক'রে কথা বলতে গিয়ে সমস্ত রকম আবেগ উচ্ছ্বাস বর্জন ক'রে দুঃখবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন যতীন্দ্রনাথ। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই ভয়াবহ ধ্বংস ও প্রাণহানি মানবজাতির অন্তরে আরো এক ধ্বংস এনে দিল—তা হল সত্য, ন্যায় সুন্দর, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে মূল্যবোধের হানি। জীবন সম্পর্কে ক্লান্তি, নৈরাশ্য, হতাশা ও দুঃখবোধ ছাড়া আর কিছুই থাকছেনা। যতীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কবিতাযুগের সেই দাবিকেই পরিস্ফুট করেছে। 'প্রগতি-'কালিকলম' ও 'কল্লোল-এর তরুণ লেখকরা যতীন্দ্রনাথের মরুচারণা, রোমান্টিকতা বিরোধী মনোভাব, দুঃখবাদ এবং রীতির দিক দিয়ে তির্যক বাক ভঙ্গির মধ্যে নতুন পথে চলবার অনুপ্রেরণা লাভ করলেন। আর সঈদ আয়ুব তাঁর 'আধুনিক

কবিতা সংকলন' (১৯৪০) গ্রন্থে বলেছিলেন—

"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত, অন্তত মুক্তি প্রয়াসী কাব্যকে আমরা আধুনিক কাব্য বলে গ্রহণ করেছি।"

এই দিক থেকে যতীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র মুক্তি পিয়াসী মরুত্রয়ী কাব্যের কবিতাগুলি আধুনিক। কিন্তু নিশাত্রয়ী কাব্যে যখন কবি প্রত্যাবর্তন করছেন সত্য, প্রেম ও সুন্দরের কাছে, যখন বাক্‌ভঙ্গিতেও লাগছে নম্র, কোমল সুরভি-স্পর্শ—

মুখপানে তুলি বারি
মিছে খুঁজি অর্দ্ধ রাতি
সেই মুখখানি,
বাঁধা গান কেঁদে যায়
ঠোঁটে এসে বেধে যায়
সোহাগের বাণী।
ফুঁ দিয়া নিবাই দীপ
অনূকারে রচি টীপ
স্মৃতির কপালে
অলক ঝালর তুলে
শ্রাবণ সাজাই দুলে
কণ্ঠ ফুলমালে।

তখন মনে হয় নাকি রবীন্দ্র কাব্যে যে প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য, সত্য, আদর্শ প্রকাশিত —সেটাই শাশ্বত চিরন্তন; মানুষের একমাত্র অবলম্বন। কবিরা নিজের নিজের কণ্ঠ ও ভাষা খুঁজে নিতে বিদ্রোহ করেছেন বটে কিন্তু ফিরতে হয়েছে মানব মনোরাজ্যে এইসমস্ত চিরকালীন ভাবসত্যের কাছে। যতীন্দ্রনাথও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তাই শেষ পথে তাঁর এত আত্মসমালোচনা, যেহেতু রবীন্দ্র পরবর্তী যুগ-গঠনের প্রথম সাধনায় ব্রতী এই কবি; সেহেতু বিদ্রোহ সমর্পণ দুটি দিকই তাঁর কাব্যে সময়ের সাক্ষ্য বহন করে রাখে—তাই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তিনি আজো বারবার আলোচিত হওয়ার পরিসর তৈরি করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতা ও কিছু কথা

সমীর মৈত্র

' We are such stuff. As dreams
are made on.....'
–The Tempest : Act 4 secne I

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বপ্ন' শীর্ষক কবিতাটি সম্পর্কে আমার ভাবনা প্রকাশ করার আগে কাব্যগ্রন্থটি সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

আমরা জানি উপনিষদীয় ভাবরসে-পুষ্ট রবীন্দ্রনাথ জীবনের চরম ও পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আর তাই বিচ্ছেদ তাঁকে বিহ্বল করতে পারেনি কখনোই। কোনোরকম অতিশয়োক্তি হবে না সম্ভবত একথা বলায় যে ছোটবেলা থেকে জীবনের শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি যে মর্মভেদী বিচ্ছেদের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর বিশাল ও প্রায় অনন্ত বৈচিত্রময় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তা বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

এবার আসব 'স্বপ্ন' কবিতাটির কথায়, কবিতাটি পড়লে কেন জানিনা কবি চূড়ামণি কালিদাসের 'Look To This Day' কবিতাটির কথা মনে আসে। কবি লেখেন—

'Look to this day :
For it is life. The very life of life.'

কারণ—

'Yesterday is but a dream
And tomorrow is only a vision;
And today well-lived makes
Yesterday a dream of happiness'.

কবি রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ে জীবনের প্রায় মধ্যগগনে পৌঁছে গেছেন। তাঁর নানাবিধ জাগতিক অভিজ্ঞতার ঝুলি প্রায় ভরা। এর আগে তাঁর সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি এই তিনখানি কাব্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের সাথে জনজীবন, গ্রাম্য জীবনের নিবিড় সখ্যের পরিচয় আছে। কিন্তু এই পর্যায়ে কবি বর্তমানকে অতিক্রম করে চলে যান অতীতে। সুদূর ঐতিহ্যময়। শিল্পসুষময় পরিপূর্ণ পরম সমৃদ্ধ অতীতের ভারতে, এই পর্যায়ে শুরু হয় তাঁর পথ চলা। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রমথনাথ বিশীর একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে পারি। তবে তার আগে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে কল্পনা ও নৈবেদ্য-পূর্ব পর্যায়ের কাব্যগুলি প্রধানতঃ বর্তমানের প্রত্যক্ষ ভিত্তি ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের উপর স্থাপিত। 'কল্পনা' প্রভৃতি কাব্য তিনখানি পরোক্ষ কল্পনার অসীম ও বৃহত্তর অতীত জীবনের বিরাট পাদপীঠের উপরে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাই বলিয়া বিচ্ছেদ নাই।' একথা সত্য। কারণ বর্তমান ও অতীতের মধ্যে যে পার্থক্য সাধারণত লক্ষ্য করা যায় তা আপেক্ষিক। আর এই কারণেই সম্ভবত এলিয়ট তাঁর একটি কবিতায় বলেন—

Time present and time past
Are both Perhaps present in time future,
And time future contained in time past'.

কবিগুরুর ভাবনাও এলিয়টের সমগোত্রীয়। তাঁর কাছে কালপ্রবাহ অখণ্ড। আর তাই ভারতের অতীত ও বর্তমানে কোনো বিচ্ছেদ নাই। আরেকটি কথা হল এই যে অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানুষ স্বতন্ত্র এই কারণে যে তার জাগতিক অস্তিত্বের পাশাপাশি থাকে তার মনোজগৎ, যা সব শিল্পের ধাত্রী। এই মনোজগৎ অখণ্ড, এবং এখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই। কবি এই কবিতায় সেই বর্ণময়, বৈচিত্রময় এবং নান্দনিক সুষমায় ঋদ্ধ অতীতের দিকে তাঁর মানস চক্ষুকে স্থাপিত করেছেন। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায়, 'যে জীবন আজিকার ভারতবর্ষ হইতে নিঃশেষে অপসৃত হইয়াছে সেই জীবনের কাহিনী কবির বক্তব্য'। অতএব একথা বলা বাহুল্য এখানে কবিকে সেই বিগত জীবনের সৌন্দর্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হলে নিজ শিল্পজগতের যার উৎস তাঁর মানসলোক—সাহায্য নিতে হয়েছে। এবং বিশীর ভাষায় এই সৌন্দর্যব্রতে কালিদাস তাঁর প্রধান সহায়;' কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে তাঁর এই দৃষ্টি একান্তই তাঁর স্বকীয়।

আমরা আগেই জেনেছি যে রবীন্দ্রনাথের কাছে কালপ্রবাহ অখণ্ড। অতএব যা অখণ্ডতা স্বাভাবিক ভাবেই বিচ্ছেদহীন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও এক নান্দনিক বিষাদ (কীট্‌স্ যাকে বলেন romantic agony'।) আলোচ্য কবিতাকে ঋদ্ধ করেছে এক অলোক-সামান্য সুষমায়, এবং বলা বাহুল্য এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কীট্‌স ও য়েট্‌সের সগোত্র। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় এবং তা হল এই যে এই পর্যায়ের কাব্যে সংস্কৃত শব্দের প্রতি কবির মমত্ব লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনি অতি কোমলতা ও বাহ্য "শ্রুতি-সুখকরতা" ছেড়ে শব্দগুলিকে আন্তরিক যত্নে ও অশেষ মমতায় সাজিয়ে তাদের ব্যঞ্জনা-শক্তি বাড়িয়ে তুলেছেন। কোনো এক সমালোচকের ভাষায়— 'বৈষ্ণব-ভাষার ললিত-মাধুর্য (দেহি তব পদপল্লব মুদারম) ক্রমশ কঠিন-দীপ্তির পথ করে দিয়েছে।'

একথা এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য হবে না যে প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা কাব্যে একমাত্র মধুসূদন ছাড়া কেউই বৈষ্ণব কাব্যের বিশুদ্ধ সাহিত্য চর্চা করেননি। রোমান্টিক আকুলতা, দীপ্তি, উচ্ছ্বাস ও মাধুর্য বৈষ্ণব ভাষাতেই সম্ভব ছিল। কবিগুরু তাকে ঋদ্ধ করলেন তাঁর জাদুস্পর্শে।

এবার আসব কবিতার কথায়। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় এই কবিতায়—

'কবিকে অনুসরণ করিয়া আমরা প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যের চিররহস্যময় পুরীতে প্রবেশ করি।' এবং 'এ পুরী সামান্য ; সমস্ত ভারতবর্ষ হইলেও বিশিষ্টভাবে উজ্জয়িনী।'

আমরা জানি উজ্জয়িনী প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের রাজধানী। রবীন্দ্রনাথের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য বলতে কালিদাসের রচনাকেই বোঝায় এবং প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা বলতে উজ্জয়িনীর জীবনযাত্রাকে বোঝায়।

কবিতার নাম 'স্বপ্ন'। সত্যিই এই কবিতায় লক্ষ্য করা যায় এক স্বপ্নিল আবহ। কবিতার প্রথমেই আমরা পাই :

'দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্ব-জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।'

কবি খুঁজেছেন তাঁর প্রথমা প্রিয়ারে' এবং তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

'মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্মহাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক (অনুপ্রাস লক্ষণীয়) মাথে
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা
চরণে নপুরখানি বাজে আধা-আধা।'

আলোচ্য অংশে লোধ্ররেণু, কুন্দকলি, কুরু বক', রক্তাম্বর, 'নীবীবন্ধে' শব্দগুলির প্রয়োগ লক্ষণীয়। উপরোক্ত শব্দগুলির প্রয়োগের মাধ্যমে প্রিয়ার সাথে মিলনের যথার্থ আনন্দ সম্ভোগের একটা আন্তরিকতা আছে। এই শব্দ সমন্বয়ের মাধ্যমে কবি তাঁর মানসপ্রিয়ার সৌন্দর্যের নান্দনিক ব্যাপ্তিকে করেছেন প্রসারিত, অভাবনীয়। অত্যন্ত সাধারণ ফুলগুলির সংস্কৃতরূপকে প্রয়োগ করে কবি তাঁর প্রিয়ার লাবণ্যকে অসামান্য করে তুলেছেন।

বলা বাহুল্য তাঁর প্রিয়ার সান্নিধ্যলাভ করা সহজ নয়। কারণ তাঁর—

'প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভ ভরে।"

কবিতার এই অংশটি মনে করিয়ে দেয় আলোক সামান্য কবি কীটসের Endymion কবিতার কথা। লক্ষণীয়—

'Forth from a rugged arch in the dusk below'
Come mother Cybele! alone–alone–
In sombre chariot;'

মা সিবিলি আসছেন রথারূঢ়া হয়ে। মন্দাক্রান্তা ছন্দে (The Sluggish wheels') আসছে রথ এবং—

'With turrets crown'd
Four maned lions hale
The sluggish wheels;'

চারটি সিংহ রথকে জানায় স্বাগত। তাদের অবয়বের বর্ণনা মনে করায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা। লক্ষণীয়—

"...Solemn their tooth maws
Their surely eyes brow-hidden, heavy paws
uplift drowsily..."

কীট্‌স এখানে শব্দসমূহের অসামান্য প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এক নিদ্রালস পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথও তাঁর শ্রুতি সংযমতার বলে প্রাচীন ও অব্যবহৃত ভাষাকে শ্রাব্য সৌন্দর্যে ('স্তম্ভ', গম্ভীর, দম্ভ (brow–hidden') ও অর্থ-গৌরবে ভরিয়ে স্থাপত্য শিল্পের মতো গড়ে তুললেন। এর কারণ হল কবি তাঁর সহজাত কানকে নিরলস চর্চায় 'industrious ear' করে তুলেছেন।

যাইহোক, এরপর আমরা পাই—'ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা'।

এবং কবিকে দেখে তার মনে অনেক আশা জাগিয়ে—

'প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড' পরে।
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।'
.....
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো, সন্ধ্যাতারা করে।'

এই অংশটি কেন জানিনা কীটসের ওড্ টু অ্য নাইটিংগেল' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে আমরা পাই—

'....tender is the night,
And haply the qeen-Moon is on her
cluster'd around by all her storry Fays.'

এরপর কবির হৃদয় যখন উদ্বেল এক মধুর মিলনের আশায় কেননা তাঁর প্রিয়ার,

'অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ বেশ ধূপ বাস।'
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।'

তখন কবি কণ্ঠে শোনা যায়—

'রয়েছি বিজন রাজপথ পানে চাহি
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি।'

এবং অবশেষে—

'ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, এই আমি।'

কবি কীট্‌সের ভাবনার সাথে এক অভাবনীয় সখ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর পূর্বোক্ত কবিতায় তিনি বলেন—

'Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self!

Adicu! the fancy cannot cheat so well
As she is fam'd to do, deceiving elf.'

রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য কবিতার শেষ দুটি লাইন মনে করিয়ে দেয় কীট্‌সের কবিতার শেষ দুটি লাইনের কথা—

'.....now' tis buried deep
In the next valley-glades,
was it a vision, or a waking dream?

এখানেই জীবনের ট্রাজিডি, জীবনে যারা একসময় সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল আজ যদি কোনো মন্ত্রবলে তারা ফিরে আসে তাহলে কি আবার তারা আগেকার সেই জায়গাকে ফিরে পাবে? মালবিকা সেই প্রাচীন জীবনের প্রতীক। তা ছাড়া জীবিতদের কাছে জীবনের আকর্ষণ বেশি, নতুন মানুষ ও ভাবনা এসে বিগতার শূন্য আসন দখল করে নেয়। আর তাই মালিবিকা তার পুরনো স্থানটি অচ্যুত রাখতে সক্ষম হয় না। তবুও এই অতীত স্বর্গের উপভোগ একমাত্র কল্পনাতেই সম্ভব। কবি তাঁর কল্পনা ও ধী-শক্তির সাহায্যে সেই প্রাচীন জীবনকে উপভোগ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। 'য়েট্‌সের সেইলিং টু বায়জানটিয়াম' কেন জানি না মনে উঁকি দেয়।

গ্রন্থ ঃ ১। সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ—প্রমথ নাথ বিশী।

সূত্র ঃ

১। রোমান কবি হোরেসের একটি বিখ্যাত ঔড্ এর কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় কালিদাসের কবিতায়। তার ১.১১ অংশে আমরা পাই—

'Carpediem, quam minimum credula postero.'

অর্থ সম্ভবত ঃ

'Pluck the day [as it is ripe] trust tomorrow as little as you may.'

২। দেখুন Burnt Norton (no 1 of 'Four Quartets)

৩। বিষয়টি একটু অন্যভাবে দেখলে মনে পড়ে যায় পার্সি বিশ্ শেলির, কবি সম্পর্কে একটি উক্তি। তাঁর একটি রচনায় (A voice Not Understood. P. 51) তিনি বলেন ঃ (for they learn in suffering what they teach in song.'

৪। জন কীট্‌স তাঁর On the Sonnet শীর্ষক সনেটে এক জায়গায় বলেন—

'let us inspect the lyre, and weigh the stress
of every chord, and see what may be qained
By ear industrious, and attention meet;
Misers of sound and syllable, no less.'

কবিতার অন্তরালে যে সংগীতময়তা লীন থাকে তাকে হৃদয়ে তন্ত্রীতে অনুভব করার জন্য এক ধরণের শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৈরি করতে হয়। এই কারণেই তাঁর ঔড অন অ্য প্রেসান অর্ন' কবিতায় তিনি বাঁশীবাদককে বলেন ঃ

'Heard melodies are sweet, but those unheard

Are sweeter...'

এবং তাঁর উপদেশ ঃ

'play (Pipe) on;
Not to the sensual ear, but,
more endear'd

pipe to the spirit ditties of no tone : কবিগুরু এই 'unheard' music শুনেছেন তাঁর হৃদয়ের ও অনুভবের তন্ত্রীতে।

৫। কেন জানি না মনে পড়ে যায় বোদেলেয়াবের বিখ্যাত 'la Chevelure' বা Hair কবিতা। মনে পড়ে 'O fleece, that down the neck waves to the nape!

O curls! O perfume non chalant and rare!
O ecstary!.....that in these tresses sleep'.

'রথের রশি'র রবীন্দ্রনাথ

মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা

কবি বা লেখককে তাঁর জীবনচরিত গ্রন্থে যথার্থরূপে পাওয়া যায় না। রচনার মধ্যেই লেখক নিহিত থাকেন। জীবনচরিতে থাকে লেখকের জীবনীমাত্র; কিন্তু রচনার মধ্যে জীবনী ছাড়াও থাকে লেখকের মন ও মনন। কেননা, সাহিত্য হল সমাজ ও কবি-মনের শিল্পিত প্রকাশ। এবং সাহিত্যিকও সমাজবিবর্জিত নন। তাই সাহিত্যে অর্থাৎ কোনো রচনার মধ্যে লেখকের 'আমি' ভাব-বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়। কোনো কোনো সাহিত্যে ক্ষীণ সূত্র থাকলেও অনেক সাহিত্যে লেককের এই 'আমি' দিকটি অনেক বেশি লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ প্রবন্ধে 'আমি' দিকটি অনেকটা প্রত্যক্ষ মনে হলেও তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্প- নাটকাদিতেও তা কম প্রতিফলিত হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর 'কালের যাত্রা'র 'রথের রশি' নাটিকাকে স্মরণ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা' (১৯৩২) যখন লিখছেন তখন ভারতবর্ষ পরাধীন। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা পাবার মানসিকতা তখন ভারতবাসীকে দুর্বার-বেপরোয়া ও মরীয়া করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথও তখন সদ্য রাশিয়া-ভ্রমণ সেরে স্বদেশে ফিরেছেন। তিনি রাশিয়ায় দেখেছেন কার্লমার্কসের নেতৃত্বে শ্রমজীবি মানুষের গণজোট, উত্থান ও শাসনক্ষমতা লাভ। দেখেছেন অত্যাচারী-শোষকের পতন ও খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিক-মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবি দলিত মানুষ দেশের শাসক হয়ে দেশে বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন এনেছে। রাশিয়ার সেই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় তথা ভারতে পরিবর্তন আনতে চাইলেন; ভারতবাসীর হতাশা কাটিয়ে আশার আলো দেখাতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই মন ও মনন, ভাব-মানসিকতা ব্যক্ত হয়েছে 'কালের যাত্রা'র 'রথের রশি'তে।

'কালের যাত্রা' রূপক নাটক। এর রূপ-উন্মোচনে মূল ভাব ও রবীন্দ্রনাথের 'আমি' দিকটি উন্মোচিত হবে। 'কাল-মহাকাল, 'যাত্রা'-যাওয়া। মহাকাল যে চলেছে তারই রূপক 'কালের যাত্রা'। 'রথ' বলতে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন এই দেশ, সমাজ বা রাষ্ট্র অর্থাৎ ভারতবর্ষকে; আর 'রশি' বলতে বুঝিয়েছেন দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বন্ধনকে। এই মানুষের সম্পর্কের বন্ধনে গ্রন্থি পড়লে 'রথ' তথা সমাজ বা রাষ্ট্র অচল হয়ে যায়, তখন মানুষের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত জীবন ধারা স্তব্ধ ও ব্যাহত হয়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সেই চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের নানান কুসংস্কার, ক্রিয়াচার-লৌকিকতা প্রভৃতি সমাজের স্বাভাবিক গতিধারাকে কিভাবে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। তাছাড়া প্রবল শক্তিমান ও বুদ্ধিমান ইংরাজ রাজশক্তি যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে, তাতে ভাবাই যায় না যে তারা একদিন বিদায় নেবে, ভারতবাসী স্বদেশকে পুনরুদ্ধার করবে, হৃতগৌরব লাভ করবে। কিন্তু কবি-ভাবুক রবীন্দ্রনাথ সত্যদ্রষ্টা ঋষিতুল্য। তিনি প্রজ্ঞা দিয়ে অনুভব করে প্রত্যক্ষ করেছেন ভবিষ্যৎকে। অনুসরণ করেছেন

ইতিহাসের গতিধারাকে। তিনি ইতিহাসের ধারানুসরণে বুঝেছেন কোনো একটা শক্তি চিরন্তন শক্তিমান থাকে না; একদিন-না-একদিন সে দুর্বল হবেই। তাছাড়া ঈশ্বর বলে একজন বা অলৌকিক শক্তি বা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে কিছু একটা আছে—সেই-ই কিছুতেই তা হতে দেবে না।

আমার বক্তব্য রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি'র বিষয়বস্তু বলা নয়; 'রথের রশি'র রবীন্দ্রনাথকে আমি কেমনভাবে পাই এবং 'রথের রশি'তে তিনি নিজেকে কতটা মেলে ধরতে পেরেছেন। ইংরাজ-রাজত্বের ঘর-দাপটের কালে রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি'তে যেকথা বলেছেন তা সেকালের পক্ষে দুঃসাহসিক ব্যাপার এবং একালের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যতেও।

'রথের রশি'তে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন রথযাত্রার মহোৎসবের দিন—পসারীরা নানা রকমের পসার সাজিয়ে আছে, মেয়েরা দলে দলে এসেছে পূজা দিতে, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় বিড় বিড় করে মন্ত্র পাঠ করে চললেও রথ চলে না। মেয়েরা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে রথ কখন চলবে জানার জন্য। রথ না-চালাতে পেরে এবং মেয়েদের উপর্যুপরি জিজ্ঞাসাবাদে পুরোহিত বিস্মিত, ক্রোধান্বিত ও চিন্তিত হয়ে ওঠে। মন্ত্রীও অবাক হয়ে যায়। পুরোহিতের মন্ত্রে রথ চলছে না দেখে ডাক পড়ে সৈনিকদেরকে। তারা এসে বলে বাবার রথ চালায়নি কখনো তারা, চালাতে সাহায্য করেছে, রথ চলার পথে বাধা সৃষ্টিকারীর রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। সৈনিকদের হাতে রথ না-চলায় ডাক পড়ে বেনের দলের। বেনের দল এসে অকপটে বলে—তারা কখনো রথ চালায়নি, রাজ্যে অনর্থপাত ঘটলে—অভাব-অনটনের সময় তাদের ডাক পড়ে এবং তাদের আর্থিক সাহায্যে রথ চলে। তবুও তাদের ডাক পড়ায় রথ চালানোর চেষ্টা করলো—রথে হাত দিয়ে দেখলো, কিন্তু তাদের হাতে রথ চললো না; তখন তারা কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দেয় পুরনো হিসেবপত্রের খাতা সামলাতে বা উলোট-পালোট করে দিতে। এমন সময় বাঁধভাঙা জলের মতো আসে শূদ্রের দল—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা যাদের নাম ধরে ডাকতেও ঘৃণা করতে—বিকৃত ও কুৎসিত নাম দিয়ে ডাকত, তারা এসে বাবার রথ চালবার কথা বললে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের দল তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে এবং শূদ্রদের এমন দুঃসাহসিকতা ও দুর্বিনীত ভাবের প্রতিবিধিৎসাতে সৈনিকের অস্ত্র ঝন ঝনাৎ করে ওঠে রক্তে রাঙিয়ে দেবার জন্য। বেগতিক দেখে মন্ত্রী পুরোহিত-সৈনিকদের দলকে দাবিয়ে রেখে শূদ্রদের প্রাধান্য দেয় এবং বাবার রথ চালাবার নির্দেশ ও অধিকার দেয়। শূদ্ররা রথের রশিতে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই রথ চলতে থাকে আপনা-আপনি ভাবেই, যেন রথ টানতে হচ্ছে না—আপনাতেই চলছে; কিন্তু উল্টো পথে—চিরকাল যে পথে চলত সে পথে নয়, অন্য পথে।

আগেই বলেছি 'রথের রশি' রূপক নাটক। মহৎ কবি শিল্পী যখন কোনো মহৎ ভাব বা বিষয়কে সরাসরি প্রকাশ করতে পারেন না, তখন তাঁরা একটা আড়াল বা অবলম্বন নেন, সেই আড়াল বা অবলম্বন হল রূপক। রূপক দ্ব্যর্থবোধক। এর বহিরঙ্গে বাহ্যিক অর্থ—সাধারণ কাহিনী কিন্তু অন্তরঙ্গে আভ্যন্তরীণ বা নিহিতার্থ—গভীর-গূঢ় অর্থ —যা লেখকের একান্ত অভিপ্রেত অর্থ। এই নাটকের নিহিতার্থে তথা লেখকের অভিপ্রেত অর্থে রবীন্দ্রনাথকে পাই

এবং 'আমি' রবীন্দ্রনাথকে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিকভাবে মনে করি।

'রথের রশি'র রূপক উন্মোচনে দেখা যায় 'পুরোহিত' ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতীক; 'নাগরিক', 'মেয়েরা'ও তাই। 'সৈনিক' ক্ষত্রিয় শ্রেণীর, 'বেনে' বৈশ্য শ্রেণীর প্রতীক এবং 'শূদ্র' হল সাধারণখেটে-খাওয়া শ্রমজীবি কৃষক-শ্রমিক-মজুর শ্রেণীর মানুষ। 'মন্ত্রী' মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণীর প্রতিভূ। আর 'কবি' চরিত্র হল বিবেক, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা ঋষিতুল্য। 'কবি' চরিত্রেই যেন রবীন্দ্রনাথের self reflection ঘটেছে।

আমাদের দেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ শাসন করেছে। একটা সময়ে ব্রাহ্মণেরা শাসন করতো এ দেশ—মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাস ছিল তখন। পরে এলো ক্ষত্রিয়ের শাসন। সৈনিকের তথা ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রতেজে টলমল করেছে এ দেশ। তারপর শাসন করেছে বৈশ্য অর্থাৎ বেনে বা ব্যবসায়ী। আমাদের দেশে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছে ইংরাজ রাজত্বকালে, ইংরাজদের শাসনকে বলা যায় বৈশ্যের শাসন। রবীন্দ্রনাথ যখন নাটকটি লিখেছেন, তখন এদেশে দাপটের সঙ্গে শাসন করছে ইংরাজ। বাংলা তথা ভারতের কোনো মানুষ ভাবতেই পারেনি ইংরেজ এ দেশ থেকে নির্মূল হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার দৃষ্টান্তের সেই ইংরাজ-রাজত্বকালেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বৈশ্য-ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটবে এবং শ্রমজীবি সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। নাটকে ১৯৩২ খ্রীঃ তিনি যে কথা বলেছেন, পরবর্তী কালে ১৯৪১ খ্রীঃ 'আরোগ্য' কাব্যের 'ওরা কাজ করে' কবিতায় সেই কথাই আরও স্পষ্ট ভাষায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ শাসকের অভ্যুত্থান এবং ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে তার পতন ও শ্রমজীবি মানুষের চিরন্তনতা প্রকাশ করেছেন—

"প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ
জানি, তারও পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ-বেড়া জাল
জানি তার পণ্যবাহী সেনা
জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।"

রবীন্দ্রনাথ তাই 'রথের রশি'তে দেখিয়েছেন বৈশ্যের হাতেও রথ চললো না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মতো বৈশ্যের শাসনও বাংলা থেকে শেষ হবে, আসবে শূদ্রের অর্থাৎ খেটে-খাওয়া সাধারণ কৃষক-শ্রমিক মজুর তথা দলিত শ্রেণীর শাসন। আর শূদ্রদের হাতের ছোঁয়ায় রথ চলছে অন্য পথে, নতুন পথে—এরও তাৎপর্য গভীর ও ব্যঞ্জনাবহ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরা যে নীতি-নিয়ম ও ধারাবৈশিষ্ট্যে শাসন করেছে সেভাবে চলবে না সাধারণ মানুষের শাসন-পরিবর্তন ও পরিবর্তনমুখিতা হল তাদের শাসনের মূলমন্ত্র—ধারাবৈশিষ্ট্য। আর বৈশ্যের হাতে রথ না চলায় এবং শূদ্রদের আগমন-স্রোত দেখে কোষাধ্যক্ষের প্রতি বেনের দলের নির্দেশবাণীও গভীর তাৎপর্য বহন করে। পরিবর্তনমুখী

নতুন সরকার শূদ্রশাসক যে ছেড়ে কথা বলবে না, বিগত দিনের বঞ্চনা-শোষণ ও আত্মসাতের তিল তিল হিসেব নেবে ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে সেই কথাই ব্যঞ্জিত হয়।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের আলোকে আমরা আমাদের দেশের বর্তমানকে এবং এই সূত্রাবলম্বনে বিশ্বের যে-কোনো দেশকে বিচার-সমীক্ষা করতে পারি। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ সব কালে সব যুগে প্রাসঙ্গিক। ইংরাজ শাসনের পর আমাদের বাংলায় কমিউনিজম-নীতিতে শূদ্র-শাসন অর্থাৎ সমাজের খেটে-খাওয়া শ্রমজীবি মানুষের প্রতিনিধির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বুর্জোয়া শাসনের অবসান ঘটেছিল। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। 'রথের রশি'তে নাগরিক বা কবি চরিত্রকে প্রশ্ন করেছিল—এই শূদ্রের শাসন কি চিরকাল চলবে? প্রত্যুত্তরে কবি বলেছিলেন—যেদিন এরাও ধরাকে সরা জ্ঞান করবে, হলধরের মাতলামিতে জগৎটা পূর্ণ করবে, অর্থাৎ এই শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি শাসক গোষ্ঠী যেদিন শোষক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্রে পরিণত হয়ে যাবে—সেদিন এদেরও পতন ঘটবে—

"তার পরে কোন্ এক যুগে কোন্ একদিন
আসবে উল্টো রথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।"

কবির কাছে প্রশ্ন—তবে কি পরে আবার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় পরম্পরায় শাসন চলবে? কবি বলেছিলেন—না। আবার আসবে উল্টো রথের পালা—আবার যারা শোষিত - বঞ্চিত - অত্যাচারিত —তারই হবে শাসক। তাই সবার প্রতি কবির উক্তি ঃ

"আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে;
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।"

কোনো রকমের রাজনীতির পক্ষপাতপুষ্ট না হয়ে সাধারণভাবে সমীক্ষা করলে দেখা যাবে বাংলার বর্তমান শাসন সেই পরবর্তী শোষিত-বঞ্চিত শ্রেণীর শাসন। এই শাসনের প্রস্তুতি পর্বে বা ঊষাকালে দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন অফিসে আগুন লেগে পুড়ে যাবার ঘটনা। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় ধনপতির উক্তি ঃ

'ওহে খাতাঞ্চি, এই বেলা সামলাও গে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ, সিন্দুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।"

আসলে হিসেব মেলাতে না পারার, কিংবা পুরনো নথিপত্র ধূলিস্যাৎ করার সহজ-সুলভ-কৌশল নয় কি এটা?

সবশেষে শুধু-এই কথাই বলে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা শেষ করব। রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি'র অনুসরণে বলতে পারি—বর্তমানও পরিবর্তিত হতে পারে যদি তারা হলধরের মাতলামিতে জগৎটা পূর্ণ করে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে, শোষণ-বঞ্চনা-হানাহানি রক্তারক্তিতে মেতে ওঠে। তখন আবার যারা শোষিত তারা শাসন করবে এই দেশ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ ও 'রথের রশি' এক স্মরণীয় অধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের লোক উপাদান সংগ্রহ ও পদ্ধতি

মনোজ মণ্ডল

সব সমালোচক এক বাক্যে স্বীকার করেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই বাংলার প্রকৃত লোকসাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। এদেশে আগত বিদেশীয়রা লোকসংস্কৃতি চর্চা শুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের লোকসংস্কৃতি চর্চায় জাতীয়তাবোধ, দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ, দেশের মানুষের-সুখ-দুঃখ-আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি—কিছুই ছিল না। ছিল কেবল সুষ্ঠু শাসন কার্য পরিচালনা, খ্রীষ্টধর্মের প্রচার আর আত্মপ্রচারের তীব্র তাগিদ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখালেন দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি ভালোবাসা জন্মালে তবেই প্রকৃত লোকসাহিত্য চর্চা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য চর্চার প্রেরণা হিসাবে রয়েছে জাতীয়তা বোধ। একদিকে দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ, অপর দিকে তীব্র স্বাজাত্য বোধ (বাঙালি হিসাবে আত্ম প্রতিষ্ঠার তীব্র বাসনা) রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের মধ্যে অন্বিষ্ট।

দীর্ঘকাল দেশ পরাধীন। পরাধীনতার বিরুদ্ধে নানাভাবে ঠাকুর পরিবারের স্বদেশানুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমেলা' তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা স্বাদেশিকতাবোধের জোয়ার এনেছিল। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে 'হিন্দুমেলা'র ঘনিষ্ঠ একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথের যখন মাত্র তের বছর বয়স তখন 'হিন্দুমেলা'র নবম অধিবেশনে (১৮৭৪) রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে 'হিন্দু মেলার উপহার' নামে একটি কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধ বেশ গভীর ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন- ''বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বাদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগ্রতে ছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়া ছিল! বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশ-প্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোন নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল। আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত।"[১]

ঠাকুর পরিবারে দেশীয় শিল্প প্রসারের চেষ্টায় 'সঞ্জীবনী সভা', মেয়েদের (স্বর্ণ কুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত) 'সখি সমিতি'র করেন মধ্য দিয়ে মহিলা শিল্প মেলা, দেশহিতকর নানা অনুষ্ঠান ও ভাববিনিময়ের মধ্য দিয়ে স্বদেশ ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। ''নবোন্মেষিত স্বদেশ চেতনা ও পারিবারিক পরিবেশের স্বতস্ফূর্ত আনুকূল্য রবীন্দ্রনাথকে শৈশব থেকেই নিজ দেশের মাটি আর মানুষের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রন্থিত করে দিয়েছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই গ্রন্থি একবারের জন্যও আর ছিন্ন হয়নি। যখন পাশ্চাত্য ভাবধারার দিকশুন্য পশ্চাদানুসরণে সবাই মত্ত, রবীন্দ্রনাথ তখন অন্তরের সবটুকু আবেগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে দেশের লুপ্তপ্রায় লোকায়ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও সংগ্রহে ব্রতী হলেন।''[২]

জাতীয়তাবোধের আর এক পরিচয় নিহিত আছে স্বজাতি প্রেমের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশপ্রেম মানে দার্শনিক তত্ত্ব বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মাত্র নয়। দেশপ্রেম মানে দেশকে জানা, দেশের মানুষকে জানা, তার সংস্কৃতিকে জানা। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমে ছিল বাঙালিত্ব প্রতিষ্ঠার বাসনা। বাঙালির কর্মকাণ্ড তার লোকায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই স্বজাতি প্রেমের স্বরূপ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি-প্রীতির কথা বলতে গিয়ে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন - ''বিচিত্রগামী রবীন্দ্রনাথের ধারায় কতদিক থেকে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির কত প্রবাহ এসে যে মিলিত হয়েছে তার ঠিক নেই।.... দেশীয় জনকৃতির প্রতি অনুরাগের উৎস স্বজাতি প্রেম। কিন্তু দেশপ্রেম বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি তার সঙ্গে গভীরতা ও প্রসারের দিক থেকে এ স্বজাতি প্রেমের তফাৎ অনেক ..... ইংরেজী অভিমানী মাতৃভাষা-দ্বেষী বঙ্গবাসীর দেশ প্রেমের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে এসে বৃহত্তর জনসমাজের মনের অন্দর মহলে প্রবেশ করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি প্রীতির জন্ম, এবং এই জাতিজনপ্রীতি থেকে লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ উৎসারিত।''[৩]

রবীন্দ্রনাথই প্রথম উপলব্ধি করলেন বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের প্রকৃত পরিচয় পেতে গেলে লোকসংস্কৃতির চর্চা অপরিহার্য। লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগবশতই শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলার লোকঐতিহ্যের নানা উপাদান সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ ও পদ্ধতির কিছু নিজস্বতা রয়েছে। সেগুলির প্রতি আলোকপাত করাই আমাদের লক্ষ্য।

লোকসংস্কৃতির প্রধান কাজ হল সমাজজীবনের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করা। আর এই সংগ্রহ একটি বিজ্ঞাননির্ভর কাজ। যে যুগে বাংলায় তথা ভারতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের বিষয়টি কারোর জানা ছিল না, সেই যুগে রবীন্দ্রনাথ লোকউপাদান সংগ্রহ করেছেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথ মূলত দুইভাবে লোকউপাদান সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। এক, তিনি নিজে সংগ্রহ করেছেন। আর দুই, অপরকে দিয়ে সংগ্রহ করিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০১ সনের 'সাধনা' পত্রিকার আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় 'মেয়েলি ছড়া' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তারপর 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকার ১৩০১ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ছেলে ভুলানো ছড়া — কলকাতায় সংগৃহীত' নামে আর একটি রচনা-সংকলন। পরবর্তীকালে রচনা দুটি 'লোকসাহিত্য' (১৩১৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং রচনা দুটির নামকরণ করা হয় যথাক্রমে 'ছেলে ভুলানো ছড়া — ১' এবং 'ছেলে ভুলানো ছড়া — ২'। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন— ''বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।''[৪]

রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার যে, তিনি নিজে সংগ্রহ কাজে ব্রতী ছিলেন। গ্রাম-বাংলার প্রচলিত ছড়া রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। সেই কারণে তিনি ছড়া সংগ্রহে আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর ছড়া সংগ্রহে অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে দুটি সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে।

এক. ছড়ার 'অত্যন্ত স্নিগ্ধ-সরস এবং যুক্তি সংগতিহীন', 'আদিম সৌকুমার্য'-এ মোহিত হয়ে।

এবং দুই. এগুলি 'আমাদের জাতীয় সম্পত্তি' — এদের সংরক্ষণের তাগিদে।

ছড়ার সৌন্দর্য, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তিনি বলেছেন-''একমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলাম। রুচিভেদবশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধকরি কাহারও মতান্তর হইতে পারেনা। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।''[৫]

রবীন্দ্রনাথ নিজে শুধু ছড়া নয়, ব্রতকথা, লোককথাও সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লোককথা সংগ্রহের বিষয়টি আমরা অবনীন্দ্রনাথের বক্তব্যে পাই। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালীন অবনীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন কলকাতা থেকে রূপকথা সংগ্রহ করতে। অবনীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছিলেন। পরে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় আসার পর ''রবিকাকা একখানি খাতা দিলেন; বল্লেন-'এই খাতায় রূপকথা আছে। দেখতো তুমি এর থেকে গল্প লিখতে পারো কিনা'। তা থেকে আমি ক্ষীরের পুতুল, চোর চক্রবর্তী ও আরও অনেক ছোট গল্প লিখলুম, আমার শকুন্তলা (১৮৯৫) লেখার পর।''[৬]

এ থেকে স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ নিজে রূপকথা সংগ্রহ করে অবনীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মিসেস পি. কে. রায় (সরলা রায়)-কে (১৩০০ আষাঢ়) ছড়া সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ছড়া তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছেন কিনা জানা যায় না। তবে পরের মাসেই অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন- ''আমি ইতস্তত হইতে অনেকগুলি ছড়া সংগ্রহ করিয়াছি এবং গল্পও গুটি দশ বারো পাওয়া গেছে।''[৭]

এভাবেই আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজের সংগ্রহের কথা জানতে পাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে

যেমন ছড়া, গান, লোককথা সংগ্রহ করেছেন, তেমনি নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে, তাগাদা দিয়ে অন্যদেরকেও সংগ্রহ কার্যে সামিল করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৭ই আষাঢ় শিলাইদহ থেকে একটি চিঠি লেখেন মিসেস পি. কে. রায়কে (প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা রায়কে)। চিঠিতে তিনি অনুরোধ করে লেখেন- ''ইংরেজিতে যেমন Nursery Rhymes আছে আমি সেইরূপ বাঙলার সমস্ত প্রদেশের ছড়া সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।.....আপনি যদি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত কাহারো নিকট হইতে যথাসম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন ত বড় উপকার হয়।''[৮]

আবার অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথকে লেখা চিঠির বিষয় থেকে ছড়া সংগ্রহের কথা জানা যায়—''রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর থেকে একটি তারিখহীন চিঠিতে অবনীন্দ্রনাথকে লিখেছেন — 'আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতকগুলি ছড়া পাওয়া গেল। বেশ লাগচে। এখানে আমাদের সাজাদপুরের খাজাঞ্চির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া যোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করচি।'.....গগনেন্দ্রনাথকে শিলাইদহ থেকে লিখেছেন — 'তোমাকে আমার সেই ছড়া সংগ্রহের কথা স্মরণ করাবার জন্যে এই পত্রখানি লিখচি—সে কথাটা যেন ভুলো না এবং অধিক বিলম্বও করো না।''[৯]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দেন। সেই ভাষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন- ''সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্য-পরিষৎ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।''[১০]

রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহ ও প্রকাশ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পেশ করা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩০১ সনের মাঘ সংখ্যায় যে 'ছেলে ভুলানো ছড়া — কলিকাতায় সংগৃহীত' রচনা প্রকাশিত হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহের স্থান প্রসঙ্গে মন্তব্য করে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার পাঠকদের উদ্দেশ্যে ছড়া সংগ্রহের অনুরোধ জানান। তিনি বলেন—''আমরা যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। কোন্ গুলি কোন্ প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ থাকিবে। পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, কলিকাতায় যে ছড়াগুলির সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাদের কোন্‌টা কোন্ প্রদেশে প্রচলিত তাহার নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বন্ধুগণ যাঁহাদের নিকট হইতে এগুলি আদায় করিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ অনেকেই কলিকাতার লোক নহেন। এক্ষণে সাহিত্য-পরিষদের পাঠকগণের নিকট সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁহারও যথাসাধ্য আমাদের এই সংগ্রহকার্য্যে সাহায্য করিবেন।''[১১]

বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য-অংশটি তাঁর 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে রাখা হয়নি, বর্জিত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ শুধু ছড়া সংগ্রহ করেননি, লোককথা, ব্রতকথাও সংগ্রহ করেছেন। ব্রতসংগ্রহের প্রমাণ হিসেবে আমরা কিছু মন্তব্য উদ্ধার করতে পারি।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেয়েলি ব্রত' গ্রন্থের মুখবন্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন— ''সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।''[১২]

রবীন্দ্রনাথ যে বাংলার ব্রত সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, তার একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করছি—যেটি রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' কিংবা তাঁর অন্য কোন গ্রন্থে স্থান পায়নি। তিনি 'ছেলে ভুলানো ছড়া — কলিকাতায় সংগৃহীত' (সাহিত্য পরিষদ, ১৩০১, মাঘ) রচনায় '*' চিহ্নিত পাদটীকায় বলেছেন—

''উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশের পুরনারীগণ আমষষ্ঠী, মূলাষষ্ঠী প্রভৃতি ব্রতের কথা বলিয়া থাকেন। এগুলি শাস্ত্রের কথা নামে পরিচিত আছে। এখন ব্রতাদির লোপের সঙ্গে এই কথাগুলিরও বিলোপদশা ঘটিতেছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ উক্ত কথাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলে ভাল হয়। এতদ্ব্যতীত মাঘ মাসে কোন কোন প্রদেশে হেঁচোড়া ঠাক্‌রুণের পূজা হইত। এখন হয় কি না, জানি না। বাড়ির উঠানে কুলগাছ পুঁতিয়া, ছোট ছোট ভাইভগিনীগুলি একমাস কাল প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাবেলা কোমলকণ্ঠে ছড়া গাইয়া হেঁচোড়া পূজা করিত। যেরূপ মনে আছে, একটি ছড়ার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি —

হেঁচোড়া ঠাক্‌রুণ লো ফ্যাচোঁড়া চুল।
তাতে কি শোভে লো গাঁধা ফুল।
গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া।
পাড়া পড়সী লো জয় জোকার দিয়া।
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোনার যাদুধন কোলে তুলে নেব।

এই সকল ছড়া সংগ্রহ করা আবশ্যক''[১৩]

—এখানে রবীন্দ্রনাথ ছড়া বলতে ব্রতমন্ত্রকে বুঝিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহের ব্যাপারে 'গ্রাম্যসাহিত্যে'ও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- ''গ্রাম্য ছড়া-সংগ্রহের ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা আমাকে লিখিতেছেন—''[১৪] ইত্যাদি ।

রবীন্দ্রনাথ শুধু ছড়া, ব্রত, লোককথা সংগ্রহ এবং সংগ্রহের জন্য আহ্বান করেননি, তিনি লোকসাহিত্যের অন্য উপাদান সংগ্রহ করতেও অনুরোধ করেছেন। ১২৯০ সনের 'ভারতী'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'বাউল গান' নামে একটি সমালোচনা। সেখানে তিনি আবেদন করেছেন—

''সঙ্গীত সংগ্রহের অপরাপর খণ্ডের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ (যে বিষয়ের ও সে যে সম্প্রদায়েরই হউক না কেন) সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়। আমরা দেশের লোকদের ভাল করিয়া চিনিতে পারি, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা ভরসা আমাদের নিকট নিতান্ত অপরিচিত থাকে না। ভিক্ষুকরা, মাঝিরা যেসকল গান গাহে, তাহা লিখিয়া লইতে অধিক পরিশ্রম নাই। আমরা এইরূপ দুই-একটি গান লিখিয়া লইয়া ছিলাম, তাহাই প্রকাশ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করি। এইখানে বলিয়া রাখিতেছি, পাঠকেরা যদি কেহ কেহ নিজ নিজ সাধ্যানুসারে প্রচলিত গ্রাম্যগীত সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তবে তাহা ভারতীতে সাদরে প্রকাশিত হইবে।"[১৫]

রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনেকে ভারতীর দপ্তরে গান সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। আর সেগুলি গুরুত্বসহকারে মুদ্রিত হয়েছে। ১২৯০ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার ভারতীতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

''আমরা বাউলের গান' নামক প্রবন্ধে পাঠকদিগকে প্রচলিত গীত সংগ্রহ করিয়া ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তদনুসারে নিম্নলিখিত গানগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।"[১৭]

মোট চারটি গান প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি হারু ঠাকুরের ও একটি গান রাম বসুর রচনা। বাকি দুটি গান মাঝিদের গান। তবে সংগ্রাহকের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের লোকউপাদান সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'সাধনা' পত্রিকায় আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় ১৩০১ সনে—'মেয়েলি ছড়া'। 'সাধনা'তে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ বিষয়ে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সাধনার ৪র্থ বর্ষের ১ম ভাগে 'পৌষসংক্রান্তি' নামের একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় তিনি কয়েকটি ছড়া প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে 'হেলেঞ্চ কল্মি লক্ লক্ করে/ তার উপরে পক্ষী চরে/ রাজার বেটা পক্ষী মারে।' —ছড়াটি বাল্যকালের স্মৃতি থেকে সংগ্রহ বলে লেখক জানিয়েছেন।[১৭] পৌষসংক্রান্তির দিনে বালকেরা নিম্নোধৃত ছড়াটি আবৃত্তি করে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন—

যে দেবে ডালা ডালা
তার হবে সাত গোলা,
যে দেবে বাটা বাটা
তার হবে সাত বেটা,
যে দেবে বাটি বাটি
তার হবে সাত বেটী,
যে দেবে মুঠো মুঠো
তার হবে হাত ঠুঁটো।[১৮]

আবার লদীব্রতের একটি ছড়াও প্রকাশ করেছেন, যেটি বাসুদেবপুর নিবাসী বিনয়কুমারের

কন্যা ও বোনের মুখে শুনেছেন। ছড়াটি এই—

পৌষ মাস লদী মাস যেও না
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেও না
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেও না
পৌষ মাস লদী মাস যেও না — ছড়াটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

''পাড়ার যুবতী ও বালিকাগণ দীপহস্তে গৃহাঙ্গনে ইতস্তত বেড়াইতেছে এবং সমস্বরে কি বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে বন্ধু গৃহেও সে শব্দ শুনিতে পাইলাম—আলোক হস্তে বিনয়কুমারের কন্যা ও ছোট ভগ্নিটি আলপনার উপর চাউল গুড়া ও একটি করিয়া দুর্বামণ্ডিত, সিন্দুর-রঞ্জিত গোবরের নুড়ি রাখিয়া যাইতেছে এবং বলিতেছে—পৌষমাস লদীমাস যেও না...."[১৯]

সাধনার ১৩০১ ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'ইন্দ্রপূজা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভাঁজো উৎসবের দুটি ছড়া প্রকাশ করেছেন। একটি-'ভাঁজো লো কল্‌কলানি মাটির লো শরা/ ভাঁজোর গলায় দেব আমার পঞ্চ ফুলের মালা।' এবং 'এক কলসী গঙ্গাজল, এক কলসী ঘি / বৎসরান্তে একবার ভাঁজো! নাচবো না তো কী?' একই প্রবন্ধে আরো কয়েকটি ছড়া প্রকাশ করেছেন। তিনি এই ছড়াগুলি সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য কাউকে বলেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন— ''আমাদের কোন আত্মীয় আরও ভাল ছড়া সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব আশা করি আমার সাধনার পাঠকগণকে তাহা উপহার দিতে সক্ষম হইব।"[২০]

রবীন্দ্রনাথের ছড়া সংগ্রহের ব্যাপারে আরো একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে—''তিনি তাঁর জমিদারির কর্মচারীদের উপর এই সকল ছড়া সংগ্রহের ভার দিয়েছিলেন। তাঁরাও যে কোন ব্যাপক অভিযান করে এগুলো সংগ্রহ করেছিলেন, তা' নয়, তাঁদের অনেকেই নিজেদের পরিবারের ভিতর থেকেই এগুলো সংগ্রহ করেছেন। ঠাকুরবাড়ির জমিদারির কর্মচারীদের মধ্যে প্রধানত দুই অঞ্চলেরই লোক ছিলেন, প্রথমত কলকাতা এবং তার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেরই এবং দ্বিতীয়ত পূর্ববাংলার প্রধানত যশোর অঞ্চলের; আত্মীয়তার সূত্রে যশোর জিলার অনেকেই ঠাকুর বাড়ির নানা শ্রেণীর কর্মেও নিযুক্ত ছিলেন। সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে এই দুই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ছড়াই রবীন্দ্রনাথের আলোচনার মধ্যে অধিক স্থান লাভ করেছে।"[২১]

আমরা বুঝতেই পারছি, রবীন্দ্রনাথ নিজে লোকউপাদান সংগ্রহ করেছেন। পত্রিকা ও পত্রের মাধ্যমে অন্যকে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের জন্য সানুনয় অনুরোধ করেছেন। পরিচিত অপরিচিতদের প্রবল উৎসাহিত করেছেন। আবার অন্যকেও সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেছেন। বস্তুত, লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে এমন বহুমুখী ভূমিকা পালনের দৃষ্টান্ত সেযুগে ভারতবর্ষে দূরঅস্ত, বিশ্বলোকসাহিত্য চর্চায়ও খুব বিরল ঘটনা। তাঁর এই ভূমিকাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়।

লোকসংস্কৃতি একটি বিজ্ঞাননির্ভর শাস্ত্র। প্রথমে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, তারপর শ্রেণীকরণ এবং শেষে বিশ্লেষণ। রবীন্দ্রনাথ আলাদা করে কোন পদ্ধতি উল্লেখ করেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের লোকউপাদান সংগ্রহ ও আলোচনায় বৈজ্ঞানিক ভাবধারারই প্রকাশ ঘটেছে। তিনি প্রথমে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং তারপরে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। সংগ্রহের কাজ তিনি দুভাবে করেছেন। নিজে সংগ্রহ করেছেন এবং অপরকে দিয়ে সংগ্রহ করিয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

সমাজবিজ্ঞানে তথ্যের শ্রেণীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজবিজ্ঞানে শ্রেণীকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

''The ways in which human beings organize perception, experience and social life by making distinctions, recognizing commonalities and naming.''[২২]

প্রতিটি বিষয় শৃঙ্খলারই শ্রেণীকরণের আলাদা রীতি ও ভঙ্গি রয়েছে। মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ সেই অর্থে লোকউপাদানের শ্রেণীকরণ করেননি। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে আলোচনাসহ শতাধিক ছড়া স্থান পেয়েছে। ছড়াগুলির শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট কিছু বলেননি। কখনো বলেছেন 'মেয়েলি ছড়া' (সাধনাতে প্রথম প্রকাশের সময়), কখনো বলেছেন 'ছেলে ভুলানো ছড়া', কখনো 'গ্রাম্য ছড়া'। আবার 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন, - ''ছড়াগুলির বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগ করা যায়। হরগৌরী-বিষয়ক এবং রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক।''[২৩] আমরা রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাকে তাঁর নিজস্ব-শ্রেণীকরণ-ভাবনা বলতেই পারি।

রবীন্দ্রনাথের এই লোকউপাদান সংগ্রহ ও পদ্ধতির স্বকীয়তা যেমন রয়েছে, তেমনি এই সংগ্রহ-পদ্ধতি অনুসরণ করেই দীনেশচন্দ্র সেন বাংলার অমূল্য রত্নভাণ্ডার পূর্ববঙ্গগীতিকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেকালে এবং একালেও, আরো অনেকে তাঁর সংগ্রহ-পদ্ধতি সামনে রেখে লোকসংস্কৃতি চর্চায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী (৯ম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ-৪৬৬২-৪৬৩

২। বন্দ্যোপাধ্যায় সলিল, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ-৫০

৩। ঘোষ বিনয়, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার লোকসংস্কৃতি, রবীন্দ্রায়ণ (২য় খণ্ড), সম্পাদক-পুলিনবিহারী সেন, বাকসাহিত্য, কলকাতা, ১৪১৪, পৃ-৬১-৬৩

৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, লোকসাহিত্য, র.র.বলী,৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ-৭৪৯

৫। ঐ, পৃ-৭৭০

৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, মুখবন্ধ, মেয়েলি ব্রত, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকা-বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ-১ (উদ্ধৃতাংশে 'ছেলে'র পরিবর্তে রয়েছে 'ছেয়ে'। এটি বোধ হয় মুদ্রণ বিভ্রাটই হবে। তাই আমরা 'ছেয়ে'র পরিবর্তে 'ছেলে' ব্যবহার করেছি।)

৭। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ, রূপকথার আদিকথা, রূপকথা, আশ্বিন, ১৩৪৮, সূত্র — রবিজীবনী, (৩য় খণ্ড), প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ-২৭১-২৭২

৮। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সরলা রায়কে লিখিত পত্র, ১৩০০, আষাঢ় , সূত্র — রবিজীবনী (৩য় খণ্ড), প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ-২৭১

৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সরলা রায়কে লিখিত পত্র, ১৭ই আষাঢ়, ১৩০০, সূত্র — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগৃহীত, ছেলে ভুলানো ছড়া, সম্পাদনা-অনাথ নাথ দাস, বিশ্বনাথ রায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৭, পৃ-২৫৯

১০। পাল প্রশান্তকুমার, (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথকে চিঠি লেখা প্রসঙ্গে), রবিজীবনী (৩য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ-২৭২

১১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ, রবীন্দ্ররচনাবলী (২য় খণ্ড), বিশ্বভারতী, ১৪০২, পৃ-৬৬৩

১২। সুবিমল মিশ্র সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৩, পৃ-১৮

১৩। পূর্বোক্ত ৬ সংখ্যক পাদটীকা

১৪। পূর্বোক্ত ১২ সংখ্যক পাদটীকা

১৫। পূর্বোক্ত ৪ সংখ্যক পাদটীকা, পৃ- ৭৯৪

১৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, বাউলের গান, ভারতী, ১২৯০ সন, বৈশাখ, পৃ- ৪০

১৭। ভারতী, ১২৯০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ- ৯৫-৯৬

১৮। সাধনা-সংকলন, ৪র্থ বর্ষ, ১ম ভাগ, (১৩০১ অগ্রহায়ণ, ১৩০২ বৈশাখ, পৃ-২৫৮

১৯। ঐ, পৃ- ২৬০

২০। ঐ। পৃ- ২৬২

২১। ইন্দ্রপূজা, সাধনা, ১৩০১ ফাল্গুন

২২। ভট্টাচার্য আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য, এ মুখার্জি এন্ড কো. প্রা। লি, ২০০২, পৃ- ২২

২৩। Neil J. Smslser and Paul B. Valtes, International encyclopaedia of the social and behavioral sciences, Vol-3, ELSEVIER, Oxford, UK, 2001, p-71

২৪। পূর্বোক্ত ৪ সংখ্যক টীকা, পৃ- ৭৯৫

'লালনদর্শন ঃ গানের পথে'

বিশ্বজিৎ পোদ্দার

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে একদল রহস্যবাদী সাধক কিছু উৎকৃষ্ট অধ্যাত্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, যেগুলি বাউল গান বলে পরিচিত। ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা বাহ্যিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ব্যক্তিকে বলা হয় 'বাউল'। 'বাউল' শব্দটি বাতুল বা 'ব্যাকুল' শব্দ থেকেও নিষ্পন্ন হতে পারে। মহাপ্রভুও নিজেকে 'বাউল' বলেছেন। আবার আরবী শব্দ 'আউল' যার অর্থ একান্ত ঈশ্বর সেবক বা হিন্দী শব্দ 'বাউর' যার অর্থ বায়ুরোগগ্রস্ত—তা থেকেও 'বাউল' শব্দটি আসতে পারে। যে 'বাউল' শব্দটি নিষ্পন্ন হোক না কেন এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মূলকথা— সীমাবদ্ধ জড়সত্তাকে বিনাশ করে দেহ ও মনে মুমুক্ষু হয়ে উঠতে হবে। তাই তাদের আদর্শ আত্মতত্ত্বের সন্ধান। এই আত্ম-সন্ধানের মধ্যে দিয়েই তারা বৃহত্তর সত্যের দ্বারস্থ হয়। তারা জানে—'মনরে আত্মতত্ত্ব না জানিলে সাধন হবে না'। অষ্টাদশ শতকে মুসলমান শাসক-জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে সমাজে চরম অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সাধারণ বাঙালী দেবী শক্তির আরাধনা করে, গান রচনা করে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সেই গান ছিল শাক্তপদ। এই শাক্তপদের পিছু পিছু বাউল পদের জন্ম। কিন্তু এটি নিরপেক্ষ ধর্মসাধনগান। অবশ্য এই বাউল গানের আবির্ভাবের পিছনে ধর্মগত ভেদ, শোষণ, অবিচার প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। কায়স্থ সন্তান লালন চন্দ্র কর এই গানের সৃষ্টিকর্তা। কেবল গান নয় এই সম্প্রদায়েরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। হিন্দু ধর্ম থেকে পরিত্যক্ত হয়ে লালন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হলেও কুষ্ঠিয়া জুড়ে তাকে নিয়ে সব সম্প্রদায় (হিন্দু ও মুসলমান) থেকেই চরম বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সেই বেদনাও তার সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে নিয়ে আসার প্রেরণা জুগিয়েছে। লালনের যুগে 'খাঁচা', 'ঘর', 'মাটি'র রূপকে আত্মসাধনার কথা ব্যক্ত হতো। বিংশ শতকে পূর্ণদাস, নবনীদাস বা নিতাই দাস বৈরাগীদের কণ্ঠে সেই গান আইন, আদালত, রেলগাড়ী, ব্যাঙ্কের লেনদেন, হাসপাতাল, বাইসাইকেল ইত্যাদির রূপকে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমান জয়দেবের জন্মস্থান অজয় নদী তীরস্থ কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেবের মেলা উপলক্ষে বিরাট বাউল আসর বসে। হিন্দু বাউলের পীঠস্থান হিসাবে বীরভূম জেলা এবং মুসলমান বাউলের পীঠস্থান হিসাবে কুষ্ঠিয়া (বাংলাদেশ) জেলার নাম অগ্রগণ্য। লালন শাহ ফকিরের গান জমিদারী তত্ত্ববিধান সূত্রে শিলাইদহে আগত রবীন্দ্রনাথকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ নিয়ে যথার্থ প্রামাণিকতা নেই, কারণ লালনের মৃত্যুর পরের বছর ১৮৯৯ খ্রীঃ তিনি জমিদারী সূত্রে শিলাইদহে পদার্পণ করেন। তবে লালনের গান যে তাঁকে বিমোহিত করেছিল তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লালন ঘনিষ্ঠ গগন হরকরা, সর্বক্ষেপি, গোঁসাই গোপালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লালনের গান ও দর্শন নিয়ে নানা আলোচনা করতেন। ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের দুটি গানের খাতা এনে এস্টেটের কর্মচারীকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়েও নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়

খাতার কিছু গানের সংশোধন না করে কবি কুড়িটি লালনগীতি 'প্রবাসী' পত্রে প্রকাশ করেছিলেন। নিজের ধর্মভাবনা, বোধ, আধ্যাত্ম উপলব্ধি সমৃদ্ধ মহাকাব্যোপম কালজয়ী উপন্যাসে 'গোরা'র কাহিনীর গোড়াপত্তন লালনগীতির আশ্রয়ে—

'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনবেড়ি দিতাম পাখির পায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ না ঘটলেও দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। লালনের মুখে তার 'আরশিনগর', 'অধরচাঁদ' বা 'হাওয়া মহল' তত্ত্ব তিনি শ্রবণ করেছেন। নিজের হাতে লালনের ন্যুব্জ অবস্থার ছবিও এঁকেছেন। এই ছবির আদলে নন্দলালও পরবর্তী কালে লালনের ছবি এঁকেছিলেন। 'হিতকরী'র নিবন্ধকার যিনি নাকি লালনকে স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁর আঁকা ছবিতে লালন বাবরি চুল, একটি চক্ষু দৃষ্টিহীন এবং মুখে বসন্তের দাগযুক্ত। মানুষ রতন সাঁই ছিলেন হরিনাথ মজুমদারের বন্ধু। 'কাঙাল হরিনাথ' নামে পরিচিত, 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদক হরিনাথই প্রথমে শিক্ষিত সমাজের পক্ষ থেকে লালনের গানে আকৃষ্ট হন। নিজের পত্রিকায় ঠাকুর জমিদারদের বিরুদ্ধে লিখে কাঙাল হরিনাথ জমিদারের নায়েবের রোষে পড়েন। রণপাধারী লালন সদলবলে এসে নায়েবের বিরুদ্ধে নাকি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পরবর্তীতে এই 'কাঙাল হরিনাথ' বা 'ফিকির চাঁদ বাউল' তাঁর পত্রে অনেক লালনগীতি প্রকাশ করেছিলেন জানা যায়। ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী এবং অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনও এই বাউল গান প্রকাশ করেন। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনেক গবেষণা করে এই গান সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছেন। তবে আধুনিককালে এই গানকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লালনের শিষ্য দিনেশ গগন হরকরার একটি গানকে কবি হিবাটী সভায় তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ব্যবহারও করেছেন—'আমি কোথায় পাব তারে.....।'

লালন ফকিরের জন্ম সম্ভবত ১৭৭৪-৭৫ খ্রী. কুষ্ঠিয়ার কুমারখালির ছেঁউড়িয়াতে। বাবার নাম মাধব কর এবং মায়ের নাম পদ্মাবতী। অবশ্য এই পরিচয় খানিকটা রূপান্তরিত হয়েছে ১৮৮০ সালের ১৯ জানুয়ারির একটি রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের তথ্যে-'পাট্টা গ্রহীতা-শ্রীযুক্ত লালন সাঁই, পিং-মৃত সিরাজ সাঁই, জাতি মুসলমান, পেসা-ভিক্ষা ইত্যাদি। সাকিন ছিঁউড়ে, পরগণা ইব্রাহিমপুর, ইস্টাসন ভলকো, সাব-রেজিষ্টারি-কুমারখালী'। উল্লেখ্য এখানে তাঁর পিতার নাম যা লিপিবদ্ধ আছে তা তাঁর গুরুর নাম। হতে পারে তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়ার পর আবেগহেতু পিতার নামের স্থানে গুরু মুসলমান সিরাজ সাঁই দরবেশের নাম সংযোজন করেছেন। এবার তাঁর গানের কথায় আসি। 'শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুঁড়ে' তাঁর মূল পরিচয়। কারণ আত্মপরিচয় নিয়ে নিস্পৃহ মানুষটি গানের কথাতেও নিগূঢ় রহস্যের বাতাবরণ সৃষ্টিতে সমর্থ। 'দেহ' সেখানে কখনো 'খাঁচা', কখনো 'ঘর' আবার কখনো 'আরশিনগর'। ঘরের খবর না জেনে আকাশপানে তাকানোর পক্ষপাতী নন বলেই বলেন—'না জেনে ঘরের খবর তাকাও কেন আসমানে।' তাঁর 'আরশিনগর' দেহের পড়শি বোধ হয়

আত্মা। তাকে দেখা যায় না। লালন একসাথে তার সাথে বাস করে তবু তাদের দূরত্ব যেন লক্ষ যোজন। তার স্পর্শ পেলেই যমযাতনা দূরে যেতে পারতো—

পড়শি যদি আমায় ছুঁত আমার যম যাতনা সকল যেত দূরে।
সে আর লালন একস্থানে রয় তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে।
আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।

লালনের বিশ্বাস-সূক্ষ্ম জ্ঞান, যার ঐক্য মুখ্য তা-ই প্রকৃত সাধকের উপলক্ষ। তাই সর্বাগ্রে দরকার 'আপন ঘরের খবর' সংগ্রহ করা। এই আপন ঘরে যিনি বিরাজ করেন তাকে জনম ভরেও দেখা যায় না। ঈশান কোণে তিনি নড়েন-চড়েন, হাতের কাছে তাঁর ভরের হাটবাজার অথচ তাকে দেখা যায় না। পরবর্তী পংক্তিতে স্পষ্ট হয় তিনি 'প্রাণপাখি'। খাঁচার ভিতর অবস্থানরত এই প্রাণপাখিকে ধরতে পারলে মনবেড়ি দিয়ে আটকে রাখা যেত। কিন্তু সে খাঁচা সহজ খাঁচা নয়। আট কুঠুরী নয় দরজা সংবলিত সে খাঁচার উপর সদর কোঠা 'আয়না মহল' দেহ। এদের মায়ায় সমস্ত জীব আবদ্ধ। অথচ জীব ভাবে না—

কপালের ফের নইলে কি আর পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা ছেড়ে পাখি আমার কোন বনে পালায়।
মন তুই রইলি খাঁচার আশে।
খাঁচা যে তোর কাঁচা বাঁশে।
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে
ফকির লালন কেঁদে কয়।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদ যেন গূঢ় সাধন প্রণালীর কথা, লালনের গানও যেন তেমনি গূঢ় রহস্য সাধনগীতি।

মধ্যযৌবনে মা এবং নতুন বউকে রেখে লালন তীর্থভ্রমণে যান এবং মারাত্মক বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। মুমূর্ষ লালনকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে আসেন তাঁর সহযাত্রীরা। অজ্ঞাত কেউ তাঁর মুখাগ্নি করে ভাসিয়ে দেয় কলার মান্দাসে। 'জল দাও' 'জল দাও' বলে তাঁর কণ্ঠ থেকে যে ক্ষীণস্বরের আর্তনাদ বেরিয়ে আসে তা ঘাটে গাত্র প্রক্ষালন উদ্দেশ্যে অবস্থানরত মুসলমান রমণীর কর্ণগোচর হয়। এই রমণী তাকে গৃহে এনে সেবা শুশ্রুষায় সুস্থ করে তোলেন। সম্ভবত তিনি ছেউড়িয়ার মলম কারিকরের স্ত্রী। গবেষকদের অনুমান এই রমণী এবং গুরু সিরাজ সাঁই তাকে সেবা-শ্রুশ্রুষায় সুস্থ করে তুলেছিলেন। সুফী সাধক দরবেশ সিরাজ সাঁইয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করে লালন পুনরায় গৃহে ফিরেছিলেন হয়তো তার পূর্ণ না হওয়া দেহরতির আবদারে। মা-স্ত্রী-সমাজ তাকে জাতিচ্যুত বলে বিতাড়িত করেছিল। ফিরে এসে শিষ্য মলম শাহ কারিকর প্রদত্ত সাড়ে ১৬ বিঘা জমিতে আখড়া স্থাপন করেন তিনি। গুরুর নির্দেশে প্রেম-সাধিকা, সাধনসঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করেন বিধবা বয়নকারিনী মুসলমানীকে। গড়াই নদীর তীরবর্তী আখড়ার 'হকের ঘরে' নিজ সাধনায় সর্বদা মগ্ন থাকতেন। অভিমানী লালন গেয়ে উঠলেন—

কেউ মালা কেউ তসবি গলে তাইতো কি জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিংবা আসার কালে জাতের চিহ্ন রয় কারে।

'সুন্নত' দিলে মুসলমান হওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে নারী জাতির বিধান কী? আবার ব্রাহ্মণকে তো পৈতার গুণে চেনা সম্ভব কিন্তু ব্রাহ্মণীকে কীভাবে চেনা যাবে? সুতরাং লালন বলেন—

জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা
সত্য কাজে কেউ নয় রাজি সবই দেখি তা না না না।
আসবার কালে কি জাত ছিলে এসে তুমি কি জাত নিলে।
কী জাত হল যাবার কালে সেকথা ভেবে বল না।

জাত তো বিধাতার সৃষ্টি নয়, স্বার্থান্বেষী মানুষের সৃষ্ট ভ্রান্ত ধর্মভক্তিবোধ। লালনের তাই জিজ্ঞাসা 'জাত কারে কয়', 'জাতের কী রূপ'। যথার্থ ভক্তের দ্বারে বাঁধা থাকেন সাঁই। তাঁর কাছে হিন্দু না যবন কোনো জাতের বিচার থাকে না। এক চাঁদেই জগৎ আলো, আবার একবীজ থেকেই সবার জন্ম। ভক্ত কবি নিজে তো জোলা সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং জোলা কবির বা রামদাস মুচি তো শুদ্ধ ভক্তির জোরেই সার্থক সাধক হয়েছেন। তাই বলতে হয় 'কার বা আমি কে বা আমার/আসল বস্তু ঠিক নাহি তার'। আর এই 'আসল বস্তু' হল মনের মানুষের সন্ধান। লালনের তাই চিরন্তন জিজ্ঞাসা —'বল কি সন্ধানে যাই সেখানে, মনের মানুষ যেখানে।' মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের বাসনায় সদা ব্যস্ত লালনের কণ্ঠ গেয়ে ওঠে—

মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে।
চাতক প্রায় অহর্নিশি চেয়ে আছে কালো শশী।
হব বলে চরণ দাসী।
ও তা হয় না কপাল গুণে।।

আমাদের চর্যাপদে গুরুবাদী সহজিয়াদের বিশ্বাস গুরু অদ্বয় ও সত্য উপলব্ধির দ্বারা অনুগামীদের সহজ সত্যে আনয়ন করেন। সহজ সাধনা গুহ্য সাধনা। তাই সহজানন্দ গূঢ় উপলব্ধির বিষয়। দুরূহ শারীরিক ও মানসিক যোগাচারের মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। মহাসুখের সন্ধান বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর মন্ত্র এবং পথ গুরুই বলে দিতে পারেন। লুইপাদ তাই চর্যার প্রথম পদে লিখেছেন—

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিণাম।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।।

কম্বুলাম্পুর চর্যার অষ্টম পদে লিখেছেন—'বাহতু কামলি সদগুরু প্রচ্ছী'। ঠিক একই গুরুবাদী সাধনার কথা শোনা যায় বাউল গানে। জগৎ-সংসার নিয়ে লালনের নানা প্রশ্নের পিপাসা মিটিয়েছেন সিরাজ সাঁই। গুরুই তাঁকে সাধনসঙ্গিনীর কথা শুনিয়েছেন। মহাযোগের খবর জানতে যোগেশ্বরী দরকার। নইলে বাউলের বায়ু সাধনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

তাই বোধ হয় মেহেরপুরের রাইকমলিনী বা বয়নকারিনী মুসলমানী তাঁর সাধনসঙ্গিনী হতে পেরেছেন। এই সাধনা 'রসরতির যোগসাধনা', যেখানে পুরুষ আর প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার। লালনকে তাই কখনো পাঠকের মনে হয় শান্তরতির সাধক, কখনো কামাচারের সাধক। বিরুদ্ধবাদীরা তাকে তাই অভিযুক্ত করেন কখনো 'শরিয়তবিরোধী' বলে, কখনো 'বেশারাহ পথভ্রষ্ট ফকির' বলে, আবার কখনো 'নারীভজন' মতবাদী বলে। সমস্ত আঘাত উল্লেখ করে লালন গুরুর আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে নিজের সাধনায় অবিচল থেকেছেন। সুফী ভক্তিবশে গেয়ে উঠেছেন—

নবীর অঙ্গে পয়দা হয়।
সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়।

গুরুর কাছে নিজেকে নিবেদন করে গেয়ে উঠেছেন—'ভক্তের দ্বারে বাঁধা অছেন সাঁই' বা 'গুরু দোহাই তোমার মনরে আমার নাও সুপথে' বা—

গুরু বিনে বন্ধু নাইরে আর ওরে নিদানের কাণ্ডারী
গুরু ভব পারের কর্ণধার।
গুরুর নামের মেঘ সাজাইয়া আছ রে মন চাতক হইয়া
এবার গুরু যদি দয়া করে ঘুচবে মনের অন্ধকার।
লালন সাধুর বেশে বলে গুরু বিনে ধন নাই সংসারে
সে যে কাঙালের কাণ্ডারী গুরু.....।

আবার কখনো দয়াময় বিধাতার কাছে তার সহজ অকপট স্বীকারোক্তি—আমি সাধন-ভজন জানি না। চিরদিন কুপথে গমন করেছি। তুমি পতিত-পাবন, অগতির গতি, অকুলের পতি। সুতরাং এ ঘোর সংকটে তুমি ছাড়া উদ্ধারক কে?—'আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময়/ পারে লয়ে যাও আমায়।' লালনের এধরণের গানগুলিতে যেন গুরু এবং বিধাতা মিলেমিশে একাকার। বিধাতার কাছে অপূর্ণ বাসনা নিয়ে কখনো আক্ষেপ করেন—

বাঞ্ছা করি যুগল পদে, সাধ মেটাবো ঐ পদ সেধে
বিধি বৈমুখ হল তাতে দিল সংসার যাতনা।

লালনের গানে 'চাতক', 'অচিন পাখি' যেমন 'প্রাণপাখি'র রূপক তেমনি 'কুঠুরি' 'কোঠাবাড়ি', 'খাঁচা', 'ঘর' সবই যেন দেহের রূপক। গূঢ়ার্থে কখনো বলেন—'বেঁধেছে এমন ঘর শূন্যের উপর পোস্তা করে/ধন্য ধন্য বলি তারে'। কখনো শোনান 'বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা পড়শি বসত করে/একঘর পড়শি বসত করে আমি একদিন না দেখিলাম তারে।' কখনো আধ্যাত্মিক দর্শনে শোনান—

সোনার কুঠুরী কোথা যে মন সোনার খাট পালঙ্ক যেমন
শেষে হবে সব অকারণ যার হবে মাটির বিছানা।

বাউলের গানে 'সময়' বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। তাদের বিশ্বাস অসময়ে

কৃষিকাজ কেবল খেটে মরা ছাড়া কিছু নয়। নইলে বীজের জোরে গাছ জন্মালেও তাতে ফল ধরবে না। তাদের মতে 'অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয় মহাযোগ সেই দিনে উদয়' হয়। তাই লালন গেয়ে ওঠেন—

সময় গেলে সাধন হবে না
দিন থাকিতে দিনের সাধন কেন জানলে না তুমি।'

পূর্বেই বলা হয়েছে 'বাউল' হল রহস্যবাদী সাধক। তাদের গানও তাই রহস্যের মায়াজালে জটিল অর্থবাহী গান। 'ঝিয়ের পেটে মায়ের জন্ম', ছয়মাসের কন্যার নয়মাসে গর্ভ হওয়া, 'এগারো মাসে তিনটি সন্তানে'র জন্ম, ছেলে মরে মাকে ছুঁলে, ইত্যাদি শব্দবন্ধগুলি জটিল নয় কেবল, তার অর্থ উদ্ধার দুরূহ বটে। লালনের রচনায় গৌরাঙ্গবিষয়ক গান এবং কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য রসের গানও আছে। এ গান তার সাম্প্রদায়িক ভেদহীন আদর্শের পরিচয়বাহী সাধনরীতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ—

ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্য কি পারবি তোরা
কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা। (গৌরাঙ্গ বিষয়ক)
বাৎসল্য রসের গান (কৃষ্ণ কেন্দ্রিক)—
আর আমারে মারিস নে মা বলি মা তোর চরণ ধরে
ননী চুরি আর করব না।

এ যেমন হিন্দু ধর্মের দেবতা বাল গোপালের উক্তি, তেমনি পদের শেষে লালনের উক্তিও যেন কৃষ্ণের আকুতির সুরে ব্যঞ্জিত—

ছেড়ে দে মা হাতের বাঁধন যাই যেদিকে যায় দুনয়ন।
পরের মাকে ডাকবে লালন তোর গৃহে আর থাকবে না।

বাউল সংসারে সর্বদা নিঃস্ব এবং একা। তার বেদনা গুরু আর বিধাতা ছাড়া কাউকে শোনানো যায় না। আত্মসাধনায় মগ্ন থেকেই মনের মানুষের সন্ধান করে সে। দেহতত্ত্বের সাধনার গান যেন তার হৃদয়ের শূন্যতার হাহাকার। আমরাও আবেগাপ্লুত হই, যখন লালন বলেন—

পাখি কখন জানি উড়ে যায় একটা বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়।
খাঁচার আড়া প'ল খসে পাখি আর দাঁড়াবে কীসে।
আমি ঐ ভাবনা ভাবছি বসে।
.....।
ভেবে অন্ত নাহি দেখি কার বা খাঁচা কেবা পাখি।
পাখি আমারি আঙিনায় থাকি
পাখি আমারে মজাতে চায়।
আগে যদি যেত জানা জংলা কভু পোষ মানে না
আমি তবে উহার প্রেম করতাম না
লালন ফকির কেঁদে কয়।

একথা সত্য লালনের গানের কথার সংযোজিত শব্দ গ্রাম্য, সহজ, অনাড়ম্বর। শব্দ ধরে ধরে তার অর্থও নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু শব্দ বিন্যস্ত হয়ে যখন বাক্য তৈরী হয় তখন তার অর্থ যেমন সহজ থাকে না তেমনি তা দুরূহ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিষয় হয়ে ওঠে। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত গ্রন্থে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যথার্থ বিশ্লেষণ করেছেন—

'সীমা-অসীম বা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কও তিনি অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষা স্নিগ্ধ গীতিমূর্ছনায় পূর্ণ। উপমারূপক, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ব্যঞ্জনা এবং ভাবের গভীরতা এ যুগেও বিস্ময়কর। মূলতঃ তিনি বাউলসাধনার সঙ্কেত দিয়ে গানগুলি লিখেছিলেন। কিন্তু তত্ত্বকথাও তাঁর ভাষায় বিচিত্র কাব্যশ্রী লাভ করেছে। সর্বোপরি আধুনিক মনের সঙ্গে তাঁর গানগুলির কেমন যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে।"

গ্রন্থঋণ ঃ

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ ফাল্গুন ১৪২২, শনিবার ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
পত্রিকা (বিনোদন/বিতর্ক/গসিপ/লাইফস্টাইল)
শিরোনাম ঃ 'লালন সাঁই'
বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

যানে লবেজান হেন শিব্রাম

অভিজিৎ গাঙ্গুলী

শিবরামের মতোই প্রায় কৌতুকলব্ধ পৌনঃপুনিক ধ্বনির মারপ্যাঁচে জড়িয়ে শ্রুতি চমৎকারিত্বের জাল অন্তঃগহনের সর্বস্তরে বিছিয়ে বর্তমান আলোচনার শিরোনাম সৃষ্টির এই প্রয়াস। এক অনন্য হাস্যরসিক, ছোট-বড় সকলের বিশেষ প্রিয় লেখক, গল্পকার শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) ওরফে শিব্রাম চক্রবর্তী(নিজেকে যিনি এভাবে প্রকাশ করতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন সবচেয়ে বেশী)। ছোটদের হাসির গল্প রচনায় বিষয়ের সারল্য, খুশীর আমেজ, শৈলীর অভিনবত্ব সৃষ্টি বাংলা কিশোর সাহিত্য তো বটেই এমন কি আধুনিক বাংলা রস সাহিত্য অথবা কৌতুক সাহিত্য ধারাতেও তাঁর একেকটি অনবদ্য সংযোজন। সমালোচক শৈবাল চক্রবর্তীর ভাষায় ঃ

"বাঙালি পাঠক এখন হাসির লেখা থেকে সরে এসেছে। জীবন জুড়ে এখন অত্যন্ত গুরুগম্ভীর ব্যাপার ঘটছে প্রত্যহ। তাই এখন হাসির গল্প লেখা কমে গেছে, হয়তো তেমন লেখা পড়তেও কম চাইছে মানুষ। শিবরাম চক্রবর্তী, মুজতবা আলি সাহেবরা পেছনের বেঞ্চে মুখ চুন করে বসে। কিন্তু এই একজন মানুষ ছিলেন, যিনি কেবল লিখেই হাসতেন না, তাঁর সমস্ত জীবনযাপনটাই ছিল মজায় মেতে থাকা। তাঁকে দেখে হাসি চাপা যেন শক্ত ছিল, তেমনই নিজেকে চেপে রাখার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়'।

কৌতুক প্রকাশের নানা সংগোপন চাতুর্য, নানা দ্ব্যর্থক, উদ্ভট শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ, অভঙ্গ-সভঙ্গ শ্লেষ, ব্যঙ্গার্থের বিবিধ বিন্যাস, রহস্যময় গাম্ভীর্যে উপস্থিত থেকে সহসাই অসাহসিকতায় কৌতুকের আবরণ উন্মোচন, বাঁকা কথার তোড় এসবই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে একমাত্র তাঁর গল্পেই খুঁজে পাওয়া যাবে। অথচ পরিবেশনের অনন্য গুণে তাঁর গল্প কখনই বাক-সর্বস্ব নয়, বরং সুমধুর হিউমারে তার পরিসমাপ্তি। একটা সময় শিবরাম 'যুগান্তর' কাগজে 'বাঁকা চোখে', 'অল্প-বিস্তর', 'বিসংবাদ' নামে নানা জোকস্ লিখতেন।। এই জোকস্গুলির মধ্যেও মিশে থাকতো নির্দোষ হিউমার। বার্ক টোয়েন ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। বিদেশী গল্পের নানা ছোট ছোট জোকস্ থেকেও তাঁর গল্পের প্লট সংগ্রহ করতেন তিনি। কিন্তু যে বিলিতি মাটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন বাংলা গল্পের প্লট গড়ার কাজে, সৃষ্টি গুণে তাই-ই কখন হয়ে উঠেছে বাংলা বালক-বালিকা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলের জন্য রচিত এক নির্ভেজাল কৌতুকের সদানন্দময় নতুন পৃথিবী। তাঁর আগে কেউ 'বাড়ির সাথে বাড়াবাড়ি' করেনি, করেনি 'ঘোড়ার সাথে ঘোরাঘুরি'। একথা অস্বীকার্য যে শিবরামের গল্পে হাস্যরসই প্রধান, এমন কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-কষ্টও কখনও সেই স্বতোৎসারিত 'হাসির ফোরারা'কে স্তব্ধ করতে পারে নি।

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই 'যান' নিয়ে উৎকণ্ঠিত অথবা আতংকিত অথবা ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠার মতোও শিবরামের বেশ কিছু গল্প রয়েছে যা পড়ে শিশু-কিশোরদের পাশাপাশি আমরাও হেসে কুটোপাটি হই। আবার সন্ধানে এরকম অন্ততঃ চারটি গল্প আমি পেয়েছি

যেখানে সরাসরি নামে এবং প্রাণে তাঁকে যানের বিড়ম্বনাকে আত্মস্থ করতে হয়েছে। হর্ষবর্ধন সিরিজের গল্পগুলি ও অন্যান্য কিছু গল্প ধরলে সংখ্যাটি নিশ্চয় বাড়বে কিন্তু সরাসরি পরিবহন অথবা যানের কথা এসেছে এ চারটি গল্পেই এবং বলাবাহুল্য এ চারটি গল্পেরই মূল চরিত্র শিব্রাম নিজে। গল্পগুলি হলো ঃ

১। ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি
২। বাসের মধ্যে আবাস
৩। ট্রেনের ওপর কেরামতি
৪। রিকসায় কোনো রিক্স্ নেই

উপরোক্ত গল্পগুলি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আর দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। এক সময় 'তরুণ তীর্থ' নামক ছোটদের পত্রিকায় শিবরামের গল্প প্রকাশিত হতো (তাঁর 'হর্ষবর্ধন অদৃশ্য হলো' এখানেই প্রকাশ পায়)। তারও পূর্বে একেবারে প্রথম দিকে কল্লোলে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলির সাথে (যথা ঃ 'মানুষের প্রারম্ভ', 'বিধাতার চেয়ে বড়', 'আমি যে তোমারে ভালোবাসি' প্রভৃতি) পরবর্তীকালের শিবরামকে কখনই মেলানো যায় না। তাই কালের কপোলতলে শিবরামের সাহিত্যজীবনের একমাত্র প্রথম দিকের সৃষ্টিগুলি হারিয়ে গেছে, একমাত্র শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা মজার গল্পের স্রষ্টা হিসেবেই আমরা শিবরামকে মনে রেখেছি।

যান যেমন আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় মাধ্যম তেমনি সময় সময় তা প্রাণঘাতিও! নিত্যদিনের ছটা পাঁচটার জীবনে যানের দৌলতে অথবা বেদৌলতে কখন প্রাণপাখিটি সটকায় কে বলতে পারে? নজরুল তাঁর 'খেয়া পারের তরুণী' কবিতায় যে ভাবনা কিম্বা ইঙ্গিতেই বলুন না কেন ঃ

আবুবকর উসমান উপর আলি হায়দার
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ও-রে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা
দাঁড়ি মুখে সারি গান লা-শারীক আল্লাহ! (খেয়া পারের তরণ)

আসলে আমরা জানি, যখন বর্ষার ভরা কোটালে উথাল-পাথাল ঢেউয়ে দোলা গাঙ্গের বুকে নৌকা বা লঞ্চের মাঝে আমরাই ঝুলনার মতো বসে থাকি তখন আমাদের প্রাণের ত্রস্ত স্পন্দনই জানান দেয় বাঞ্ছিত স্বপ্ন-কল্পনার চেয়ে অবাঞ্ছিত পরিণতির দুর্ভাবনাটি আমাদের মনে কতো প্রবল! আর যান থেকে বেজান হবার এই অকাল-হিসাব অথবা অহৈতুকী অসময়ে জীবন থেকে পট্ করে ঝরে যাবার এই বেনজির নজরানাটি প্রায় দিতে দিতে ফিরে আসবার বর্ণনাটি যখন ব্যাখ্যাত হয় কোনো কুশলী শিল্পীর কুশন-কৌতুকতায় তখন চক্ষু চড়কগাছ হয় বৈ কী! আর যান-মান-জীবন নিয়ে এমন বালখিল্য রসিকতাটি বোধ হয় শিব্রামই করতে পারেন তাঁর অনায়াস উৎসারিত গল্প-মাধ্যমে।

'ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি' শিব্রামের ঘোড়া নিয়ে নাকাল হবার গল্প। এ গল্পের প্রথমেই শিব্রাম সহাস্যে নিজেকে সহ নিজ বংশের দাদামশায়দের অস্বাভাবিক মেদপ্রাবল্যের কথা

বলেছেন। যে মেদের বশবর্তী কথা বলেছেন। যে মেদের বশবর্তী হয়ে তাঁর থুড়তুতো দাদামশায়কে আকালে পরলোক যাত্রা করতে হয়েছিল, তিনটে ইঞ্জেকশনের ছুঁচ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জমা রেখে জ্যেঠতুতো দাদামশায়ের শিরা খুঁজে না পাওয়া ডাক্তারকে ভিজিট না নিয়েই রাগে এবং বেগে প্রস্থান করতে হয়েছিল, সেই মেদ মিনিমাইজের তাগিদেই শিব্রামকে ছুটতে হয়েছে গৌহাটিবাসী মামার ডাক্তারের কাছে, আর ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছেন ঘোড়ায় চড়ার। ঠিক এ প্রসঙ্গেই লেখকের বর্ণনায় উপরি পাওনা হিসাবে পেয়ে যাই পাঞ্জাবীদের ঘোড়ায় চড়ার বিবরণ। তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে ঃ

"আম্বালায় থাকতে ছোটবেলায় দেখেছি পাঞ্জাবীদের ঘোড়ায় চড়া। এখনও মনে পড়ে, সেই পাগড়ী উড়ছে, পারপেণ্ডিকুলার থেকে ঈষৎ সামনে ঝুঁকে সওয়ারের কেমন সহজ আর খাতির নাদারৎ ভাব আর তার দাড়িও উড়ছে সেই সঙ্গে! যেন দুনিয়ার কোনো কিছুর কেয়ারমাত্র নেই! তাবৎ পথচারীকে শশব্যস্ত করে শহরের বুকের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাওয়া। পরমুহূর্তে তুমি দেখবে কেবল ধুলোর ঝড়, তাছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না।"

অসাধারণ রচনাধর্মী মুন্সিয়ানায় বর্ণনাটি যেন পাঠকের চোখে আম্বালার ঘোড়সওয়ারের এক কল্পচিত্র হয়ে ওঠে। এরপর সদর রাস্তা থেকে চড়ার জন্য একটা কালো নাদুস-নুদুস ঘোড়া সে কিনেছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন মতোই! তাও একেবারে নীলামে রীতিমতো দরাদরি করে একেবারে ঊনপঞ্চাশ টাকায় কেনা! জানা যায় ঘোড়াটি দিশি নয়, ভুটানী টাট্টু। এক উপকারী ও অত্যুৎসাহী ভদ্রলোক তাঁকে এ ঘোড়া কেনার জন্য ও কেনার পর তাকে রীতিমতো কেতায় আস্তাবলে রাখার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। শেষমেশ নিলামে মুর্হুমুর্হু একেবারে ক্ষেপে ওঠা দাম হেঁকে যে ঘোড়া কেনা, তাতে এবার চড়ার পালা। আর এখানেই বাঁধলো যত বিপত্তি। তার ওপর পরদিন প্রাতঃকালে ঘোড়া চড়ার আগে ডাক্তারবাবুর সবিশেষ নিদানে আমাদেরও চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। ডাক্তার বলে ঃ

"হ্যাঁ, হাঁটা ছাড়ো। হাঁ-টা ছাড়ো। হাঁটা ব্যায়াম না কি আবার! মানুষে হাঁটে? ঘোড়ায় চড়তে শেখো। অমন ব্যায়াম আবার হয় না। দু দিনে চেহারা ফিরে যাবে। এত কাহিল হয়ে পড়বে যে তোমার মামারাই তোমাকে চিনতে পারবেন না। হুম্।"

এরপর সহিসদের সহযোগিতায় যুতে দেওয়া ঘোড়ায় তিনি বেশ যুত করে শ্রীযুত হয়েই বসেন। সহিসরা ছেড়ে দিতেই ঘোড়া তার চারটে পা এক জায়গায় জড়ো করে পিঠটা একটু নামিয়ে, তারপর প্রবলভাবে উঠিয়ে গা ঝাড়া দেয় ধনুকে টংকার দেওয়ার মতোই। আর এই এক গা ঝাড়াতেই তাকে চার-পাঁচ হাত উঁচু আকাশের শূণ্যমার্গে চলে যেতে হয়, একেবারে বায়ু স্তরে আর প্রায় তৎক্ষণাৎই পড়তে হয় সেই ঘোড়াই পিঠেই। এভাবেই কখনো জিনের মাথায় কখনও জানের চূড়ায় হাত ধুয়ে শেষে সাষ্টাঙ্গ অধঃপতন ধরিত্রির বুকে। আর তখন মাত্র আড়াই হাত পিছনেই সেই যমরূপী জীব-যানটি দুপায়ে ভর করে তাকে লুফে নেবার নাটকীয় ভঙ্গিমাটি করেই টেলিগ্রামের গতিতে (এখন হলে হয়তো কমপিউটার বলা হতো) উন্মুক্ত গৌহাটির পথে পা বাড়ায়। আর লেখক সেই মর্মে ঘাড়-পিঠ- কোমর- পাঁজরা সহ অসংখ্য ঝাঁঝরা হওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বুলোনোর জন্য আরও

কয়েকটা হাতের বিলক্ষণ অভাব বোধ করেন। অশ্বচিকিৎসার ছলে অস্ত্রবরের হাতেই এমন পরিণতি ভাবা যায়!

এরপরও গল্পকথকের কপালে কিছু দুর্গতি ছিল। ঘোড়া পালিয়ে গেলেও চানা খাবার জন্যে সে সহিসের কাছে ফিরেও এসেছে আর এক মাসে সাড়ে বাইশ টাকার ছোলা আর সোয়া পাঁচ টাকার ঘাস, বাড়ি ভাড়া, সহিসের মজুরি, চাবুক, খৈনি আর খোরপোশ বাবদ হুজুরের কাছে সহিসের দরবারী বিলের পাওনা কুল্লে তেয়াত্তর টাকা! তবে সহিসদের মুখেই জানা যায়, এ ঘোড়ায় চেপে এর আগে সবাই নাকি অক্কা পেয়েছে, একমাত্র তিনিই না কি বেঁচে ফিরলেন। কিন্তু এরপরই যা জানা গেল তা আরো ভয়ংকর। সেই উপকারী ভদ্রলোকের ভগ্নীপতিই না কি নিলামওয়ালা আর উপকারী বলে মনে হওয়া আপাত সদয় লোকটির আস্তাবলেই হয়েছিল তাঁর ঘোড়ার ঐ রাজকীয় প্রতিপালন! অবশেষে ঘোড়া ভিজিটের পরিবর্তে মেদ কমাতে ঘোড়ায় চড়তে পরামর্শ দেওয়া ডাক্তারকেই ঘোড়াটি গছিয়ে এবং ঘাড় থেকে ঘোড়া নামিয়ে গৌহাটি ছেড়েছেন লেখক। গল্পের ঘটনায় দামাল ঘোড়ায় সওয়ারী হয়ে লেখক ও ডাক্তারের নাকাল হবার কাহিনী চরম রসিকতার সাথে বর্ণিত হয়েছে। কতিপয় বৃকোদর হাওয়া পরিবর্তনকামীদের প্রতি গল্পকারের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও এ গল্পে পরোক্ষে ধ্বনিত হয়েছে।

'বাসের মধ্যে আবাস' এক অন্য স্টাইলের গল্প। এ গল্পে শিব্রামের গল্পের আর এক অন্যতম সুপরিচিত চরিত্র বিনিকে খুঁজে পাওয়া যায়। গল্পে সম্পর্কে সে শিব্রামের বোন। এ গল্পের শুরুটা এমন ঃ

"অবশেষে নতুন আবাসে এসে ওঠা গেল। বাসস্থানও বলা যায়! কিন্তু তাহলেও বাস্তুসমস্যার BUS-তব সমাধান হলো একটা...বাড়ি একবার ছাড়লে কি এ বাজারে মেলে আর? বিনি বলেছিল, মিলবে আলবাৎ মিলবে? কিন্তু পরে দেখা গেল তা All বাৎ। নিছক কথার কথাই!"

এই গল্পেও কথার চালই শিব্রাম বুঝিয়ে দেয় গল্পে তিনি কোন্ পথ ধরে এগোতে চান। গল্পের প্রথমাংশে যেন তেন প্রকারেন বিনি ও তার দাদাকে বাসা ছাড়া করাবার জন্য চতুর ও নাছোড় বাড়িওয়ালার বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা কৌতুকের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে বাসা ছাড়া বিনি ও তার দাদাকে পথে বেরোতে হয়েছে নতুন বাসস্থানের খোঁজে। পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে তখন গল্পকথকের একাধিক মরিয়া প্রচেষ্টা। শ্রাবস্তি নয় সামান্য বস্তী হলেই তারা খুশী। গ্যারেজ থেকে আস্তাবল, রেলওয়ে ওয়াগন থেকে পয়মাল মালগাড়ির কামরা অথবা বজ্রাহত বজরা থেকে শুরু করে ভাঙা ডিঙা কিছুই যখন জুটছিল না কপালে তখনই হঠাৎ লটারী পাওয়ার মতো দৈবাৎই মিলে গেল এক Bus-গৃহ। লেখকের বর্ণনায় ঃ "বাসগৃহের সমস্যা এমনই জটিল, উদ্বাস্তু থেকে থেকে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, সেই সময়ে একটা পুরনো বাস মিলে গেল দৈবাৎ। নতুন Bus-গৃহ জুটে গেল এই বরাতে। ভগবান রয়েছেন বাস্তবিক।

.....ঠিক নতুন Bus-গৃহ নয়। আনকোরা নয় একেবারেই। অনেক কালের ঝরঝারে

গাড়ি, তাহলেও ডবলডেকার। যাত্রী বহনের অযোগ্য হলেও বাসযোগ্যতা ছিল বইকি বাসখানার। তাছাড়া দোতলা তো বটেই!

সরকারি কি বেসরকারি বাস কে জানে, কবে হয়ত এই পথে অচল হয়েছিল তার কোনোক্রমেই তাকে ঠেলেঠুলে চালানো যায়নি—কারো কোনো ঠেলাতেই চলতে রাজি না হওয়ায়, কিছুতেই চালু করতে না পেরে শেষটায় তার কলকব্জা মোটর-ফোটর সব খুলে নিয়ে বাসটাকে এইভাবে বিপথে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। যাই হোক্ গাড়িখানাকে প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই ঢাকুরের রাস্তায়—এক আঁস্তাকুড়ে ধারে পাওয়া গেল। সারা কলকাতা ঢুঁড়ে শহরতলীর উপকূলে Bus-উপযোগী বেওয়ারিশ জায়গা পাওয়া গেল ঐখানেই। আঁস্তাকুড়ের কিনারে আস্তানার কিনারা হলো। আবর্জনার আওতায় হলেও নিতান্ত কুঁড়ে ঘর তো নয়! দস্তুরমতই দোতলা বাড়ি বলতে হয়। একেবারে একেলে বাসতবাটি!"

এ জাতীয় বর্ণনায় Bus উপযোগী, Bus-তবিক, Bus- গৃহ, আ-Bus প্রভৃতি শব্দের মধ্যে দিয়ে যেমন শিবরামের স্বভাবোচিত রঙ্গরসের কায়দাটি চোখে পড়ে তেমনি একটা আস্ত অথবা ধ্বস্ত Bus কে নিয়েও কিভাবে একটা গোটা গল্পভাবনা গড়ে তোলা যায় তার আঙ্গিকটিও ধরা পড়ে। যাহোক্ এই 'বাস' কেই বিনি মিস্ত্রি ডেকে দোতলার সিট খুলিয়ে, রং লাগিয়ে, পর্দা টানিয়ে 'সাবাস' বানিয়েছে। দোতলা-একতলা মিলিয়ে সিঁড়ি-কলিংবেল সমেত ঐ 2A বাসটি যখন তাদের থাকানোর জন্য একেবারে তৈরি তখনই বাঁধলো গণ্ডগোল। সরকারি বাসখানা দপ্তরের লোক এসে হাজির হলে আর ভাড়ার বদলে বিনির পরামর্শে তাদের কাছ থেকে কিনে নেওয়াও হলো বাসটা। কিন্তু তারপরও জ্বালা! বিনি আর শিব্রাম ডবলডেকারের দোতলায় থাকে। আর অন্ধকার একতলায় রাতবিরেতে শুরু হলো ভূতের উৎপাত। আর যেমন তেমন নয়, এ ভূত বাসেরই ভূত। সে বলেঃ

"আগে বাড়ুন—সিঁড়ির মুখে দাঁড়াবেন না। ওপরে যান—ওপর খালি। সিঁড়ির কাছে ভিড় করবেন না কেউ।"

বাস-ট্রাম আর ট্রেনের ভূত নিয়ে বাংলায় এ যাবৎ অনেক গল্প লেখা হয়েছে। কিন্তু এ গল্পের ধাঁচটাই আলাদা। বাসের ভূত-ভূতুমদের নিয়েও এমন নক্সা করা যায় কে জানতো! বিনির ভয় তাড়াতে গল্পকথক শিব্রাম বিভূতিবাবুর 'দেবযান' আর তুষারবাবুর 'বিচিত্র কাহিনী'র কথা বলে। কিন্তু বিনির তাতে ভয় যায় না। রাতের ভূতের বাসের কিড়িং কিড়িং শব্দে তাদের ভয়ে প্রাণ তিড়িং বিড়িং করে। শেষে বাস কোম্পানী থেকে জানা গেল ওটা বুড়ো বাস কণ্ডাক্টার জনার্দনের ভূত। এক বাসের সঙ্গে আর একবাসের ধাক্কা লাগার ফলেই একসময় পটলডাঙ্গার টিকিট প্রাপ্তি হয়েছিল তার। এই বাহ্য! সেই ভূত তাড়াতেই পুলিশ অফিসার আননবাবুর দারস্থ হলো শিব্রাম। ভূত তাড়াতে পুলিশ! আর কি না আননবাবুই জব্দ করলেন জনার্দনের ভূতকে। সরকারী নোটিশ বাসের গায়ে লটকে বাসের ফুটবোর্ড, মার্ডগার্ডে বসা নিষিদ্ধ, ঊর্ধশ্বাসে রেসারেষি নিষিদ্ধ করলেন তিনি। জনার্দন ভূত হলে কি হয়, কন্ডাক্টর তো! এসব নিয়ম মানবে কেন? উপরি পয়সার লোভ ছাড়বে কেন? তাই সে বাস ছেড়ে বিবাগী হলো। আর সহাস্য আননে আননবাবুর নিস্কৃতির পর বিনি-শিব্রামের

নতুন Bus-গৃহেও আর কোনো উৎপাত রইল না। একরাশ কৌতুকের সাথে সাথে এ গল্প জনশিক্ষারও বটে! বাস দুর্ঘটনার বাস্তব প্রতিবিম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ 2A বাস আমাদের ভেতরে ভেতরে পথ-দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সচেতন করে, সরকারী নোটিশ বাস মালিক ও বাস চালক সহ সকল নাগরিককে দুর্ঘটনার কারণগুলিকে স্মরণ করায়, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এ গল্পে বাসের অনুপুঙ্খ বর্ণনাগুলিও বেশ চমকপ্রদ।

'ট্রেনের উপর কেরামতি' কৌতুকচ্ছলে লেখা এক মজাদার ট্রেন দুর্ঘটনার গল্প। বলা বাহুল্য বাস্তব অর্থে বাসের মতো ট্রেন দুর্ঘটনাও কখনই মজাদার হতে পারে না। কিন্তু গল্পের গরু যেখানে গাছে ওঠে সেখানে সবই সম্ভব। আর এখানেও তাই হয়েছে।

গল্পের শুরু থেকেই সাসপেন্স ঘনীভূত হয় যখন গল্পকার বলেন ঃ "ভগবান যা করেন তা ভালোর জন্যেই করে থাকেন। এমন কি ট্রেন দুর্ঘটনাও। হ্যাঁ, ট্রেন দুর্ঘটনাও। তার ফলে অনেক লোক নিহত হয় জানি, কিন্তু তার মধ্যেই আবার তার মঙ্গলহস্ত নিহিত থাকে। অনেক যেমন হতাহত হয়, অনেকে আবার হতে হতে বেঁচেও যায় সেইরকম। আমিই যেমন বেঁচে গিয়েছিলাম সে যাত্রা।"

এরকম একটি মন্তব্য দিদয়ে গল্প শুরু হলে গল্পপাঠের উৎকণ্ঠা বাড়ে বৈ কি! গল্পে ভগবান শব্দটি দ্ব্যর্থক। প্রচলিত অর্থটি ছাড়াও এ গল্পের ভগবান শিব্রামের ছেলেবেলার ইস্কুলে পড়া বন্ধু। পুরুত হয়ে ঘন্টা নেড়ে পূজো-আচ্চা আর বাঁধা-ছাঁদা অথবা ছাঁদা-বাঁধার চেয়ে ছুতোর হওয়াটাকেও যে আর্থিক প্রতিষ্ঠার যথাযোগ্য ব্যবহার বলে মনে করতো তার কাছে যে কোন ছুতোয় পলিকেটকনিক পড়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা ছিল। আর তাই সেই পলিটেকনিক শিক্ষা যে কি বিভীষিকা তা গল্পকথক টের পেয়েছে চলন্ত শিলিগুড়ির ট্রেনে বসেই। ভগবান যেমন সর্বত্র আবির্ভূত হন, তেমনি প্রথম চোটেই পলিটেকনিক্ পাশ করা মানুষ 'ভগবান' তার করাত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সমেত হঠাৎই উপস্থিত হয়েছে চলন্ত ট্রেনে একা গমনকারী লেখকের কামরায়। কামরার উপর চোখের কামড় বসিয়ে সে তার কাজ শুরু করেছে। ইচ্ছে করলে সে যে ইঞ্জিন ও লাইন সমেত পুরো ট্রেনটাকে খুলে আবার তা এঁটে জুড়ে দিতে পারে এমনটা প্রমাণ করতেই গল্পকথকের চোখের সামনে নিমেষে ও এক এক কসরতি টানে খুলে এনেছে ট্রেনের বাথরুমের আয়না, লাগেজ ব্যঙ্ক, সিট্। নিমেষে কামরা ভরে গেছে স্তূপাকৃতি বড় বড় নাট-বোল্টে। ভগবানের মতে ঃ

"আজকাল যত কামরা, এমনকি গোটা রেলগাড়িটাই ইস্পাতে তৈরী হচ্ছে। কলকব্জার ব্যাপার সব।"

বাস্তবিকই তাই। কিন্তু মিস্তিরি ভগবান কামরার মধ্যে কোনো Mystery রাখেনি। সে জানে "নাট-বোলটুর ব্যাপার সব। ইস্পাতের পাতের ওপর পাত বসিয়ে নাটবোল্টু দিয়ে এঁটে বানানো। সময় পেলে গোটা গাড়িখানা খুলে আবার আমি তমন করে এঁটে লাগিয়ে দিতে পারি। এতো কলকব্জার ব্যাপার।.....আর কিছু না।" ভগবানের কথায় ঃ

"সেই নাট-বোল্টু আর ইসক্রুপের কারবার। ছোট বড় মাঝারি—নানা সাইজের নাটবল্টু, তাছাড়া আর কিছু না।..... এ গাড়ির সব চাকা আমি খুলে ফেলতে পারি, এ কামরায়

যাবতীয় ফিটিং। আমার কাছে এ কাজ একেবারে কিছু না। হাজার হাজার মাইল যে রেললাইন পাতা, তাও তুলে ফেলা যায়। মোটেই শক্ত নয়। ফিশপ্লেট দিয়ে জোড়া তো সব। খুলতে কতক্ষণ?

সত্যিই হয়তো তার ভগবান নাম সার্থক। আর তাই কামরাকে নিশ্ছিদ্র করতে তার দরজা-জানলাগুলো সব ইস্ক্রুপ আর ইস্ক্রুপ ডাইভার দিয়ে এঁটে দিয়েছে। আর তার কেরামতির বহরে মুহূর্তে বাঙ্কগুলো ঝুলেছে, বেঞ্চগুলো মাটিতে শুয়েছে আর গোটা কামরাটায় দেওয়ালগুলো ছাড়া আর কিছু শেষ পর্যন্ত খাড়া থাকে নি। গল্পকথক শিব্রাম শুধু দেখে গেছে একদা তার সহপড়ুয়া শ্রীমান ভগবান চন্দ্র ভট্টাচার্যের অভূতপূর্ব কেরামতি। অবশেষে বাথরুম যেতে গিয়ে চক্রবর্তীরূপ স্তূপাকৃতি বল্টুর সমাবেশের মধ্যে চকর্বরতি রূপ শিব্রাম পা হড়কে পড়েছে আর তার পপাত ধরণীতলের সাথে সাথেই কোথাকার নাটবল্টু আর ইসক্রুপ কোথায় ছিটকে গেল এই চিন্তায় ভগবান দিশেহারা হয়েছে। কারণ, তার চিন্তা সঠিক নাটের সঠিক বল্টু অথবা ইস্ক্রুপ না খুঁজে পেলে কামরার কলকব্জাগুলো আবার জুড়ে দেওয়া যাবে না। এরপরই ক্ষিদের খোঁচায় জানলা গলে ভগবান হয়েছে বেপাত্তা আর বদ্ধ কামরায় গল্পকথক ভয়ে, আতংকে নীল হয়েছে। তারপরই ট্রেনে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে ঘটেছে ঐ অ্যাকসিডেন্ট আর গল্পকথকের বদ্ধ কামরা ফাঁক হয়ে দু-আধখানা হয়ে গেছে। গল্পকথক শিব্রাম লবেজান হয়ে প্রাণে বেঁচেছেন সত্যি, কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজে দেখেছেন কে বা কারা রেলওয়ে লাইনের পিসপ্লেট খুলে নেওয়াতেই ঘটেছিল এই অ্যাকসিডেন্ট, এই ভয়াবহ বিপত্তি।

অন্যান্য গল্পের মতোই বানিয়ে বলা এই মজার গল্পটিও সত্য কৌতুকের ছোঁয়ায় জ্যান্ত হয়ে যায়। ভগবানের মতো মস্তিষ্কের নাট-বল্টু ঢিলে টেকনোলজির কারিগর বাস্তবে অসম্ভব হলেও মজার গল্পে কি না হয়! সব থেকে বড়ো কথা এ গল্পে একটা আস্ত ট্রেন কামরার খুঁটিনাটি বর্ণনা পাই। গল্পের ট্রেনটাও যেন পাঠকের মনের মতোই এক উৎকণ্ঠার গতি নিয়ে শেষের অ্যাকসিডেন্টটা ঘটিয়ে ফেলে। গল্পের শেষে শিব্রামের অভিমত "নির্ঘাৎ ভগবানই রেললাইনের ফিসপ্লেট খুলে অ্যাকসিডেন্টটা ঘটিয়েছে।" কিন্তু ট্রেনের আগে গিয়ে কি করে সে ফিসপ্লেট রাখা লাইনে পৌঁছুলো কিম্বা চলন্ত ট্রেনের মধ্যে বসে কিভাবেই তা তার ফিসপ্লেট সরালো এ সব ভেবে শিব্রামের মতো আমরাও অবাক ও আশ্চর্য হই। অবশ্য তার একটা যুৎসই উত্তরও শিব্রাম বারেবারেই এই গল্পে দিয়েছে আর তা হলো ঃ "ভগবানের অসাধ্য কিছু নেই।" এ গল্পের মধ্যে অন্য একটি মাত্রাও রয়েছে। ভগবানের মতো কর্মীরা আজো সমাজে দুর্লভ নয়, যারা কাজের নামে অকাজের কাজী। শিবরামের সময় শেষে বর্তমান কাল অবধি আমরা সরকারী বা বেসরকারী মহলে কতিপয় অদক্ষ কারিগর বা অপটু কর্মী দেখে আসছি, যাদের বেতন নেওয়া ও ভাতা বৃদ্ধির দাবী বছর-ভোর তথা বছর-বছর বাড়তেই থাকে। আর সেই সঙ্গে সমহারে বা দ্বিগুণ-ত্রিগুণ হারে কমতে থাকে তাদের কাজের মান। কখনো কখনো এমন কর্মী অথবা এঞ্জিনিয়ারের গাফিলতির কারণেই ঘটে যায় রেল, ব্রীজ অথবা সড়ক দুর্ঘটনার মতো প্রাণঘাতী এবং ভয়ংকর দুর্ঘটনা।

তবু আমাদের চোখ ফোটে না, চৈতন্যোদয় হয় না। শিবরাম কিন্তু বলতে ছাড়েননি। গল্পের শেষে তাঁর স্পষ্ট উক্তিঃ "তারপর থেকেই আমি তার খোঁজে রয়েছি। দেখতে পেলেই তাকে ধরে অ্যায়সা ঠ্যাঙাবো।"

এ একেবারে যে কোন দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রেনের যাত্রীদের মুখের ভাষা, কখনো কখনো বা দুর্ঘটনা প্রত্যক্ষকারী 'পাবলিক'-এর মুখের ভাষাও বটে! যাহোক, শিবরামের এ গল্প আমাদের মনের খুঁত এবং ক্ষত দুটোকেই একসঙ্গে তুলে ধরা ও দেখিয়ে দেবার গল্প। কৌতুকের মধ্যে দিয়ে এ গল্পে তিনি পরোক্ষে এক লুক্কায়িত সত্যের আবরণকে উন্মোচিত করেছেন।

'রিকশায় কোনো রিক্স্ নেই' তাঁর যান-যন্ত্রণা নিয়ে লেখা এক অসাধারণ গল্প। এ গল্পে ভোঁদাইয়ের মোটর গাড়ী চড়ার সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা প্রাপ্তি থেকে লেখকের মনে হয়েছে:

"বাস্তবিক আমার বিবেচনায় রিকশাই ভালো সব চেয়ে। এমন কি পা-গাড়িও তেমন নিরাপদ নয়। চালিয়ে গেলে কি হয় জানিনে, চালাইনি কখনো, কিন্তু তার কেউ যদি সাইকেল চালিয়ে আসছে দেখি তক্ষুনি আমি সাত হাত পালিয়ে যাই। রাস্তার ধার ঘেঁসে গেলেই মোটর-চাপা পড়বার ভয় নেই, কিন্তু সাইকেলের বেলায় যে ধারেই তুমি যাও না, তোমার ঘাড়ে এসে চাপবেই। ফুটপাতে উঠেও নিস্তার নেই।.....তাই বলছিলাম রিকশাই আমাদের ভালো। কোনো রিসক্ নেই একেবারেই। না সওয়ারির, না পথচারির।"

লেখকের এ বক্তব্য থেকে বাঙালির চড়া অন্ততঃ তিনটি যানের সুবিধা অসুবিধার কথা জানা যায়, আর তা হলো ঃ সাইকেল, মোটর গাড়ি আর রিক্সা। বলাবাহুল্য এ গল্পে গল্পকার আবার শেষেরটি চড়ারই পক্ষপাতি। তাঁর এ গল্পের প্রথমেই কলকাতা শহরবাসীর আরও কিছু যানবাহন ও তার অবস্থার কথা জানা যায়। তিনি বলেন ঃ "ট্রামে-বাসে ওঠা দায়, পা-দানিতেও পা দেওয়া যায় না। হাঁটতে হাঁটতে যদি কিছুটা এগিয়ে কোন ট্রাম-বাস একটু খালি পাওয়া যায় সেই ভয়সায় এগুচ্ছি।" এটা বেশ স্পষ্ট বোঝাও যায় যে, তাঁর সময় থেকে আজকের অবস্থা খুব বেশী পাল্টায় নি। গল্পকথক যখন বিপাকে ঠিক তখনই তিনি ভোঁদাকে মোটর নিয়ে ভোঁ ভোঁ করে এগিয়ে আসতে দেখলেন। গদাইজনিত পূর্ব অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও গল্পকথকের ভোঁদার মোটর গাড়িতে চাপা আর তারপর একে একে ঘটতে থাকা প্রায় অ্যাকসিডেন্টের মতো চমকপ্রদ ঘটনা ও শেষে সেই সত্যিকারের অ্যাকসিডেন্ট আর গল্পকথক শিব্রামের মরতে মরতে বেঁচে ওঠা গল্পে এক নাটকীয় উৎকণ্ঠা যুগিয়েছে। ভোঁদা অত্যন্ত স্পিডে তার মোটর গাড়ি চালায়। তাই পথে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তার পদে পদে। ভোঁদার স্পিডোমিটারের কাঁটা পঁয়ষট্টি ছুঁই ছুঁই হলে গল্পকারের থরহরি কম্প হয়। কিন্তু ভোঁদার তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। কখনও গাড়ির দূরন্ত গতি সম্পর্ক তার বক্তব্য— "ভালো গাড়ি এমনি স্পিডেই চলে। এই রকমই স্পিড নেয়।" আবার কখনও গাড়ির মেকানিজম্ সম্পর্কে তার গর্বভরা উক্তি: "জানো গাড়িকে সবসময় টিপটপ্ কণ্ডিশনে রাখতে হয়, তা হলেই আর টপ করে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। গাড়ির মেকানিজম যদি গাড়ি মালিকের জানা থাকে আর সর্বদাই যদি সে নিজের গাড়ির খবর রাখে আর নিজেই চালায়....." এরকমই নিজ গাড়ি সম্পর্কে উচ্চ ধারণার অধিকারী ভোঁদা কখনও এক ইঞ্চির কিঞ্চিৎ বেশী ব্যবধানে

পথচারী সাইকেলের সঙ্গে তার মোটরের সংঘর্ষ এড়ায়, কখনও উল্কার বেগে ধেয়ে আসা লরির প্রায় গা ঘেঁষেই বেরিয়ে যায়। কোনো এক সময় পরপর দুটো পেট্রোল ট্যাঙ্কের রগ্ ঘেসে চলে যায় তার গাড়ি আর সহচারী শিব্রামের ভয়ে কথা আর নিঃশ্বাস দুই-ই প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। কারণ এ হেন 'যান লবে জান' এতে আর আশ্চর্য কি!। ভোঁদার পারফেক্ট ব্রেকের ভরসাতে তোলা সত্তর স্পিড ও গল্পকথকের মনে 'ভোঁদার নিজের ব্রেক' সম্পর্কে সন্দেহ জাগায়। অসীম প্রত্যয়ী ভোঁদা এরপর গল্পকথককে সজোরে গাড়ির পাল্লা ধরে থাকতে বলে চূড়ান্ত স্পিডের মাথায়ই এক মরণ ব্রেক কষে। আর সেই ব্রেকই কাল হয় তার। দুখানা গাড়ির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে গল্পকথক যখন বেরিয়ে আসে তখন গদার যান ধরাশায়ী আর মোড়ের পুলিশ সার্জেন্টকে এগিয়ে আসতে দেখে গল্পকথকেরও তখন জান বাঁচাবার পালা। আর :

"আর এমনি সময়েই, এই দুর্বিপাকে....ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন! কানের মধ্যে যেন মধুবর্ষণ হলো অকস্মাৎ।.....পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, থামিয়ে চেপে বসেছি তৎক্ষণাৎ। ওদের দুজনকে সেই সতর্ক অবস্থায় ফেলে রেখেই....না, রিকশায় কোনো রিকস্ নেই।"

সচেতন পাঠকের কাছে সম্ভবতঃ এ গল্পের একটি প্রখর ও বাস্তব আবেদন আছে। ঔপনিবেশিক সভ্যতার ছোঁয়ায় বহুদিন আমরা মোটর গাড়ি কেনা ও তাতে চড়ার কৌশল নিজেরা রপ্ত করে ফেলেছি। ক্রমশঃ এই মোটর গাড়ি কেনা ও চড়ার নেশাও বাড়ছে। আকাঙ্ক্ষার এই উর্ধ্বায়ন পরিবর্তনমুখী এক ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার দিকেই ইঙ্গিত করে। দু-চাকা (সাইকেল), তিন চাকা (রিক্সা) থেকে চার চাকা (মোটর গাড়ির-র এই বিস্ফারিত আয়োজন ভোগবাদের বিশ্বায়নকেই যেন দিকে দিকে নিরুচ্চারে প্রচার করে চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে ঐশ্বর্যজনিত আত্মদম্ভ। ভোঁদার অসম্ভব জোরে মোচর ছোটানোর মধ্যে দিয়ে তার এই আত্মদম্ভ, অর্থপ্রাচুর্য আর অহংকারই প্রকাশিত হয়েছে। শিবরামের প্রতিটি গল্পেই শিব্রামকে আমরা এক ছা-পোষা সাধারণ মানুষ হিসেবেই দেখতে পাই। এ গল্পেও তার ব্যতিক্রম নেই। তাই শিব্রাম তার আকাঙ্ক্ষিত রিকশাতেই ফিরে এসেছে, ভোঁদার আতিথ্য নিয়ে সে তার গাড়িতে উঠেছে বটে কিন্তু তোষামুদি মধ্যবিত্তের স্বভাবপ্রিয় চাটুকারিতা তার মধ্যে নেই, সে তার মধ্যবিত্তয়ানাতেই চির বিশ্বাসী, চির আস্থাশীল। এই গোপন সত্যটিকেই কৌতুকী আবরণে ঢেকে, গল্পের ব্যঞ্জনায় সেঁটে লেখক এ গল্পে পাঠকের চোখের ঠুলি সরাতে সাহায্য করেছেন। গল্পের নামকরণের অভিনবত্বটুকুও চোখে পড়ার মতো।

তথ্যসূত্র :

১। শিবরাম রচনা সমগ্র (অখণ্ড সংস্করণ), অন্নপূর্ণা প্রকাশনী, আশ্বিন ১৪০৬
২। আমার কথা, শিবরামের সেরা গল্প
৩। হাসির ফোয়ারা, শিবরাম চক্রবর্তী
৪। অন্তরঙ্গ শিবরাম, হিমানীশ গোস্বামী, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৮-ই আগষ্ট, ১৯৯০, পৃ।১৬
৫। শিবরামদার আর এক প্রস্থ, শৈবাল চক্রবর্তী, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪, পৃ. ৫
৬। অমৃত, ২২শে অক্টোবর, ১৯৭৬

কবিতা

তাপস রায

বসন্তের সেই সব বজ্র নির্ঘোষ, মনে কর

গ্রীষ্ম ফুটে উঠেছে জানালায়
তোমার ওরকম ফিরে যাওয়া, ওরকম নির্জনতা আয়োজন
সুনসান করে মুছে নিয়েছে চারপাশ, যে কেউ
তাকাতে চাইবে না
উপশম কীভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, দেখো
যেন মেঘ ভাসাবার নেই আর

আমাদের ডিঙি নৌকাটির কথা মনে কর
নদী নামাবার আগে কত কষ্টে নৌকো বানিয়েছি
পাহাড়ের অত আড়াল চার হাতে ঠেলে
আমরা নদীকে আসতে দিয়েছি এতদূর
যেকোনা বাড়ির মুখোরোচক নামকরণ করতে করতে
আমরা শহর বানালাম
গাঁ-গঞ্জে রূপকথা পেতে সেই সব চাঁদের কাহিনি, মনে কর

আজ আমাদের দৃষ্টি কটু চোখে পড়তে পারে
গ্লাসের ভেতর থেকে তৃষ্ণা উধাও
তাকে ফেরানো যাবে না।

Vol. IV Issue-VII / ISSN : 2394-4889

সৌমিত বসু

গাজায় নিহত পুত্রকে কবরে শুইয়ে

মাটির ওপর শুইয়ে রাখো আপন হৃদয়
চোখের জলে বাঁধ মানে না মৃত্যু-কঠিন
আর একটিবার জন্ম হ'লে তোকেই যেন
সারাজীবন বুকের ভেতর আগলে রাখা
উঠছে মাটি শূন্যে যেন ছাই উড়ছে
উড়ছে বুকের নরম পালক উন্মাদিনী
ঠোঁটের ওপর যত্নে রাখা আলতো চুমো
শুইয়ে দিলাম মাটির ওপর জন্মঘুমে
পিতার বুকে পুত্র হয়ে আবার জাগিস
কান্না পেলে রাখবি মাথা এমন বুকে
মাটির ওপর শুইয়ে রাখা আপন হৃদয়
মাটিই জানুক স্রোতের সাথে নদীর কি টান।

নির্মল করণ

সেই ছবিটা

আঁকতে আমার ভাল্লাগেনা
অথৈ বানের জল
ঘোলা জলে ভাসছে বুবুর
বই-খাতা-সম্বল।

আঁকতে গিয়ে মনটা ভার
উঠছে চোখে ঝড়
থুবড়ি বুড়ির থুবড়ে পড়া
ছিটে বেড়ার ঘর।

যত্নে আঁকি সেই ছবিটা
রাখি সোনার ফ্রেমে
দিচ্ছে যাঁরা চিড়ে গুড়
কোমর জলে নেমে।

সুভাষরঞ্জন দাস

আশা

রাত শেষ হলে
ইমারত ঝরে ঝরে পড়ে
ভেসে যায় জগৎ সংসার
তবু আশা জেগে থাকে
নিভু নিভু প্রদীপ আলো খোঁজে

আবর্তন

পুনর্জন্ম হয় কিনা জানা নেই
কিন্তু এই একটা জীবনে আমি
অনেক অনেকবার জন্মেছি
দেখেছি অতীত ফিরে ফিরে আসে কালচক্রে
আবর্তন পূর্ণ করে আবার।

সময় নেই

লজ্জা হল নীরব ভূষণ
একথা সুপ্রাচীন
কালপেঁচা জানান দিচ্ছে শেষ প্রহরের
আকাশে বাতাসে নিথর নৈঃশব্দ্য
শেষ দেখার মত সময় নেই।

সুমন গুণ

সন্ধ্যাভাষা

সতর্কবার্তার মেঘ মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল

বিপন্ন নৈর্ঋতে, কিন্তু, উস্কানিময় চারপাশে
নোনা হাওয়া, পাগল বিদ্যুৎ তীব্র জাল
টেনে নিয়ে গেল সব, কপাট তছনছ হলো, একের পর এক
হামলায় উথলে উঠল জমানো সমস্ত লিপ্সা, গুপ্তকাতরতা

শেষরক্ষা হলো না তবুও। প্রতিরক্ষা ধেয়ে এল
পাগলের মতো, খুঁটে খুঁটে তুলে নিল
সদ্যোত্থিত সব দানা, প্রবল দমকে
গাঙ্গেয় খিলান ভেঙে পুঁতে দিল স্পষ্ট কাঁটাতার

একবছর হয়ে গেল, আজ সেই আগ্নেয়বার্ষিকী
কয়েকটি বিপন্ন শব্দে অবলুপ্ত স্মৃতিকথা লিখি।

সুশীল মণ্ডল

অলৌকিক চরাচরে

নির্বোধ অন্তরাত্মা
রোজ রাতে দুঃস্বপ্ন ছড়ায়
চক্রবালে রূপকথার ঝাঁপি
ফিসফিসিয়ে ওঠে
হাত বাড়াই ধরবো বলে
উল্টো মুখে চলে যায় চেনা নদী।

অনন্য বারান্দায়
কম্পিত ক্লান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি,
বোবা যন্ত্রণা
চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যায়
অলৌকিক চরাচরে।

নির্মল সামন্ত

নির্বোধ স্বপ্নগুলো

দিন গুনেছি আমি, তুমি আসবে বলে
রাত্রি থেকে দিন, দিনের থেকে বছর
তুমি আসবে বলে অপেক্ষার প্রহর ভেঙেছি আমি।
রাজপথের গলি থেকে প্রান্তরের সবুজ ঘাসের আলপথে
আসবে বলে তুমি
আমি সাগরেও দিয়েছি ঝাঁপ সহস্র ঢেউয়ের ওঠা-নামায়।
স্বপ্নের মেদুরে আমি চিনেছি তোমায়
মমতার বিকিরণ তোমার উজ্জ্বল দুটো চোখে
বরাভয় সস্নিগ্ধ প্রসারিত দুই হাত,
নতুন শপথ নিবিড় নিঃশ্বাসে নতুন আশার কথারব....
পথ চেয়েছি আসবে বলে তুমি।
বিনিদ্র রাতে বুকের মাঝে বুনেছি বাবুই বাসা
শুনেছি চাতক চাওয়া সমুজ্জ্বল পৃথিবী,
নিবিড় সবুজের স্বপ্নকুমারী ভেবে মুদ্রা গড়েছি নাচের
আসবে বলে তুমি....
তুমি এলে.... তুমি এলে....
হাজার সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে
তুমি এলে আগুনের ফুলকি-রথে চড়ে
তুমি এলে আকাশে বাতাসে সানাই-এর সুর তুলে।
তারপর.... তারপর.... নিঃশ্বাসের পরতে পরতে
আমার চোখের ঘোর কাটে....
হোঁচট খেয়ে ভেঙেছে আমার বিবেক
আঘাতে আঘাতে রুদ্ধ আমার স্বর
অস্ত্র-বারুদে ঝাপসা আমার চোখ, ছবিও বর্ণহীন
তুমি এলে.... থেঁতলে গেল আশা-পথ পায়ের চাপে
বিধ্বস্ত সকাল, বিক্ষত আমার রূপসী স্বভূমি ছন্দ
বঞ্চনার বহ্নিশাপে মিথ্যের মিছিল
দেখতে চাইনে তো আমি....

শ্রীজয়

ধ্বনি থেকে হরিধ্বনি

আমি দেখি দুটি চোখ
কাজল মাখা ভুরুর নিচে
সমুদ্রের ওপারে নিকষ কালো
তপস্বিনী মুখ
ঢেউ মেখে
কখনো সে মেঘ বালিকা,
আর বাতিল শাড়ির মতো
লাট খাওয়া বিগত শতক
বলে, আসতে দাও ভেতরে
একবার শেফালি ছুঁয়ে দেখি
মাধবীলতা-আশ বাগানে থাক
বসতে দাওনা একটু নদীর পাশে
বেঁচে থাকতে
তিনকাল পরেও
অন্যথা হবে না।
এ প্রেম দেহে নয়
যাওয়ার আগে
ধ্বনি থেকে হরিধ্বনি তোলে
ছায়ার শরীর,
শাদা পাতায় জগন্নাথের পদচিহ্ন
পৃথিবীর সাথে মানবের এ টান—
প্রতিদিন তাই ঘুম ভেঙে
বাগানে জল দেয়া
একবার দেখে নেয়া
মল্লিকার প্রস্ফুটিত ঠোঁট
যেন ছবি আঁকে লোক
বারে বারে ভেসে যায়
পুব থেকে পশ্চিমে রাত দিন খেলা
যেন সনেট কবিতা
উষাকালে গৌরী-দীপ
সন্ধ্যাকালে শোভাযাত্রা
টলটলে গভীর প্রেম, শুধু প্রেম।

পড়ন্ত বেলায় আসে চাঁদের নৌকাখানি
যেখানে থাকে সন্ধ্যানদীর জোয়ার
প্রিয়তমা একবার বেদনা জাগাতে
কর স্পর্শ করে বলুক
অশ্রুপাত শেষ হলে পর
গঙ্গাজলে ধুয়ে দিও
অস্থিভস্ম সব—
আমি যে ওর আগামী সঙ্গিনী।

তন্ময় ঘৃতকৌশিক চক্রবর্তী

একান্ত সর্বনাশ

যা কিছু ছন্দ আছে.... ভাঙন আছে...
প্রেমের একান্ত পাথর চিনেছে আশ্চর্য করুণা...
এ'ভাবে যে ভাঙছে পাথর সংলাপ মুগ্ধ পরাগমূলে...
তীব্র অনুভূতি হিসাব মেলাচ্ছে অন্তর্গত অভিশাপ...
ছায়ামূর্ত্তিগুলো সরে সরে গেলে খুঁজি তোমার রূপান্তর...
উত্তেজনাহীন জড়পুরুষের বুকে উল্লাসের ঈশ্বরী মহান...

বিকৃত বা অন্যের অবশিষ্টতায় নয়....
অধরা তুমি...তবু জেনেছি পবিত্র সে চাওয়া...
যেমন পবিত্র শান্ত বালুচর...বরফউল্লাস...
সাহসী সমুদ্রে ভাঙা ঢেউ অভ্রান্ত যৌবন....

বলেছি তো সবটুকু কথা....
বলেছি বাটপারি করে রাখবো না কিছু...
যা কিছু ছোঁয়া... মূল্যবান...
বলেছি এ আমার কৌশল নয়... ঢেউ যদি ভাঙে চর...
সে চরের বুকে স্থাপন করবো সভ্রান্ত সর্বনাশ...
এই যে সর্বনাশ শব্দ'টাই মহার্ঘ হচ্ছে ক্রমে...
সেখানেই নাভি ছুঁয়ে ফিরে গেছে বাতাস...
ঐ মহান বাতাসে পবিত্র ঈশ্বরী মহান...

মহান হতে যতটুকু আবেদন রাখা যায়
আভিজাত্যে বেঁধেছি তার তান...
রেখো প্রকৃত নক্ষত্রবলয়ে...
তাকে ডাক দিয়ে যাই...

তোমার বাতাস ছুঁয়ে জাগছে তীব্র অহংকার....
ও'গো কাব্যলক্ষ্মী...
সাধের শয়ান...
একান্ত পাথর আমার...

তরুণ কুমার চৌধুরী

রাজনীতি

তিনটে লাশের দেহ জুড়ে ছুরির তীক্ষ্ণ ক্ষত
বেশ তো আছি স্বাধীন দেশে আমরা যে যার মতো।

লাশগুলো কি মর্গে যাবে? স্বর্গে যাবে কবে!
ভাবতে গিয়ে রাত কেটে যায় সূর্য উদয় হবে।

রাজনীতির ঘুঁটির চালে কেউ জেতে কেউ হারে
মারণ অস্ত্রের ডেরা বাঁধে রাতের অন্ধকারে।

কার ঘাড়ে আজ ক'টা মাথা বুঝিয়ে দাও তাদের
গোলা-বারুদ সঙ্গে নিয়ে সালাম এবং কাদের।

রাজনীতি যে রাজার নীতি মূর্খরা কি জানে?
গূঢ় অর্থ বুঝিয়ে দাও ওদের কানে কানে।

বুঝলে ভালো, না হলে কি টানতে পারি দলে?
চোখ রাঙালে মাটির পুতুল তারাও কথা বলে।

অনুকম্পার ধার ধারি না, মুণ্ডু ধরে টানি
চোখের থেকে ঝরবে না আর এক বিন্দুপানি।

অলোক দাশগুপ্ত

দায়বদ্ধতার সৃজন

উত্তরীয় পরিধানে উত্তরদাতার দায়বদ্ধতা
প্রশ্নটা সজাগ সাবলীল
নবীন প্রবীণ প্রত্যেকটি ক্ষতের উষ্ণতা
একেকটা যুগের দস্তাবেজ দলিল।
ইদানিং অনুষ্ঠান উপভোগ ব্যবস্থা
অন্তর্কলহে পরিপাটিতে মলিন
ইচ্ছা অনিচ্ছা চাপিয়ে দেওয়া
মানতে হয় চীফ সুইপ কুলিন।
তবু মনে হয় সম্মাননা, উত্তরীয় বাতাসের গোঙানিতে
ঘুরে ফিরে আসে ঢেউয়ের স্রোত
কবিতা সাহিত্য শব্দের নিপুন বাঁধন-পুষ্ট
অমানিশা বোধের উপর চন্দ্রিমা রোদ।
এইভাবে একেকটা নগ্রোধ অশ্বত্থ সুদক্ষতায়
আকাশ চুড়ায় হয় আসীন
দায়বদ্ধতার ভালোবাসার ছায়া দেয়
পরবর্তীর অনুগামীর সৃজন।

অমরেশ বিশ্বাস

ফিরে আসে

একদা বিরোধীর রক্তে রাজপথ রাঙায়িত
এখনো ইটবৃষ্টি লাঠিচার্জ সম্প্রচারে বাধা
বেরিকেড ভাঙায় জনতা সহজে
অতিদর্প শাসক অদৃশ্য উপস্থিতিতে থাকে,
মূঢ়তায় ভরে যাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত
চলতে থাকে রোষ এবং অবরোধ
অহং স্থগিত রেখে কোনো কর্ম চলেনা
নিয়ামকহীন জটিলতা বেড়ে ওঠে
সূর্যস্নানে ধুন্দুমার ক্রমাগত হেনে যায়।

রবীন বসু

ফুলের কলি

এই যে আমার একলা ঘর, অনেক সময়
যদি তুই আসতে চাস, আসতে পারিস
কিন্তু মেয়ে সাবধানে আয়
কে যে কখন বাঘ হয়ে যায়
আগে থেকে বোঝা যে দায়
একটু তোকে খুলেই বলি
গল্পটা ঠিক গা-সওয়া নয়
বোকা মেয়ের বোকা গল্প
প্রতিদিনের রোজের গল্প
জন্মদিনের পার্টির গল্প
কিশোর বেলার বন্ধু ছিল
ফোনের পর ফোন যে এল
না এলেই ভালোই হত
মেয়ের বুকে বিশ্বাস ছিল
বন্ধুরা কি খারাপ হবে?
কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে গেল
পানীয়ে ওষুধ দিল
মেয়ে তখন জ্ঞান হারাল
তারপর যা হয়ে গেল
সে কথা নাই-বা বল
মধ্যরাতে একলা মেয়ে
সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে
অন্ধকারে মুখ লুকালো
বোকা মেয়ের গল্প আমি
যাকে পাই তাকেই বলি
তোরা সব সাবধানে আয়
নতুন ফোটা ফুলের কলি।

তাপস মাইতি

আকাশ-পরিচয়

সেই পাঠশালা, বুড়ো-মাস্টার, শাসনের বেড়াজালে শিক্ষাসূচি
সকাল সাতটায় ঠিক আসা চাই, নচেৎ বেত্রাঘাত কঞ্চি—
বাড়ি ও কানমোলা যথেচ্চার চলে দশটা অবধি
ডাক ক'রে পড়া-পড়া আর শ্লেটের খড়ির তমাদি

পাশেই পথ, রৌদ্র এসে পড়লে শীত জখম হয়
আমি তখন ভাবি অন্যমনে আকাশ-পরিচয়
মাস্টার মশাই হঠাৎ জালবোনা ছেড়ে আমায় লক্ষ্য করে—
আমার উদাসীন মনে তাহার সতর্কবাণীর আগুন ঝরে

আর পড়ুয়ারা মশগুল পড়ায়, যথোচিৎ পড়া দেবে ব'লে
আমার মাথায় দূরে কেবল, দাসেদের আমগাছ বিষম খেলে।

নীল রায়

সিরিয়া ও প্রতিক্রিয়া

তোমার বাচ্চা হোঁচট খেলে দৌড়ে এসে কাছে
কোলে তুলে আদর করো আঘাত লাগে পাছে
ওরা যখন জ্যান্ত জ্বলছে কোথায় প্রতিক্রিয়া
ঈশ্বরেরা পুড়ছে এখন দাউ দাউ সিরিয়া।

তোমার বাচ্চা খেতেই চায় না নষ্ট করে খাবার
ঘুমিয়ে থাকে নির্ভাবনায় মাঝখানে মা বাবার
ওদের যখন ঘর হারালো কোথায় প্রতি ক্রিয়া
ছেলের লাশে ঘুমায় পিতা বীভৎস সিরিয়া।

শিশুর মুখে ধর্ম কোথায়? বৃথাই দেখছো খুঁজে
মনুষ্যত্ব উটপাখি আজ বালিতে মুখ গুঁজে
কেঁচোর হৃদয়, তাই এ হৃদয় করে না প্রতিক্রিয়া
আমার বাচ্চা দুধে ভাতে থাক, মুছে যাক সিরিয়া।

চৌধুরী নাজির হোসেন।

হে জীবন

খেলনা বাড়ি সাজাতে সাজাতে দিন চলে যায়
মনের বাড়ি ভীষণ একা
পুড়ে ছাই তার সাতরঙ রামধনু
তাই পিকাসোর হাতে নেই তুলি, মকবুলের
ঘোড়াগুলি আর ছোটেনা এখন।
হে বাক্সবন্দী জীবন,
শুধু সাপ-লুডো খেলা
ছকে ঘোরা অবিরত ক্রমশ বাসনা!
না, চল বেরিয়ে পড়ি—
আমারও আছে কিশোরী নদী
যেখানে আবহমান কাগজের নৌকা ভাসে;
আমারও আছে সবুজ দ্বীপ
লালকমল, নীলকমল অন্তহীন...

শঙ্খ অধিকারী

শর

তীরের ফলার মতো পড়ছে বৃষ্টি।
তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ বনজ ঘরের বারান্দায়,
বাতাসে উড়ছে তোমার গৈরিক আঁচল।
এলোমেলো চুলের বাঁধন।
গুণগুণ করে উড়ে যাচ্ছে কয়েকটা ভ্রমর।
শত শত সহস্র সহস্র শর এসে
বিদ্ধ করছে তোমাকে—
তবু শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই।
শুধুমাত্র বিদ্ধ হচ্ছ মন।
যেহেতু আজও কোনও একজন মানুষের চোখ থেকে
ঝরে পড়ছে শরের মতন বৃষ্টি।

রমেশ পালিত

নিরুদ্দেশ তরী

সেই ভাল আমার চিতার আগুনে তুমি মিটিয়ে নাও কামনাবহ্নি
পৃথিবী দেখুক এক ভয়ানক ভালবাসা, এক নির্মম প্রেমাকাহিনি
বিশ্বাসের মূল্য চোকাতে দারুণ দাম দিতে হল আমায়
চোখের জলে কাটে অসহ দহন দিন
একলা পথে নিত্য মেটায় নিষ্ঠুর প্রেমের ঋণ!

এ কেমন প্রতিশ্রুতি, এ কেমন প্রণয়পাশা
দয়াল
ভালবাসা এত ভয়াল!

কেন শুরুতেই ঠোঁটে দিলে না বিষ
তীব্র জ্বালায় জ্বলছি পুড়ছি অহর্নিশ!

না
তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই
তুমি যা করেছ হয়তো না বুঝে করেছ
অথবা
পরের প্ররোচনায় বাড়িয়েছ পা
আমি ভাসিয়ে দিয়েছি আমার নিরুদ্দেশ তরী
যথা ইচ্ছা তথা যা।

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

কাপুরুষের জন্য পৃথিবীর প্রেম নয়

ভুলের নদীর পাড়ে সত্য দাঁড়িয়ে আছে,
সকলের মতো আমি বিশ্বাস করি না
ভুলের নদীর পাড়ে ভুলেই দাঁড়িয়ে থাকে সকাল বিকাল
যারা শোধরাতে আসে তারা ভুল হয় নয় তো
ভুল থেকে কেউ একজন ভালো হতে সরে আসে আজন্মকাল
একসাথে ভুল ও সত্য থাকতে পারে না পারলে
ছায়ার নিচের গাছ বাড়তে বাড়তে বিভৎস্য হত না।

কল্পনা কল্পলোকের আয়না
বাস্তব কঠিন হলেও সত্যের শাখা ছড়ায় দেশ ও বিদেশ
কুয়াশা সরে যায়
সূর্যের তেজও হয় মস্তান
আকাশও বসন্তের রঙ নিয়ে থাকে

'ওসব পাগলের প্রলাপ' বলে-ধ্বজভঙ্গ ও মেকী মুখোশধারী
পাথর-মাটিতে বৃষ্টিতে স্নান করছে যে সেই জানে
বৃষ্টির জলে ঘামাচি দূর হয়
ক্লান্তি বিশ্রামে যায়
সর্দি-গর্মি আসে না শরীরে...

এর জন্য চাই কোমল মন তবে
বজ্রের মতো কঠিন ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে ব্যক্তিত্ব
কাপুরুষের জন্যে পৃথিবীর প্রেম নয়।

ত্রিদিবেশ চৌধুরী

থুতনিটা নাড়িয়ো না

থুতনি টা নাড়িয়ো না—
তোমার তিলের ছবি নিচ্ছি এখন—
চিবুকের—
আর গালের টোল টারও—
দুলে যেও না বিহঙ্গীর মতন—
ছবি নড়ে যাবে—
আর ডানা ও নড়ে যাবে—
উড়বে কী করে—
মেঘলা চুলে—কি ওড়ালে বলোতো—
চারধার মেঘলা হয় গেলো—
তোমার মরালী গ্রীবার শ্বেত-শুভ্র পারিজাত—
সু-উচ্চ দুটি বলয়ের—শুভ্রতা
তানপুরা সদৃশ দেহ বল্লরী—
নিখাজ শরীর-ক্ষীণ কটি—
সুদৃশ্য পদযুগল—হরিণীর দৌড়ের পদশব্দ যেন—
কস্তুরী—নাভীর গন্ধ পাগল হরিণীর ছবি যেন—
ছবি তুলতে আর আঁকতে গিয়ে—
শিল্পীর তুলি পড়ে যায়—ক্যানভাসে এলোমেলো রঙ—
ছেনী খসে পড়ে রামকিঙ্করের হাত থেকে—
নারী মূর্তি গড়া-অতো কি সহজ—
তুমি ন'ড়ো না সুন্দরী—
তোমার চিবুকের তিলের সুষমায়—
আকাশে তারা ফোটে রোজ—
ওষ্ঠ দেখে গোলাপ আর নাভী থেকে পদ্ম ফোটে—
হরিণী ব্রীডাবনত হয় তোমার চলার ভঙ্গিমায়—
তুমি এখন লাল কার্পেটে হাটতে পারো—
পুরুষেরা সেরা মুকুট তোমাকে-ই দেবে জানি—
এখন ন'ড়ো না—তোমাকে দেখে সৌন্দর্য শিখছে সকলে—
আমি চলে গেলে—
চলে যেও ঈপ্সিত পুরুষের সাথে—
এখন তোমাকে আঁকছি—গড়ছি—
একটু স্তব্ধতা চা-ইছি—দেবে.....

অচিন মিত্র

এপিটাফ

১.
কৃতজ্ঞতা অর্থহীন তারিফ করুন। সাড়ে তিন হাত জমি। নিঃশর্ত হস্তান্তর।

আপনারা ভালো থাকবেন।
২.
সব ছিল... তার কিছুই ছিল না।
৩.
বিবিধ দরদাম, কীসের বিনিময়ে কী, কখন কীভাবে।

যদিও ভিখারি ছিল, শর্তে নিজের। সহৃদয়তা ফিকে হতে হতে কখন যে কখন যে কৃপা হয়ে যায় জানত। জানত সে ভণিতার সুরপথগুলি, লাবণ্যের কমনীয় প্রলেপ সমূহ।

রেখে গেছে, দেখেছ সে নেয়নি মলাট?
৪.
হারেনি সে....জিতিয়ে দিয়েছে
৫.
সে। শব্দকে ছুঁতে চেয়েছিল
৬.
হৃদয়! খোপ-খোপ, খাঁচা। ধরেনি প্রাণ। এইখানে।

প্রবন্ধ

দিনেশ দাসের কবিমানস ও কবিতা

চন্দনা মজুমদার

মানবতাবাদী কবি দিনেশ দাস তাঁর জীবনের আদর্শকে খুঁজবার চেষ্টা করেছেন সারা জীবন। ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে, সাহিত্যিকদের মধ্যে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল—সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের চিন্তা বনাম শিল্পীর স্বাধীনতা। রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব বসু থেকে শুরু করে বামপন্থায় বিশ্বাসী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ জড়িয়ে পড়েছিলেন এই বিতর্কে।

শিল্পী যখন সাধারণ সামাজিক মানুষ, তখন তিনি একরকম ভাবেন। যখন তাঁর হৃদয়ে বিশ্বমানবের সমস্যা প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তিনি অন্যরকম ভাবনা-চিন্তা করেন। দিনেশ দাস তাঁর জীবনের পথে ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে আদর্শ ও বিশ্বাসে এসে উপনীত হয়েছেন, তা হল শাশ্বত মানবতাবাদ।

তাঁর জীবনের প্রথম পর্বের কবিতা ছিল সহজ আবেগময়, রোমান্টিক। সরল বিশ্বাসের জগৎ। জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে তা পরিবর্তিত হয়েছে বামপন্থী সমাজভাবনা ও সাহিত্যবোধের পথে। জীবনের পরবর্তী স্তরে তিনি রাজনৈতিক বিশ্বাসের পথ থেকে সরে যান। রাজনৈতিক বিশ্বাসের আশ্রয় ছেড়ে ব্যক্তিগত স্তরে নিজস্ব নীতি ও মূল্যবোধকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি সত্যের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হন নি। তাঁর কর্মজীবন ও লেখায়, এই বিবর্তনটি ফুটে উঠেছে।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর কবি দিনেশ দাসের জন্ম হয় কলকাতার আলিপুর অঞ্চলে। তিনি এক স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। অল্প বয়সেই তিনি পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করেন। গোপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তাঁর কিশোর-মন সমর্থন করতো বিপ্লববাদী আন্দোলনকে। তিনি যুক্ত ছিলেন স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে। ১৯২৭-'২৮ খ্রীস্টাব্দের বাংলা উত্তাল করেছিল বাংলার মাটি । জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের দাবি ও আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলা। তরুণরা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্য।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে লবন আইন ভঙ্গ আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। আইন অমান্য করতে গিয়ে তিনি আহত হন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টা, তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

আশুতোষ কলেজ থেকে আই. এ (১৯৩২ খ্রীঃ) পাশ করেন। এরপর স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়েন। এই সময় থেকেই কবিতা-চর্চা শুরু। ১৯৩৪ খ্রীঃ নাগাদ তাঁর কবিতা সাপ্তাহিক 'দেশ' ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ছাপা হতে শুরু হয়।

সরকারি চাকরী করতে অস্বীকার করায়, পিতার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটে। ১৯৩৫-এ কলকাতা ছেড়ে কার্শিয়াং-র কাছে খড়িবাড়ি চা-বাগানে চলে যান। পেশা হিসেবে শিক্ষকতা

Vol. IV Issue-VII / ISSN : 2394-4889

বেছে নেন। হিমালয়ের পাদদেশে চা- বাগানের ম্যানেজারের বাড়িতে গৃহ-শিক্ষকতা করতেন। অবসর ভরিয়ে তুলতেন পারিপার্শ্বকে চিনে নেওয়ার কাজে। কবি জানিয়েছেন ঃ

'একদিকে হিমালয়ের ধ্যান-গম্ভীর পার্বত্য প্রকৃতি আমার অস্থির প্রকৃতিকে শান্ত সমাহিত করল, অন্যদিকে চা-বাগানের নিপীড়িত কুলিদের দুর্দশা আমার মনকে গান্ধীবাদের প্রতি সংশয়িত করে তুলল।' (ভূমিকা, দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্র, মনীষা, ১৯৮৪)

কিছুদিন কার্শিয়াঙের চা-বাগানে গৃহ-শিক্ষকতার কাজ করেছেন। এখানে দরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষকে কাছ থেকে দেখেছেন। দারিদ্র্য-পীড়িত দেশকে চিনেছেন। কবি আকৃষ্ট হয়েছেন মার্কসবাদের প্রতি। সর্বহারার মুক্তির মার্কসবাদী ঘোষণা, তাঁকে প্রগতিপন্থার প্রতি গভীর মমতায় ও প্রতীতীতে মগ্ন করেছিল।

১৯৩৬-এ তিনি চা-বাগান থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন বাংলা কবিতায় কল্লোল গোষ্ঠির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত। 'পরিচয়', 'পূর্ব্বাশা', 'কবিতা' পত্রিকা কবিদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। গদ্য-কবিতা চলছে কবিতার লাল।

নতুন মতবাদ 'কমিউনিজম'-এর সঙ্গে এইসময় তাঁর পরিচয় ঘটল। তিনি 'কমিউনিজম' সম্পর্কে উৎসাহী হলেন। এ প্রসঙ্গে কবি স্বয়ং বলেছেন :

'১৯৩৬-এ চা বাগান থেকে ফিরে এসে একটি নতুন মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হলুম যার নাম 'কমিউনিজ্‌ম্'। এই মতবাদটির ওপর ব্রিটিশ সরকারের খুবই আতঙ্ক এবং পুলিশের কড়া নজর। অথচ তাঁদের চোখে ধুলো দিয়ে খিদিরপুর ডক্ এলাকায় আমদানী হত বিদেশী জাহাজ করে সাম্যবাদী গ্রন্থ ও পত্রিকা' (ভূমিকা, দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্র)

ব্রিটিশ সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে, খিদিরপুর ডক্ এলাকায় বিদেশী জাহাজে এসে পৌঁছতো সাম্যবাদী গ্রন্থ ও পত্রিকা। কমরেডদের সহায়তায় মার্ক্স, এঙ্গেলস্ ও র‍্যালফ ফক্স প্রভৃতি সাম্যবাদী মনীষীদের গ্রন্থ পাঠ করেছেন কবির কথায় :

'আমার কাব্যের হাওয়া বদল হল। রোমান্টিসিজমের ডুবজল থেকে ধীরে ধীরে সাম্যবাদের বাস্তব ডাঙায় উঠে এলাম।' (ভূমিকা, দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্র)

নানা গ্রন্থ পাঠ করে, মার্কবাদী চিন্তাচেতনা সম্পর্কে তিনি অবহিত হলেন। এইসময় লেখা কবিতা হল 'কাস্তে', 'লাল মেঘ', 'বামপন্থী', 'হাতুড়ি', 'ব্ল্যাকাউট ঃ ১৯৩৭', 'আন্দামান: ১৯৩৭', 'জাপান : ১৯৪০' ইত্যাদি। দিনেশ দাসের কাব্য-রচনার এই পর্যায়টি তাঁকে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি দিয়েছে।

১৯৩৮-এ বি. এ. পাশ করলেন। এই সময় তাঁর লেখা 'মৌমাছি' কবিতাটি স্থান পায় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এ। কিছুদিন ব্রিটিশ পুলিশের দৃষ্টির সামনে নজরবন্দী থাকেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ১৯৪১-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, হিটলার-এর রুশ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সমর্থন জানালো। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। কবি কিছুটা স্বস্তি পান। ১৯৪১-এ 'পূর্ব্বাশা' প্রকাশনী থেকে তাঁর প্রথম কবিতা-সকলন 'কবিতা ঃ ১৩৪৩-৪৮' প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ভুখ মিছিল', 'অহল্যা', 'অসঙ্গতি', 'কাস্তে',

'রাম গেছে বনে' ইত্যাদি। 'রাম গেছে বনে' কাব্যগ্রন্থের জন্য কবি রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'অগ্রগতি', 'অলকা', 'কৃষক', 'মাতৃভূমি' ইত্যাদি। ১৩ মার্চ ১৯৮৫-তে তিনি পরলোকগমন করেন। কবির বয়স তখন ৭২ বছর।

দিনেশ দাস তাঁর 'কাস্তে' কবিতার মাধ্যমে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। কবিতাটি ব্যাপক সাফল্য লাভ করে। তাঁর 'কাস্তে' কবিতা লেখা হয় ১৯৩৭ খ্রীঃ। ইংরেজ-শাসকের ভয়ে, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রথমে কেউ কবিতাটি ছাপাতে রাজী হন নি। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সহ-সম্পাদক অরুণ মিত্র এটি প্রকাশ করেন।

কবিতাটির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এই কবিতার প্রভাবে, সমসাময়িক লেখকেরা কবিতা ও গল্প লিখেছেন। অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে 'এযুগের চাঁদ হল কাস্তে' নামে দুটি কবিতা লিখেছেন 'কবিতা' পত্রিকার একটি সংখ্যায় (কার্তিক ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত। দিনেশ দাস সম্পাদিত 'অলকা' পত্রিকায় 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' শিরোনামে প্রকাশিত হল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবিদের কাছে চাঁদ তখন 'বুর্জোয়াদের মায়া' বা 'ঝলসানো রুটি' সেই চাঁদ, দিনেশ দাসের লেখায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে উঠেছে।

দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতার বক্তব্য লক্ষণীয়, কৃষিনির্ভর বঙ্গদেশে কৃষি-সভ্যতার বিকল্প নেই। এর প্রতীক হল কাস্তে। সব বাধা-বিঘ্ন, বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে অনায়াসে প্রতিবাদী হয়ে দাঁড়াতে পারে কাস্তে। কাস্তে কারো প্রাণ-হরণ করে না। প্রাণ বাঁচাবার উপায় তুলে ধরে। শস্য বা ফসল কেটে, ক্ষুধা-তৃপ্তির ব্যবস্থা করে। যন্ত্রসভ্যতা বা পারমাণবিক যুগের কর্ণধাররা ভেবেছিলেন, বারুদই শক্তির উৎস। কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখিয়েছে, এই শক্তির ফলাফল সর্বনাশা। এরা মানবসভ্যতা ধ্বংস করতে সক্ষম। কিন্তু এতে কোন কৃতিত্ব নেই।

কবি তাই সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সকলকে মাটির কাছাকাছি আসতে বলেছেন। জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-সব কিছু ধারক-বাহক হল মৃত্তিকা। 'কাস্তে' কবিতায় কবি বলেছেন, 'এ মাটির কাস্তেটা' শান দিতে। এই কবিতায় কবির শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা ও আস্থা প্রকাশিত হয়েছে। এই কাস্তে যাদের হাতিয়ার, সেই সব কৃষকের দল শ্রমজীবী মানুষ। কবি তাদের বন্ধু বা সংগ্রামের সঙ্গী ভেবেছেন।

কবি বিশ্বাস করেন, যুদ্ধ-শক্তি-দম্ভ কিছুই চিরন্তন নয়। মানুষ এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে। তাই পৃথিবীর প্রতি তার দায়বদ্ধতা রয়েছে। 'কাস্তে' কবিতায় দিনেশ দাস তাঁর প্রতিবাদী ও মানবতাবাদী মনোভাব চমৎকার ব্যক্ত করেছেন ঃ

"বেয়নেট হোক যত ধারালো—/ কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু।"

কবির প্রত্যয় ও সংগ্রামী চেতনা ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। বেয়নেট-ধারীরা শক্তিমান। তবে তারা ধ্বংসের প্রতীক। যুদ্ধ-জরের উন্মাদনা চারিদিকে। অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার চলছে। এর বিরুদ্ধে বাইরে থেকে আনা অস্ত্রে যুদ্ধ করা যায় না। নিজস্ব হাতিয়ার কাস্তেই সেখানে ভরসা। যে বিজ্ঞান মানব-কল্যাণে নিয়োজিত নয়, তা চিরজীবী হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজদের পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষকেরা মাটির কাছাকাছি

মানুষ। কবি কৃষকদের প্রস্তুত হতে বলেছেন ঃ 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে।'

বোমা, বারুদের ধ্বংসের ক্ষমতা আছে। তবু কাস্তের ধারের কাছে তারা তুচ্ছ। কাস্তে শুধু আত্মরক্ষার অস্ত্র নয়, ফসল কাটার অস্ত্র। ফসল হল বাঁচার রসদ। কৃষকেরা ফসল ফলায় ও রক্ষা করে। তারা হল মানব-সভ্যতার রক্ষাকর্তা।

কবির উপলব্ধি, এই যুদ্ধ-উন্মত্ত পৃথিবীতে চাঁদ নিয়ে রোমান্টিকতা কাব্য নয়। তাই কবি লিখেছেন :

'বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো—
এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে।'

মায়াবী চাঁদের অবস্থান দূরের আকাশে। অন্যদিকে কাস্তে হল বাস্তবের সত্য। এটি নিজস্ব অধিকারের বোধ জাগিয়ে তোলে মানুষের মনে।

বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি ট্র্যাজিক। যুদ্ধ সভ্যতার অগ্রগতি ঘটায় না, বা মানুষের মঙ্গল করে না। মানবিকতাবোধহীন বণিক সভ্যতাকে উদ্দেশ্য করে তাই কবি বলেছেন :

'চূর্ণ এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত সমুদ্রে'

'লৌহ-পৃথিবী' শক্তিমত্ত ফ্যাসিস্টদের এবং হৃদয়হীন সভ্যতাকে ইঙ্গিত করে। তারা আকাশ-বাতাস গুলি-বারুদে ভরে দিয়েছে। ধ্বংসের মধ্যে সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। যে পৃথিবী রণ-রক্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ, তা—'গলে পরিণত হয় মাটিতে'।

সব কিছুর উপরে মাটিই সত্য। মাটি আশ্রয় দেয়, ফসল ফলায়। কবির ভাষায় : 'মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে'। 'মাটির যুগ' আসলে মাটির প্রতি অধিকারবোধ। প্রকৃতির দান হল মাটি, তাতে সকলের সমান অধিকার। 'মাটির যুগ' হল কৃষি-নির্ভরতার যুগ। মৃত্তিকা শাশ্বত, অনিবার্য ও একমাত্র অবলম্বন হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। কবি ঘোষণা করেছেন :

'দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই! চেয়ে দ্যাখো বন্ধু।'

একথা উচ্চারণের মধ্যে মাটি ও মানুষের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পায়। মাটি-নির্ভর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের চিত্রকে আঁকতে চেয়েছেন কবি। যুদ্ধ-মৃত্যু, ধ্বং-ক্ষয়, রক্তের সমুদ্র অতিক্রম করে নতুন সভ্যতার কথা বলেছেন। কৃষি-নির্ভরতার কথা, সাম্যবাদের কথা বলেছেন কবি। কবির বিশ্বাস, একদিন যুদ্ধ শেষ হবে। তখন সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীতে নতুন জীবন সৃষ্টি হবে। কবির প্রশ্ন :

'কাস্তেটা রেখেছো কি শানায়ে
এ মাটির কাস্তেটা, বন্ধু!'

মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবার জন্য, প্রাণ-ধারণের জন্য কৃষিকার্য ও ফসল উৎপাদনই একমাত্র অবলম্বন। ফসলের আশ্রয় হল মৃত্তিকা। মৃত্তিকায় ফসল উৎপাদনের জন্য কবি মানুষকে

কাস্তে অবলম্বন করতে বলেছেন। কাস্তে হয়ে উঠবে নতুন সভ্যতা বা সৃষ্টির হাতিয়ার।

সৃষ্টির হাতিয়ারকে কবি শান দিতে বলেছেন। এই হাতিয়ারকে 'মাটির কাস্তে' বলে মাটির গুরুত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন। কবি হত্যার অস্ত্রকে, উজ্জীবনের অবলম্বন করতে চেয়েছেন। ধ্বংস, হত্যা ও হিংসার বিরুদ্ধে মাটির কাস্তেকে দাঁড় করিয়েছেন। কাস্তেকে প্রাণ-চেতনার ও প্রাণ-ধারণের প্রতীকে পরিণত করেছেন কবি। 'মাটির কাস্তে' নতুন জীবন-চেতনা ও উজ্জীবনের প্রতীক।

আসলে কবি একনায়কের অগ্রগতি রোধ করতে চেয়েছেন। জনগণের সম্মিলিত শক্তির কাছে প্রতিবাদী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। 'কাস্তে' আর নিরীহ ধান বা ফসল কাটার অস্ত্র থাকে না। চাঁদের আকৃতি নিয়েও তার রূপ হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর এবং সুন্দর।

শেষ পর্যন্ত 'কাস্তে' শ্রমজীবী মানুষের প্রতীক হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ-রক্তপাত-হিংসার পথ অতিক্রম করে যে শ্রমজীবী শক্তি মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে চায়, কবি তাদেরকে 'কাস্তে' হাতে তুলে নেবার আহ্বান জানিয়েছেন। দিনেশ দাসের প্রথম কবিতা সংকলন 'কবিতা : ১৩৪৩-৪৮'। তাঁর প্রগতিমনস্ক অধিকাংশ কবিতা পাওয়া যায় এই সংকলনে। তাঁর রাজনীতি আশ্রয়ী কবিতার উদাহরণ :

'প্রশান্ত সাগরে ভাসমান
অশান্ত জাপান
চীনের কিনার হতে এশিয়ার তীরে তীরে হানা দেয় আজ
মনে হয় যেন কোন্ যুদ্ধের জাহাজ।' (জাপান : ১৯৪০')

কোন কোন কবিতায় পুঁজিবাদ-বিরোধী মনোভাব ও প্রকাশিত। বহু পংক্তিকে পাওয়া যায়, যেখানে বামপন্ধার প্রতি কবি আনুগত্য স্পষ্টভাবে উচ্চারিত :

'বোমা আর বোম্বার
নাই বা রহিল আর
আমাদের কাস্তে তো আছে
হাতুড়ির হাতিয়ার। (ঘড়ি)

এই সময় বহু তরুণ অস্বচ্ছ ধারণার উপর ভিত্তি করে সাম্যবাদের মতবাদের প্রচারে ও কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। কবি দিনেশ দাস ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খোলাখুলি স্বীকার করেছেন যে, কমিউনিজম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

সাম্যবাদী পন্থায় আকৃষ্ট তরুণেরা ধাক্কা খেলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। বামপন্থী দলের ইংরেজ শাসকের প্রতি সমর্থন, তাঁদের আহত ও বিভ্রান্ত করল।

দিনেশ দাসও বিভ্রান্ত হলেন। গান্ধীপন্থার অনুসারী হয়েছিলেন তিনি। মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ, এই সময়ে বিচলিত হল। ১৯৪২-এ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পর গান্ধীর ভাবমূর্তি দেশবাসীর সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কমিউনিস্টরা 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

কবি এরপর রাজনৈতিক দলের মতামতের সঙ্গে নিজের অভিমত মেলাতে চেষ্টা

করলেন না। প্রতিবাদী হয়ে রইলেন সারা জীবন। সে প্রতিবাদ, একক ব্যক্তির প্রতিবাদ।

তাঁর কবিতায় ক্ষুধার্ত ও পীড়িতের প্রতি সহমর্মিতার আন্তরিক স্পর্শ দেখতে পাওয়া যায়। আত্মগত অনুভবের বহু সুন্দর কবিতা পাওয়া যায়। যা লিরিক কবিতার মূল অবলম্বন। চল্লিশের কবিরা সকলেই নির্ভর করেছেন ব্যক্তিগত অনুভবের শক্তি ও নিজের দেখার উপর। জাগতিক জটিলতাকে অন্তরে ধারণ করে সেই মনোভূমি থেকে তাঁরা কবিতাকে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছেন। কবি দিনেশ দাস সেই সময়ের স্বীকৃত বামপন্থী আদর্শ বেশীদিন ধরে রাখতে পারেন নি। ১৯৪৪-এ প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'ভুখ মিছিল' এর কবিতাগুলিতে মন্তান্তর-পীড়িত মানুষের কথা, বণিক সভ্যতার বিরোধিতা এবং প্রতিবাদী সংকলনের বাণী ধ্বনিত হয়েছে।

১৯৪৬—'৪৭ নাগাদ কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকায় তিনি আর একবার ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই কারণে তিনি সেই সময়ের সাম্যবাদীদের পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। ১৯৩৯ থেকে কলকাতার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে চাকরি করছিলেন। ইউনিয়ন গঠন উপলক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ১৯৪৬-এ দিনেশ দাস সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও স্বাধীনতা, ১৯৪৮-এ গান্ধী হত্যা ইত্যাদি তাঁকে গভীরভাবে বিচলিত করে। সেইসময়ে তিনি বহুদিন কবিতা লেখেন নি। তাঁর তৃতীয় কাব্য-গ্রন্থ 'অহল্যা'-র প্রকাশ ১৯৫৪-তে। তখন কলকাতা ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতা করছেন।

ভারতীয় গণতন্ত্রের উপর আস্থা রেখেছিলেন দিনেশ দাস। তা নির্মমভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল ১৯৭৫-এ জরুরী অবস্থার ঘোষণায়। সেই সময়ের অনেকগুলি কবিতার কবির মনোবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। 'আইন : ১৯৭৫' নামের কবিতায় কবি স্পষ্ট বলেছেন :

'অথচ স্বাধীনতার পর
আমি কখনও আইন ভাঙি নি
আইনই আমাকে প্রত্যহ ভাঙছে।' (রাম গেছে বনবাসে)

সত্তর ও আশির দশকের কবিতায়, দিনেশ দাস বারংবার ভারতের শাসকগোষ্ঠীর কর্মধারায় সংশয় ও অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। সেই সময়ে পশ্চিম-বাংলার রাজ্য সরকারের বামপন্থাকেও তিনি সমর্থন জানান নি। 'নোটবুক : ১৯৮৩' কবিতায় একই সুরে পশ্চিমবাংলার প্রশাসনকে প্রশ্ন করেছেন। রাজ্য প্রশাসনের প্রতি তাঁর বিরাগপূর্ণ ও ক্ষুব্ধ প্রশ্ন :

মনুমেন্টের শুঁড়ের ওপর লাল রং লাগিয়ে কী লাভ হল!
আকশে একটু নীল, একটু মেঘ, একটু জলের রং
থাকলে ক্ষতি কী।

তাঁর বহু কবিতাতে একথা স্পষ্ট যে, দিনেশ দাস দেশের বহু মানুষের জন্য একটি উজ্জ্বল সকাল চেয়েছিলেন। কবিতা একটি তাৎপর্যময় মুহূর্তকে চিরায়ত করে, নব পরিচয়ের বিস্ময় জড়িয়ে দেয়। দিনেশ দাস নিটোল ও সম্পূর্ণভাবে পাঠকের সেই চাওয়াটা মিটিয়ে দেন। তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আস্থাশীল ও সৌন্দর্যদৃষ্টি সম্পন্ন। এক স্পর্শকাতর ও মানুষের

প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ কবিমানস ছিল তাঁর। তাই তাঁর কবিতা পাঠক-চিত্তকে পূর্ণ করে তোলে।

বাংলা ছন্দের তিনটি ধারা ও গদ্য রীতি, সর্বত্র কবি সাবলীল। প্রথম দিকে অগ্রজ কবিদের অনুসরণ করেছেন। পরে বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন।

শব্দচয়নে তাঁর প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। সরল ভাষণকে তিনি ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন। তাঁর কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটেছে উপমা প্রয়োগে। স্পষ্ট অথচ ব্যঞ্জনাময় রেখায় মূর্ত হয়েছে তাঁর চিত্রকল্প। চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায়, চেনা পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিকোণে দেখার আনন্দ জাগে। তিনি প্রিয়ার চোখের মণির সঙ্গে একটি অভিনব উপমা দিয়েছেন :

নীল পেন্সিলে ধারাল সীসের মত
মণি দুটি তার চোখের কাগজে ছুঁয়ে। ('নীল চোখ', কবিতা)

যুদ্ধের পটভূমিকায় এরোপ্লেনকে তিনি বলেন 'লৌহ-শকুন' (কবিতা)। ঝকঝকে পরিষ্কার দিনকে তিনি বলেছেন :

'সাদা কাপড়ের মত দিন'। আবার কখনও বলেছেন : 'জন্তু দিবস দুপুর রোদে একলা খেলা করে।' ('অহল্যা')।

কল্পনাশক্তির প্রখরতায় তিনি জরুরী অবস্থার সময়ে দেখতে পান : 'স্বপ্নেরা ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটে।' (রাম গেছে বনবাসে)।

একটি আদর্শ কালের চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন 'অসুখে' (অহল্যা) কবিতায়—

'দেখি দূরে—ঊষার পায়ের গোছ টকটকে লাল
জীবন্ত হ্রদের মত টলোমলো আশ্চর্য সকাল।

দিনেশ দাস প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা রচনায় সার্থক, প্রেমের কবিতায় প্রেমের চাঞ্চল্য ও মদিরতা সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। সেখানে প্রেম ও প্রকৃতি এক সূত্রে মিলে যায়, সেখানে কাব্য সার্থকতা পাঠককে মুগ্ধ করে। 'সিংহিনী' (অহল্যা) কবিতাটি এর অনবদ্য উদাহরণ—

'চম্‌কো ওঠো! নীলচে আলো তোমার কটা চোখে
রাঙানো নখ আগুনে চকচকে
সিংহ-ঘন কপিল হল তোমার বালি-রং
শিথিল হল মায়াবী আবরণ :
তোমায় আমি কেমন করে চিনি—
মানবী হতে হয়েছ তুমি বনের সিংহিনী।'

তিনি মনে করতেন, কবি হওয়া মানে আত্মার পীড়ন। কবির মানসলোকে আলোর ঝলকানি উদ্ভাসিত হয়। সেই শুচিশুভ্র ঔজ্জ্বল্যকে কবি ভাষার মাধ্যমে রূপ দেন কবিতায়। এক ভয়ঙ্কর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে কবিমানসের মুক্তি হয়। এই মুক্তির মধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ মেলে। শঙ্খলিত মানব-জীবনে কবির মুক্তি ঘটে।

কবিতা ভালোবাসতেন দিনেশ দাস, কবিতার মধ্যে স্বাধীনতার মানে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। তিনি বলেছেন :

'আজ মহাদুর্যোগের দিনে এখনও আমি বিশ্বাস করি স্রষ্টা-শিল্পীরাই এযুগের শেষ জাদুকর।' (ভূমিকা, দিনেশ দাসের কাব্যসমগ্র)।

দিনেশ দাসের 'স্বাধীনতার মানে' শীর্ষক একটি বেতারভাষণ সম্প্রসারিত হয় আকাশবাণী কলকাতা থেকে ২২-০৮-৮৪ তে। এর কিছুদিন পরেই কবির মৃত্যু হয় ১৩মার্চ, ১৯৮৫-তে। সত্তর বছর বয়সে, জীবনের প্রান্তে পৌঁছে স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি মর্মরিত।

ভাষণটিতে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে দেশের মানুষের প্রকৃত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। স্বাধীনতালাভের এত কাল পরেও দেশের মানুষের জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটে নি। অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার সমস্যা রয়ে গেছে। কথা হল :

'দেশের সাধারণ মানুষের অন্নবস্ত্র: বাসস্থান ও শিক্ষা সমস্যার সমাধান হয় নি। সামাজিক কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, জাতিভেদ প্রকৃত স্বাধীনতা বিকাশের পথে অন্তরায়।'

'আন্তর্জাতিক U.N.O-র রিপোর্টে প্রকাশ ভারতের অর্ধেক জনসাধারণ এখনো দারিদ্র্য-সীমার নীচে অর্থাৎ এঁরা একদিন অন্তর মাত্র এক বেলার আহার কোনো রকমে সংগ্রহ করতে পারেন। সুতরাং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থটি এইভাবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের অননুভূত থাকে।"

এইসঙ্গে কবি নিজের মনের স্বাধীনতার কথাটিও ভেবেছেন ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ কতখানি সম্ভব, সে সম্পর্কে তাঁর সংশয়ী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন ঃ

"এই যে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, আমার ভিতরে রয়েছে হাজার বছরের সংস্কার, জাতি ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। তাই আমার ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তা পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করেছি, একথা আমিও জোর করে বলতে পারি না। সুতরাং 'স্বাধীনতার মানে' বলতে কি বোঝায় তা আজও আমার কাছে অস্পষ্টই।"

তাঁর গুরুগম্ভীর কথা বলবার ভঙ্গিটি অত্যন্ত সরল। কিন্তু আলোচনার বিষয়টি গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের দুই ধরনের স্বাধীনতার কথা বলেছেন—সামাজিক স্বাধীনতা ও চিত্তের স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতা লাভের জন্য বহু মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। প্রচেষ্টা প্রয়োজন। দারিদ্র্য ও সংস্কারের শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতায় মুক্তি দেওয়ার কাজটি সহজসাধ্য নয়। এরজন্য দলবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

যে কোন দলে, দলগত সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে একটি মত অনুযায়ী চলতে হয়। ফলে ব্যক্তির-মনের স্বাধীনতা খর্ব হয়। একটা দলের সকলেরই লক্ষ্য এক। তবু পারস্পরিক মতের অমিল হয়। তা থেকে দলের মধ্যে ক্ষোভ, দল ভাঙা, দল বদল হয়। এছাড়া মানুষের ব্যক্তি-স্বার্থজনিত নানা মানবিক দুর্বলতাগুলিও রয়েছে।

প্রশাসন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বময়। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র শিল্প-সাহিত্যকে অনুগত রাখতে চায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করতে চায় জনমত প্রচারের মাধ্যমগুলিকে।

আমেরিকায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুযোগ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। পুস্তক-ব্যবসায়ীদের একাংশ ধ্বংসমূলক কুরুচির দিকে গেছে। অনেকে তাই প্রকাশন সংস্থাগুলির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের কথা বেভেছেন। স্বাধীনতার সুযোগ, সেখানে সংশয় জাগিয়ে তুলেছে।

কবি দিনেশ দাস মানুষের স্বাধীনতার কথা বলেছেন। শিল্পীর স্বাধীনতার কথাও ভেবেছেন। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের চিন্তা ও শিল্পীর স্বাধীনতার সম্পর্ক, একটি চিরকালীন সমস্যা।

তিরিশ ও চল্লিশের দশকের বাংলায়, বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই নিয়ে মতান্তর ছিল। সমালোচিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ।

একজন সাধারণ মানুষ এবং একজন শিল্পীর স্বাধীনতার সমস্যা কিছুটা পৃথক। কবি যখন লিখতে বসেন, তখন তিনি আর একক ব্যক্তিমানুষ থাকেন না। তাঁর সামনে থাকেন পাঠক। পাশে থাকেন সহযোগী সাহিত্যিকগণ। তাঁকে ঘিরে থাকে বিশ্বজগৎ।

শিল্পী যখন সাধারণ সামাজিক মানুষ, তখন তিনি একরকম ভাবেন। যখন শিল্পীর চিত্তে বিশ্ব-দর্শন প্রতিফলিত হয়, তখন তাঁর ভাবনার ধারা হয় স্বতন্ত্র।

সব শিল্পী সম্পর্কেই কথাটি কম-বেশি প্রয়োজ্য। স্বাধীনতার অর্থ খোঁজার একটা বাড়তি দায়িত্ব থেকে যায় শিল্পীদের। এ তাঁদের অন্যতম একটি সংকট।

কবি দিনেশ দাস নিজের মতো করে আলোচ্য ভাষণে স্বাধীনতার মানে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখাতে ও চিন্তার পরিবর্তন ও বিবর্তনের অনেক পরিচয় আছে।

কবি জীবনের প্রথম পর্যায়ে, সহজ-সরল আবেগময় রোমান্টিক উপলব্ধির কবিতা লিখেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে, তিনি বামপন্থী সমাজভাবনা ও সাহিত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তৃতীয় পর্যায়ে, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংস্পর্শ ত্যাগ করেছেন। ব্যক্তিগত নীতি ও মূল্যবোধকে ধরে রাখতে চেয়েছেন। কখনো অসত্যের আশ্রয় নেন নি। সত্তর বছর বয়সে পৌঁছে, এই ভাষণে যখন তিনি বলেন :

"স্বাধীনতার মানে" বলতে কি বোঝায় তা আজও আশার কাছে অস্পষ্টই।'

তখন দিনেশ দাসের সমাজ সচেতনতার গভীরতর দিকটি ফুটে ওঠে। তিনি মানবতাবাদী কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার রয়েছে কবির সংবেদশীল মনের প্রকাশ। তিনি একাধারে স্বদেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক।

দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল গভীর। মানুষের যন্ত্রণা-বেদনায় তিনি আঘাত পেয়েছেন। যেখানে অন্যায় ও অত্যাচার দেখেছেন, প্রতিবাদী হয়েছেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য মুক্তির পথ খুঁজছেন। কবি মনেপ্রাণে মানবপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর কবিতার মূল সুর মানবতাবাদ। দিনেশ দাস বাংলা কাব্য-জগতে এক আধুনিক স্বতন্ত্র কবি-ব্যক্তিত্ব।

তথ্যসূত্র ঃ

১। একালের কবিতা ঃ পাঠকের দর্পণে, তরুণ মুখোপাধ্যায়, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ২০০৯, সোনার তরী, কলকাতা।

২। আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠ, সুস্নাত জানা, প্রথম প্রকাশ ১৪০৯, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৩। আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০০৫, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা।

লিঙ্গবৈষম, নারী ও সমাজ ঃ মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা

পঞ্চানন নস্কর

এক।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে লিঙ্গ নির্ধারণ আপাত দৃষ্টিতে একটি স্বাভাবিক এবং জন্মগত বিষয় হলেও বস্তুত এটি নির্মিত হয় সামাজিক যাঁতাকলের মধ্য দিয়ে। যেটি অত্যন্ত জটিল বিষয়। লিঙ্গ বলতে সাধারণ বিভিন্ন জৈবিকভাবে নির্মিত বৈশিষ্ট্যাদিকে বোঝায়, যার উপর ভিত্তি করে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ হয়। পৃথিবীতে আদি অনন্তকাল ধরে নানান বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে বর্তমানে আমরা সমাজের যেরূপে অবস্থান করছি সেই অবস্থানে দাঁড়িয়ে এখন স্পষ্টতই বোঝা যায় যে লিঙ্গ নির্ধারণ তথা এর পৃথকীকরণ স্বভাবতই একটি সামাজিক বিষয়।

আমার আলোচ্য বিষয়বস্তু মূলত আবর্তিত হবে ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে আশি বা আট দশকের কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত (১৯৬০-২০১১) যে এক স্বতন্ত্র জগৎ ও কাব্যভাষা নির্মাণ করেছেন তার উপর। যাপনে ও কবিতায় প্রথাভাঙা সাহসী ও অসংকোচ আত্মস্বীকারোক্তির এক নিরাবেগ ও সংবেদনশীল পথে চলে তাঁর কবিতার ধারা। এই আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল—স্ত্রী-পুরুষ এর সামাজিক বৈষম্যের ভিত্তিতে পিতৃতন্ত্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মহিলাদের সামাজিক অবস্থান এবং লিঙ্গ নির্ধারণের অভ্যন্তরে পুরুষালি সমাজের শোষণের স্বরূপ। আর সেই পুরুষতান্ত্রিক প্রয়াসের বিরুদ্ধে এযুগের নারী হিসেবে মল্লিকার প্রতিবাদ। লিঙ্গ রাজনীতি হিসেবে একে না দেখে অধিকারের দাবি, সমতার দাবি বলে মনে করতে পারি। তাঁর কবিতায় যে স্পষ্টভাষ জীবনলগ্নতা, যে লিঙ্গ সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধ আছে তাকে অনেকসময় কবিতা বলে মনে হয় না, মনে হয় জীবনের নগ্ন অভিজ্ঞতার ভাষ্য। মল্লিকা মূলত সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবনের কবি, যাকে একসঙ্গে লড়াই করতে হয় আবহমান লালিত পুরুষপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, আবার নারীর স্বাভাবিক অধিকার ও অবস্থানকে যথাযথ রাখবার জন্য, 'ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি'তে তিনি লিখেছেন—

"আমার শৈশবে কোনও লিঙ্গ ঈর্ষা কখনো ছিল না। আত্মপরিচয়ে আমি সম্পূর্ণ ছিলাম। আজও আমি দ্বিধাহীন সম্পূর্ণ মানুষী। তৃতীয় বিশ্বের এক স্পর্শকাতর কালো মেয়ে আজ থেকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে কে অধম কে উত্তম বাড়তি কে কমতি কোনটা এই কূট তর্কের মীমাংসা করবার ভার আপনাকে কে দিয়েছে ফ্রয়েড সাহেব।"[১]

দুই।

আমাদের বাংলা কবিতায় নারীবাদী কণ্ঠস্বর প্রথম সচেতনভাবে পাই কবিতা সিংহের কবিতায়, পরে তসলিমা নাসরিন, কৃষ্ণা বসুর চর্চায় তা আরও ব্যাপ্তি পেয়েছে। মল্লিকা সেনগুপ্ত তারই উত্তরসূরী। তাঁর কবিতায় মূলত ফুটে ওঠে 'লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ' যেখানে

নারী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায় ও 'পুরুষের আধিপত্যবাদ'কে অস্বীকার করে। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে নারীকে আত্মমর্যাদাময়ী, প্রতিবাদী, স্পর্ধিত ভূমিকায় দেখা যায়। তা বলে তিনি পুরুষবিদ্বেষী নন বা লেখিকার গায়েও 'নারীবাদী'র তক্‌মা এঁটে দেওয়া অযৌক্তিক।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অসম্মান ও অনাদর কি ভীষণ তা জানা যায় কৃষ্ণা বসুর শ্লেষাত্মক কবিতা থেকে

"একা থাকি, পুরনো গথিক বাড়িটিতে।
প্রোষিতভর্তৃকা নারী আমি বহুকাল,
আয়ুষ্মান পুরুষ বিদেশে সাফল্য ও
শ্বেতাঙ্গিনী সহবাসে দুর্দান্ত রয়েছে।"[২]

প্রতিবাদে দৃপ্তময়ী কবিতা সিংহ লেখেন—

"অন্তত একজন তার উদ্ধত মস্তক তুলে দীর্ঘ' দাঁড়াক
অন্তত একজন তার বেণী খুলে হোক না পাঞ্চালী।"[৩]

উল্লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে একদিকে আছে যন্ত্রণা, অপমান; অন্যদিকে ক্ষোভ, প্রতিবাদ। কবি মল্লিকা 'কথামানবী' গ্রন্থের সূচনায় লিখেছেন—

"মাটি জল বায়ু অগ্নি এবং মানুষ
ভারতবর্ষ তোমাকে প্রণাম করেই
সেই ইতিহাসে কোণঠাসা নারী আমরা
শুরু করলাম কথা মানবীর ভাষ্য।"[৪]

বুঝতে পারি নারীবাদী ও মানবতাবাদী কবি হিসেবে মল্লিকা স্পষ্টবাক এবং হতমান মানুষের জন্যই তাঁর কলম অস্ত্র হয়ে ওঠে। আর এই যুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার অবিরাম সমাজকে, পুরুষকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, কেন শুধু মেয়েরাই বঞ্চিত, লাঞ্ছিত হতমান হয়? কেন লিঙ্গ বৈষম্য মানসিক দূরত্ব তৈরি করে নারী-পুরুষে। রবীন্দ্রনাথ নারীকে 'সবলা' হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মল্লিকা নারীকে 'আপন ভাগ্য জয় করিবার' মন্ত্র দেন, সঙ্গে সঙ্গে নারী জন্মের ব্যর্থতা যন্ত্রণা লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর 'সোহাগ শবরী' কাব্যে পড়ি :

"পরপুরুষের সঙ্গে তেমন মধুরস্বরে আলাপ করো না
হে নারীরা, যাতে তারা ক্রমশ প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে, দেখো যেন
শৃঙ্গার মুদ্রার টানে টানে চোখ না আটকে যায় তোমাদের।"[৫]

সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের টানা পোড়েনে যে ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে তারই রক্তাক্ত গান তিনি লিখেছেন, 'ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে' কাব্যে দেখি—

"আমার প্রতিবাদের ভাষা নগ্নতা নগ্নতা
মণিপুরের আগুনে আমি জ্বালব কলকাতা।"[৬]

আবার কখনও উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন—

"আমরা তো জানি পৃথিবী রমণী আকাশ আদিমপুরুষ
তবে কেন তুমি আমার দুহাতে শেকল পরিয়ে রেখেছ

হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাওনি?"[৭]

'অর্ধেক পৃথিবী' কাব্যে আমরা দেখেছি কখনও মার্কস, কখনও ফ্রয়েডের কাছে অভিযোগ ও জিজ্ঞাসার শাস্ত্রকে শানিয়ে তুলেছিলেন—

"হাড়ভাঙা খাটুনির শেষে রাত হলে
ছেলেকে পিট্টি দিয়ে বসে বসে কাঁদে
সেও কি শ্রমিক নয়!
আপনি বলুন, মার্কস, শ্রম কাকে বলে!"[৮]

অথবা

"পুরুষের দেহে এক বাড়তি প্রত্যঙ্গ
দিয়েছে শাশ্বত শক্তি, পৃথিবীর মালিকানা তাকে
ফ্রয়েডবাবুর মতে ওটি নেই বলে নারী হীনম্মন্য থাকে
পায়ের তলায় থেকে ঈর্ষা করে পৌরুষের প্রতি।"[৯]

নারীর সঙ্গে পুরুষের প্রাকৃতিক সম্পর্ককে এইভাবে ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নিরিখে উপলব্ধি করতে গিয়ে জন্ম নিয়েছে তাঁর কথামানবীর কবিতামালা। তাই তিনি দেখেছেন "ভারতবর্ষের মেয়েরা কোনও দিন রাজা হয়নি। প্রজাও হয়নি, হয়েছে রাজার বউ আর প্রজার বউ।"[১০] ব্যতিক্রম শুধু সুলতানা রাজিয়া, যদিও নারীর নেতৃত্ব পুরুষের কাছে অভাবিত বলেই দিল্লির মসনদ থেকে সুলতান রাজিয়াকে ধ্বংস করে বিদ্রোহীরা, কেনোনা পুরুষ চায় না তার আধিপত্য হারাতে—

"পুরুষ স্বয়ং লিঙ্গ এবং জরায়ু
আমরা হিস্ট্রি থেকে একরমই জানতে পেরেছি।"[১১]

নারীকে ভোগ করার জন্য পুরুষের ইচ্ছাটাই প্রথম এবং প্রধান কথা। এ ব্যাপারে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও স্থান নেই।

এতেও প্রতিবাদ জানান তিনি—

"মাটি কি ঘরের বৌ, চাইলেই লাঙ্গল চালাবে?
গণ্ডী কেটে তালা বন্ধ রেখে দেবে অন্তর মহলে"[১২]।

সমাজে নারী পুরুষের এই অসম অবস্থানের প্রতিবাদ মুখর ছবি হয়ে থাকে এ কবিতা।

তিন।

আটের দশকে বিগত দশকের তুলনায় সামাজিক পরিস্থিতি খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি। বরং প্রতিষ্ঠান বিরোধী স্বরগ্রাম অনেকটা নেমে এসেছিল। এই সমাজ প্রতিবেশে নারী পরিচয়ের ভেতরে থেকে নারীর জন্য পৃথক শব্দভাণ্ডার, সম্পূর্ণ ও আত্মস্থ এক 'Universe of Discourse'-এর নির্মাণ ঘটিয়েছিলেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। বিশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে আজকের একুশে শতক পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বিশ্বে নারীর প্রভূত অবস্থানটি যে কোথায় তা পুরোপুরি নির্ণীত হয়নি। তাই মল্লিকা কবিতার মধ্য দিয়ে নারীর বঞ্চনা-শোষণ-অবহেলা উপেক্ষার দিকটি লক্ষ্য করে নারীর প্রভুত মর্যাদা আদায়, অবস্থান

বুঝে নেওয়ার কথা কবিতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অপমাণিত হয়েছেন দ্রোপদী ও সীতা, 'মেয়েদের 'অ আ কখন' কাব্যের 'দ্রৌপদী' কবিতায় সেই ইতিহাস বর্ণিত :

"সেই দিন প্রবল ঝড়ে কৌরব অট্টহাসি
পুরুষের জয়ের নেশা পৃথিবীর ধ্বংস আনে
শাড়ি ধরে টানছিল সে, শত্রুর নারীর মুখে
কালোদাগ আঁকতে হবে, নইলে তো সুখ হবে না।"[১৩]

সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নারীর এই নিগ্রহ শেষ হয়নি। তাই নারীবাদী মল্লিকা সেই শোষণের চিত্রটি আর একবার স্পষ্ট করলেন তাঁর কবিতা নির্মাণে। সাতের দশকের কবি কৃষ্ণা বসু তাঁর 'সমস্ত মেয়ের হয়ে বলতে এসেছি' কবিতায় বিদ্রোহিনী নারী চরিত্রায়ণ করেছেন—

"সেইসব করুণাময়ীর হয়ে আজ
বলতে এসেছি, একা নিরালায় যাকে
পেয়ে পৌরুষ বিস্ফার কর ভয়ঙ্কর;
ধর্ষিতা সে মেয়ে কোন সুবিচার পায়?
সেইসব মেয়েদের কান্না রক্তঘাম
এই কলমে ভরেছি, বলতে এসেছি।"[১৪]

যদিও এই প্রতিবাদ অনেকটাই শান্ত, মেনে নিয়েও যেন বিদ্রোহ। কিন্তু মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতার বিদ্রোহ উচ্চ স্বরগ্রামে বাধা এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের ভাষ্য প্রণিধাণ যোগ্য :

'ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার।...[১৫]

সীতা, দ্রোপদী প্রমুখ পরম্পরাবাহিত নিগৃহীত নারী। তাই বিদ্রোহ চেতনা তাঁর কবিতায় বেশি স্পষ্ট, এদের বিদ্রোহ তাই একালীন ভাষ্যে পরিণত, যার নির্মাণ মল্লিকার কাব্যভাষায় সুস্পষ্ট। 'হাঘরে ও দেবদাসী' কাব্যের 'আম্রপালী' কবিতায় দেখি আম্রপালী বাঁচতে চায়, তবু সমাজ তাকে বাঁচতে দেবেনা—

"ঢিল মারছে গ্রামের মানুষেরা
'নষ্ট মেয়ে, মেরে তাড়াও', বর তুলেছে পঞ্চায়েত
আম্রপালী ঘুরে তাকায়, দেখে
এরা সবাই রাতনাগর, ওই নন্দ, ওই যে শ্যাম সব
এরাই তাকে নামিয়েছিল চোরাবালির ফাঁদে।"[১৬]

এরাই একদিন প্রেমিক ছিল, আজ প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতেই তাই "মেয়ে তাড়াও'। তাই কবি সভ্য জগতের পুরুষতন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন—

"গণিকালয়, মীনাবাজার তৈরি করে কারা?

প্রতি যুগেই ইন্দ্র কেন উর্বশীর অধীশ্বর হন?"[১৭]

কবি এখানে পুরাণ-ইতিহাস-সমকাল এই তিনযুগকে একত্রে এনে নারীর ধারাবাহিক বঞ্চনার দিকটি স্পষ্ট করেছেন। মানবিকতা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত কবি একুশ শতকে 'মানবীকথা' শুনতে চান। তাই লেখেন—

"নারীবাদের একুশ শতক
মেয়েরা চায় নিজস্ব হক।"[১৮]

ঋগ্‌বেদ থেকে শুরু করে একুশ শতক পর্যন্ত নারী অপমানিত—নিগৃহীত। অপলা, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং হাল আমলে শাহবানু, অরুণা শাওনবাগ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদের কথাই বিদ্রোহের ভাষায় কথামানবী কবিতায় শিল্পিত। এমনি করেই 'দ্রৌপদী জন্ম', 'গঙ্গ জন্ম', 'রিজিয়া জন্ম', 'শাহবানু জন্ম'—নানা জন্ম নামাঙ্কিত কবিতায় অত্যাচারিত নারী এবং শেষে তারই প্রতিবাদ কবিতার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"তুমি যে নিয়মে চলো সে নিয়মে অধিকার আমারও থাকুক
তোমরা যে গ্রন্থ লেখো সেই গ্রন্থ আমরাও উলটে দিতে পারি।"[১৯]

নারীকে সেদিনের সমাজ পুরুষের যোগ্য আলোকোজ্জ্বল সঙ্গীনী হতে দেয়নি, নারীর গৃহলক্ষ্মী রূপটি দেখতে চেয়েছিল। বিশেষত নারীকে সমাজ দেখতে চায় এইভাবে—

"তুমি প্রস্তুত থাকবে লোভন মায়াবী
চন্দন স্নানে নিলোম নাভি উষ্ণ।
পুরুষ তোমাকে যেমন ইচ্ছা বানাবে
তাই কি নিয়তি তোমার।"[২০]

এই 'যেমন ইচ্ছা বানানো' থেকে বেরিয়ে আসা নারী মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় অবরোধে নতজানু বিদ্রোহিনী নারী।

চার।

সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সাথে নারী-পুরুষের সহাবস্থান ছিল মল্লিকা সেনগুপ্তের কাঙ্ক্ষিত, নারীর স্বাধিকার অর্জনই নারী স্বাধীনতার একমাত্র উদ্দেশ্য বলে তিনি মনে করতেন না তথাকথিত নারীবাদীদের মতো। এর পাশাপাশি নারীর মানবিক মূল্যবোধটিও ছিল লেখিকার কাছে সমকাঙ্ক্ষিত। সে প্রমাণ পাওয়া যায় 'রাষ্ট্রপতিকে একটি মেয়ের চিঠি' কবিতায়—

"গ্রাম ভারতের পথে পথে আমি
লক্ষ্মীবারের পাঁচালী
ওদেরকে যদি মারবি তা হলে
আমাকেই কেন বাঁচালি!"[২১]

পুরুষতান্ত্রিক সংস্কারে লালিত নারী তাদের নারীসত্ত্বা হারিয়ে নারীর ওপরেই খড়্গহস্ত হয়। মানসিক এমনকি শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হয় তারা। এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত রয়েছে

সংলাপ কবিতা 'অবিরত চণ্ডালিকা'য়—

"কেন যে তুই দাঁড়াস এসে রোজ
নাচের টানে গানের পিছু টানে
.....
বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত
গর্জে ওঠেন দু'জন মেয়ে মারতে চায় ওকে...."[২২]

নারী কর্তৃক নারীর অবমাননার মতো এমন অমানবিক ঘটনার পিছনে অবশ্যই দায়ী থাকে নারীর শৈশব। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সিমোঁ দ্য বোভা'র উক্তি 'কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, বরং নারী হয়ে ওঠে,'[২৩] তিনি লিখেছেন—'আমাদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয় নারী হতে, নারী থাকতে, নারী হয়ে উঠতে।'[২৪]

বোভা'র কথায় পুরুষের চোখে নারী হলো 'দ্বিতীয় সত্তা' বা 'অপর'। মল্লিকার চিন্তাধারায় পুরুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে বৃহত্তর জগতে। আর নারীর জীবন নির্বাহ হয় অন্দরমহলে, যেখানে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কুসংস্কার, অশিক্ষা, অজ্ঞতা। কবি মল্লিকা তাঁর পরিশীলিত দৃষ্টিকোণ থেকে নারীমনের এই অজ্ঞতার দিকগুলি কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছেন। অন্দরমহলের অচলায়তন ভেঙে তিনি নারীকে অশিক্ষার, অজ্ঞতার জগৎ থেকে বর্হিজগতের আলোতে আনতে চেয়েছেন। অর্থাৎ বঙ্গনারী থেকে ব্যক্তিনারীতে'[২৫] উত্তরণই ছিল তাঁর কাম্য।

পাঁচ।

শিব শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে নারীবাদী লেখিকা হিসেবে যাঁরা খুবই পরিচিত, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আশাপূর্ণা দেবী সাবিত্রী রায়, মহাশ্বেতা-দেবী, বাণী বসু, নবনীতা দেবসেন, কবিতা সিংহ, কেতকী কুশারী ডাইসন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, জয়া মিত্র, তসলিমা নাসরিন প্রমুখ। এঁদের প্রত্যেকের কাম্য ছিল 'নারীর স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি।'

পুরাতন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নারীকে সোচ্চার হতে দেখা যায় আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে। সামাজিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি 'আত্মবিশ্বাসী' নারীর ছবি ফুটে উঠেছে সাবিত্রী রায়ের 'সৃজন', 'ত্রিস্রোতা', 'পাকাধানের গান' প্রভৃতি উপন্যাসে। 'প্রতিবাদের শক্তিতে, প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় সুলেখা সান্যাল বা সাবিত্রী রায়ের নায়িকারা নারীত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণ করে নেয় সমাজকে উপেক্ষা করে।'[২৬]

সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রতিবাদ জানিয়েছেন মূলত 'নারী-পুরুষের পরিস্থিতিগত বিবিধ বৈষম্য'-এর বিরুদ্ধে, তাঁর 'হেমন্তের পাখি', 'দহন', 'কাঁচের দেওয়াল' উপন্যাসে লিঙ্গ বৈষম্যের বিশেষ একটি দিককে দেখানো হয়েছে, লেখিকা জয়া মিত্র তাঁর 'হন্যমান', 'বর্ণকমলের চিহ্ন' প্রভৃতি উপন্যাসে 'নারীত্বের প্রত্ন-প্রতিমা ভেঙে মনুষ্যত্বের গন্তব্যে পৌঁছতে' বলেছেন।

এঁরা কেউই নারীবাদী নন। প্রত্যেকেই সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 'নারীর অবস্থানের

পরিবর্তন' দেখাতে চেয়েছেন। এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন নারীর স্বাতন্ত্র্যকে। কবিতা সিংহের 'ভ্রূণা' কবিতায় শোনা যায় নারীর সেই কণ্ঠস্বর—

"আমরা ভ্রূণ না ভ্রূণা
জন্ম দিও না মা!
মা আমার জেনে শুনে কখনো উদরে
ধরোনা এ বৃথা মাংস
.....
হলুদ বসন্ত পাখি ডাকুক নির্ভীক স্বরে হোক গেরস্তের ঘরে ঘরে
গেরস্তের ঘরে ঘরে
খোকা হোক! খোকা হোক! শুধু খোকা হোক!"[২৪]

তসলিমা নাসরিনের 'নারীর অন্তর্দাহ নারীই বুঝেছে বেশি' কবিতায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতি তাঁর অধিক বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে—

"নারী ছাড়া কার সাধ্য নারীকে আমূল ভালবাসে!
এই আমি, আমি নারী, নারীর জন্য খুলে দিচ্ছি আমার অন্তর বাহির"[২৮]

তসলিমার সৃষ্টিকর্মে 'লিঙ্গ বৈষম্য' প্রকট, তিনি 'নারীর যৌনতা'কে 'নারী-পুরুষের সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে' মনে করেছেন, নারীর অধিকার রক্ষার পাশাপাশি পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পরিলক্ষিত হয় তসলিমার রচনায়। আর মল্লিকা সেনগুপ্ত বললেন—'মেয়েদের অবস্থানের বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তোলার কাজটাই নারীবাদের জমি তৈরির কাজ।'[২৯]

তিনি আরও বললেন—'নারীকে নিয়ে যা খুশি লেখা যায়, কিন্তু নারীরা যা খুশি লিখতে শুরু করলেই গেল গেল রব ওঠে।'[৩০] এই মতবাদের প্রতিক্রিয়া সূত্রেই হয়তো মল্লিকা তসলিমার বিদ্রোহ। গদ্যের সুচিত্রা, জয়া, বাণীবসুর মতো মল্লিকাও তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করেছেন নারী পুরুষের সম অধিকারের কথা—

"পৃথিবীটা প্রতিদিন পুরুষের ছিল
তোমাকে দিলাম আজ তার আধখানা"[৩১]

তাই মল্লিকা বিশ্বাস করতেন না পুরুষতান্ত্রিক সমাজে 'প্রতিটি পুরুষই মেয়েদের শত্রু'। তাঁর মতে "আসল শত্রু পিতৃতন্ত্র নামে এক দর্শন ও তার নিজস্ব আচরণ বিধি। পিতৃতন্ত্র বা পুরুষের শাসনব্যবস্থা পুরুষের মাথা থেকে বেরলেও নারী ও পুরুষ উভয়েই তার ভিত্তি পাকা করেছে।"[৩২]

তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাতে নারী পুরুষের সম অধিকার, যেখানে 'মেয়ে মানুষ' নয় 'মানুষ' হিসাবে সম্মানিত হবে নারী, আগেও বলেছি মল্লিকা নারীবাদী ছিলেন না, আবার পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতাও তিনি করেন নি। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, যেখানে পুরুষতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ অপেক্ষা মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, গুরুত্ব দিয়েছেন সমাজ

সচেতনাকে, বিশ্লেষণ করেছেন নারী পুরুষ উভয় মনের জটিল রহস্যকে। সেদিক থেকে মল্লিকার লেখনী আমাদের এক নতুন ভাবনার জন্ম দেয়, যেখানে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক।

তথ্যসূত্র ঃ

১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র', প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ১৪১

২। কৃষ্ণা বসু, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ, ২০০৩, পৃ. ৭২

৩। কবিতা সিংহ, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', তৃতীয় সং, কলকাতা, দে'জ, ২০০৯, পৃ. ১২৪

৪। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র', প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ২০৫

৫। তদেব, পৃ. ২৭

৬। তদেব, পৃ. ৩৮১

৭। তদেব, পৃ. ৪২

৮। তদেব, পৃ. ১১৫

৯। তদেব, পৃ. ১৪০

১০। তদেব, পৃ. ২১৬

১১। তদেব, পৃ. ৩৬২

১২। 'মাটি', আজকাল, শারদ সংখ্যা, ১৪১৬, পৃ. ৩৪৩

১৩। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র', প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ১৯৩

১৪। কৃষ্ণা বসু, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ, ২০০৩, পৃ. ১২৮

১৫। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র', প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ, ২০১২, পৃ. ২০৬

১৬। তদেব, পৃ. ৯০

১৭। তদেব, পৃ. ৯০

১৮। তদেব, পৃ. ২০১

১৯। তদেব, পৃ. ২০৯

২০। তদেব পৃ. ২৭৪

২১। তদেব পৃ. ৩২০

২২। তদেব পৃ. ৩৯৪

২৩। হুমায়ুন আজাদ, সিমোন দ্য বোভোয়ার "দ্বিতীয় লিঙ্গ', দ্বিতীয় সং, 'আগামী', ২০০৮, পৃ. ১৮৩

২৪। তদেব, পৃ. ১৭

২৫। তপোধীর ভট্টাচার্য, 'নারীচেতনা ঃ মননে ও সাহিত্যে', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপরি, ২০০৭, পৃ. ৪২

২৬। সুদক্ষিণা ঘোষ, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্রলতা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ, ২০০৮, পৃ. ১০১

২৭। তসলিমা নাসরিন, 'নির্বাসিত নারীর কবিতা', তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, 'আনন্দ', ২০০৬, পৃ. ৪৮

২৮। সুতপা ভট্টাচার্য, ' মেয়েলি পাঠ', দ্বিতীয় সং, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০০, পৃ. ৬২

২৯। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্র', প্রথম সং, কলকাতা, বিকাশগ্রন্থ বমিলা ২০০২, পৃ. ৬৭

৩০। তদেব, পৃ. ১৩৭

৩১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রী লিঙ্গ নির্মাণ', তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ২০০৮, পৃ. ১৯

৩২। তদেব, পৃ. ২৭

আকর গ্রন্থ ঃ

১। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'কবিতা সমগ্র', প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ, ২০১২

২। কৃষ্ণা বসু, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ, ২০০৩

৩। কবিতা সিংহ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', তৃতীয় সং, কলকাতা, দে'জ, ২০০৯

৪। তসলিমা নাসরিন, 'নির্বাসিত নারীর কবিতা', তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ২০০৬

৫। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'পুরুষ নয় পুরুষতন্ত্রদ্দণ', প্রথম সং, কলকাতা, বিকাশ গ্রন্থ ভবন, ২০০২

৬। মল্লিকা সেনগুপ্ত, 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ,' তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, আনন্দ, ২০০৮

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মনোরঞ্জন সরদার

সময়টা তখন বড্ড বেশি সচল ছিল। এখনো হয়তো আছে, তবে আমাদের মত স্বল্পবিদ্যার অসাড় মানুষেরা এই সচল মানুষগুলোর স্পর্শসুখ পায় না। নিশ্চয় এই ছবিঘরগুলোতে প্রাণের উষ্ণতার আস্বাদ মেলে এখনো। শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সেই জীবন সংরাগে পরিপূর্ণ সৃষ্টি-ঘরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তখনো খুব নাম-ডাক হয়নি তাঁর। ১৯৬২ সালে টালাপার্কে বসোবাস করার সময় (বয়স তখন ৩৮ বছর) অন্তরঙ্গ সঙ্গ পেয়েছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শিবনারায়ণ রায়, গৌরকিশোর ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষের মত মানুষদের। এত বিচিত্রমুখী ও সুদূরপ্রসারী মানুষদের সান্নিধ্য নিজেকে খানিকটা নির্মাণ করে দেয় বা পরস্পরের নির্মাণ করে তোলার উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সেই সচল সময়ের অবিচল কর্তব্যপরায়ণ, খেয়ালী ও খেলাপ্রিয় মানুষ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৪ এর অক্টোবর মাসে। খুব একাডেমিক ছিলেন এমন নয়। বরং দু'একটা বদ্ অভ্যাস ছিল তাঁর। সিগারেটের ধোঁয়া ছিল প্রিয় খাবার, আর দস্তুর তাসের নেশা। ছেলে কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী লিখেছেন— 'সিগারেট ছাড়া বাবার আর একটা নেশা ছিল তা হল তাসের আসর। আমাদের বাড়িতে তো বটেই, বৈকালিকী বলে একটা ক্লাবেও সন্ধ্যাবেলা বিরাট তাসের আসর বসতো। আনন্দবাজার পত্রিকার ময়দানের ক্লাবেও বাবা যে বাৎসরিক তাস প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিততেন তা বলাই বাহুল্য। এই তাস খেলাটা ছিল ব্রিজের, তবে কনট্রাক্ট নয়, অকশন।....তবে লেখার সময় পাওয়া যাচ্ছেনা বলে বছর পনেরো পরে তাসের নেশাকেও বর্জন করেন তিনি পরবর্তীকালে।'[১] আড্ডা দিতে পছন্দ করতেন। প্রায়ই বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়তেন। নির্ভেজাল আনন্দ পাওয়ার ও দেওয়ার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল এই মানুষটির। অথচ ছোট বড় সকলের জন্য অজস্র বই লিখেছেন তিনি। মনের মধ্যে একজন সফল অমলকান্তি বাস না করলে, রোদ্দুরে অনাবিল স্নান না করলে লেখার মধ্যে এমন জোর, এমন সহজ সত্যনিষ্ঠা নিয়ে আসা সম্ভব হত না। আবার সংসারে তাঁর মত এমন দায়িত্ববান মানুষও খুব কম রয়েছে। ছেলের কথায়—'বাবার হাত ধরে আমি বাজার করতে শিখি। কুমড়ো কিনতে গেলে দেখে নিবি যে তারা রাঙা বা গাঢ় হলুদ গায়ের পাশে সবুজ রঙের রেখা পাড়ের মত আছে কিনা। আর বটিতে কাটতে গেলে ভস্ করে শব্দের বদলে চড়চড় করে শব্দ হচ্ছে কিনা। তবেই বুঝবি কুমড়ো মিষ্টি হবে। আবার মাছ কেনারও তরিকা আছে। যে মাছের আঁশে আঙুল বোলালে খস্‌খসে লাগবে না, আঙুল পিছলে যাবে, সেই মাছ বেশিক্ষণ আগে জল থেকে তোলা হয়নি।.....তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের পরিপাটি বাজার করা দেখে আমার ঠাকুমা বলতেন

খোকা বাজার থেইক্যা একেবারে রাইন্ধ্যা লইয়া আইছে।'[২] কথাগুলো উল্লেখ করার কারণ, পারিবারিক কর্তব্যে অত্যন্ত সচল ও একনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন তিনি। পুত্রকন্যাদের যথাসময়ে সাধ্যমত পরিচর্যা করেছেন। বড় মেয়ে সোনালী চক্রবর্তী লিখেছেন —'মা কাজ করতেন মনিং স্কুলে। তাই আমাকে স্কুলের জন্য তৈরি করতেন বাবা। আমাকে খাওয়ানো ছিল খুব কষ্টকর একটা প্রক্রিয়া। তাই বাবা আশ্রয় নিতেন গল্পের। এইভাবে অতিশৈশবে বাবার কাছে শুনেছিলাম চার্লি আর চকোলেট কারখানা বা আজব দেশের অ্যালিস বা গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্তের গল্প। গল্পগুলো বাবা এত সুন্দর করে বলতেন যে মনে হত যেন ছবি দেখছি। আমার শিশুমনে এই গল্প বলিয়ে বাবা গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল।'[৩] আর ছোটমেয়ে শিউলি সরকারের স্মৃতিতে তিনি—'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখ, দীর্ঘকায় এক যুবক—ডানহাতের আঙুলে জ্বলন্ত সিগারেট আর বাঁ হাতে বাজারের দুটি থলি। ছোট্ট মেয়ে কচি হাতে মুঠি পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে সে হন্‌হন্ করে বাজারে চলেছে—রাত্রে ঘুম আসার ঠিক আগে এই দৃশ্যটা ইদানীং বড় স্পষ্ট দেখতে পাই। পিছনে মায়ের গলা ঃ বেশি দেরি করবে না কিন্তু; রোদ্দুর লাগলে ওর অসুখ করবে। অথচ বাজার সেরে মাকে লুকিয়ে সত্যনারায়ন মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ঠাণ্ডা দই আর গরম জিলিপির লোভে পাঁচ বছরের ছোট্ট আমি বাবার সঙ্গে রবিবারের বাজার তো কিছুতেই মিস্ করবো না। হাঁটতে গেলে পায়ে ব্যথা হলেই বাবার কোলে—যাকে আমি বলতাম কোকো, আর যাতে উঠলেই পাহাড় চড়ার অনুভূতি হত আমার।'[৪] তাঁর ছেলেমেয়েদের এই কথাগুলো থেকে মানুষটাকে অনেকখানি চেনা যায়। তিনি সংসারের মন বুঝতেন, অনুভব করতেন শিশুমনের চাওয়া পাওয়ার আনন্দ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অত্যন্ত সময় সচেতন ও সমাজ সচেতন মানুষ। তাঁর জন্য অবশ্য পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং যোগাযোগ রাখতে হয়েছে সেই সময়ের সৃষ্টিশীল ও দায়িত্ববান মানুষদের সঙ্গে। তাঁর সেই লড়াইয়ের অনেকখানি উপলব্ধি করা যায় তাঁর আত্মজীবনী 'নীরবিন্দু'[৫] থেকে। তবে তিনি ঠিক সময়ে আনন্দবাজারের মত সংঘ সংগঠনের সঙ্গ পেয়েছেন। বঙ্গদেশে আনন্দগোষ্ঠী লেখক ও কবিদের পরিচিতি দেওয়ার গুরুভার অনেকটাই বহন করে চলেছে। তাদের শুভদৃষ্টি পেলে বস্ত্র-বাসস্থানের সঙ্গে সম্মান ও সুস্থিতি পাওয়া যায়। অবশ্য দায়িত্ব পালন করার সাধনাও কম থাকে না। নীরেন্দ্রনাথ সেবিষয়ে সর্বদা অতন্দ্র ও সজাগ ছিলেন। এককথায় সংসারে ও কর্মক্ষেত্রে সফল ছিলেন তিনি। সেই কারণে বাঙলায় আজ তিনি এক সফল পরিবারের স্নিগ্ধ হাসির উত্তাপ ছড়িয়ে চলেছেন। ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজগৎ ছেড়ে এখনও শিক্ষাক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছেন। দুই মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন। দুই জামাই এই সময়ের মেধাবী ও নামী মানুষ। নাতি-নাতনিরা পূর্বসূরীদের সম্মান বৃদ্ধি করে চলেছে। এমন সফলতা তো আর এমনি আসে না। গভীর মনন ও একনিষ্ঠ জীবনবোধের সমন্বয়ই তাঁকে এই বটবৃক্ষের বিশালতা দিয়েছে। তাঁর সেই শিকড়ের রস বহমান তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে।

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও একজন সফল সংগঠক। এ বিষয়ে চমৎকার লিখেছেন শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী কিংবা পিনাকী ঠাকুরের মত আলোচকগণ। তাঁর সম্পাদনা সত্তার পরিচয় গল্পকথার মত ছড়িয়ে রয়েছে। ভালো-মন্দ—দুই-ই। 'আনন্দমেলা'র সম্পাদক ছিলেন তিনি। এবিষয়ে শ্যামলকান্তি দাশ লিখেছেন—'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যতদিন 'আনন্দমেলা'র সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁকে দেখে অবাক হয়েছি। পত্রিকাই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।....আনন্দমেলা পত্রিকাটিকে তিনি সন্তানের মত ভালোবাসতেন। পরিশ্রম তো করতেনই, পরিশ্রমের সঙ্গে ছিল দরদ আর মমতা। প্রতিটি লেখা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন, ভুল ত্রুটি সংশোধন করতেন, কারও লেখার কোনো তথ্য নিয়ে সংশয় দেখা দিলে লেখককে টেলিফোন করে অথবা চিঠি লিখে সংশয়ের নিরসন করতেন। লেখা সংগ্রহের জন্য শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে দৌড়তেন, কোনো ক্লান্তি ছিল না। যতবড় লেখকই হোন, লেখায় কোনো বানান ভুল থাকবে না— তাঁর সযত্ন সম্পাদনা ছিল দেখবার মত। তিনি মনে করতেন, এখনো করেন ছোটদের কাগজ হবে পরিচ্ছন্ন নির্ভুল।'[৬] এই দায়িত্ববোধ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁর অন্য সহকর্মীদের মধ্যে। শুধু সম্পাদকের কর্তব্যই নয়, এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত মানুষজনকে অপত্যও স্নেহ করতেন। এঁদেরই একজন কবি রতনতনু ঘাটীর লেখা থেকে নীরেন্দ্রনাথের সহৃদয় সংবেদনশীল সত্তার পরিচয় মেলে। মেদিনীপুর থেকে আসা একটি তরুণকে সাধ্যমত সহযোগিতায়, সহমর্মিতায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। অনেকগুলো প্রীতিময় ঘটনার উল্লেখ করেছেন রতনবাবু। তারই একটি—

'পুজোর ঠিক আগে অফিসে একদিন নীরেনদা আমাকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। দেখলাম, পুজো সংখ্যার বিল করছেন তিনি। আমার সামনে পুজোর শব্দ সন্ধানের পাতাটা খুলে জিজ্ঞেস করলেন। এটা কার লেখা? আমি জানতামই। বললাম আপনার ছদ্মনাম রত্নাকর। ওই শব্দসন্ধান আপনি লিখেছেন। উনি নকল রাগ দেখিয়ে বললেন, না। তোমাকে দিয়ে হবে না। মাথায় যদি একটু বুদ্ধি থাকে। এটা তোমারই ছদ্মনাম। তুমিই এই শব্দসন্ধানটা করেছ। আমি বললাম, না নীরেনদা, ওটা আপনি করেছেন। নীরেনদা আমার দিকে মায়াময় চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আরে বাবা, তুমি তো এবারের বোনাস পাবে না। তাই এই শব্দসন্ধানের টাকাটা তুমিই নেবে। এটা তোমার বোনাস। এ-টাকায় তোমার স্ত্রী আর ছেলের জন্য পুজোর জামা কাপড় কিনো। সেদিন আমি নীরেনদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারিনি। চোখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। আসলে তখন যে আমার দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল। পাঠক বিশ্বাস করুণ, আমার দুচোখ এখন এই লেখাটি লেখার সময়ও.....।'[৭] ভালোবাসা দিতে পারতেন তিনি, আদায় করে নিতে পারতেন শ্রদ্ধা। তাই এমন সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা সম্পাদনা করা সম্ভব হয়েছে তাঁর পক্ষে। বড় মাপের পত্রিকা সম্পাদনা করতে হলে যে গুণগুলো দরকার—তার প্রায় সবই ছিল তাঁর সহজাত। আবার আশ্চর্য রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পিনাকী ঠাকুরের একটি লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন —'আমাদের স্কুলের শেষ দিকে নীরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল আনন্দমেলা। আনন্দের হিল্লোড়

ছড়িয়ে পড়লো শিশু কিশোর পাঠকদের মধ্যে। বাংলায় এমন কিশোর পত্রিকা আর হয়নি। মনে আছে একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু' সিরিজের একটা উপন্যাস ধারাবাহিক বের হচ্ছিল আনন্দমেলায়। সঙ্গে ইলাসস্ট্রেশন। শিল্পী ভুলে গেছেন কাকাবাবুর গোঁফ আঁকতে। ব্যস, পাঠক-পাঠিকার চিঠির বন্যা। সম্পাদক পরের সংখ্যায় শুধু একটা গোঁফের ছবি ছেপে দিলেন।' কাকাবাবুর হারানো গোঁফ[৩৮] এমনই ছিল তাঁর রসবোধ। 'আনন্দমেলা'র সম্পাদনা কাজের পাশাপাশি পঁচিশ বছর তিনি ছিলেন 'দেশ' পত্রিকার কবিতা সম্পাদক। সে সময়কার নতুন কবিদের কবিতা 'দেশ' এর পাতায় তিনি গুরুত্ব দিয়ে ছাপতেন।[৯]

এখনো তিনি রয়েছেন আমাদের মধ্যে। তবু অনেকগুলো প্রজন্ম তাঁর সৃষ্টিতে মগ্ন ও তৃপ্ত। তাঁর কবিতা ও ছড়া—গান হয়ে, সুর হয়ে প্রাণের মধ্যে অনুরণন তোলে। কবি নীরেন্দ্রনাথ সচেতনে, খোলা চোখে সমাজ ও বিচিত্র পেশায় কর্মরত মানুষদের দেখেছেন। সব অমলকান্তিরা যে রোদ্দুর হতে পারে না বা আশে-পাশের অনেক রাজাই যে উলঙ্গ—তা সংবেদনশীল মানুষ মাত্রেই মন খোলা রাখলে দেখতে পান। সে নতুন কথা নয়। নতুন হল বলবার এমন দৃঢ়ভঙ্গি, জানানোর এমন অকপটতা, বোঝানোর এমন সচল স্বচ্ছতা। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি লিখেছিলেন—'কবিতা কল্পলতায় আমি বিশ্বাস করি না। যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, অর্থাৎ চোখ-কান-স্পর্শ কি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ তৈরি হয়নি তাকে নিয়ে আমি লিখতে পারি না। আমি এমন কোনো মানুষের মুখ আঁকবার চেষ্টা করিনি, যা আমার মাথা থেকে বেরিয়েছে। আমি শুধু আমার সামনে যে লোকটাকে দেখেছি, তার মুখটাকে ধরবার চেষ্টা করেছি। সে ছাড়া আর কেউ আমাকে নাড়া দিতে পারে না।'[১০] নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আবেগের চেয়ে স্পষ্ট কবির দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিটি। তাঁর কাব্যগুলোর গড়পড়তা স্রোত এই ঋজুতা। কোথাও কোথাও গল্পবলার আশ্চর্য রীতিটিও লক্ষণীয়। সেই গল্পও সাধারণ মানুষের অভিপ্রায়ের গল্প। রাস্তাঘাটে ট্রেনে বাসে হাটে বাজারের মানুষগুলো যে কথাগুলো বলে বা তাদের যে অভিপ্রায় সেই কথার পিঠে প্রায় সেরকম কথার ছোঁয়ায় তৈরি হয়ে যায় নতুন কথা—সবসময়ের অনুভূতি। তাই 'গোবিন্দের বুড়ি ঠাক্‌মা' বা 'ধিনিকেষ্ট' আমাদের দাদুদের কাল থেকে এখনও সচল। ধিনিকেষ্ট বলেছে—

'আমি একজন ধিনিকেষ্ট
কলম পিষতে বড় বাজারে যাই
পিষি
সাবান কিংবা তরল আলতার শিশি
কিনে বাড়ি ফিরি, গিন্নি
কলঘরে ঢুকলে বাচ্ছা সামলাই
আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা না করা সমান
ভোটারদের আল্‌জিভ না দেখিয়ে যারা বক্তৃতা দিতে পারে না,
আপনি বরং তাঁদের কাছে যান।'

গদ্যের মত এই কবিতার শক্তি আছে— সে শক্তি জীবনবোধের শক্তি। মানুষের সঙ্গে খুব মিশলে খানিকটা অর্জন করা যায়, তবে তা সম্পূর্ণ করে না সৃষ্টিকে। মানুষের অভিব্যক্তি হাওয়ায় ভাসে। সেগুলি সযত্নে ধারণ করেন লেখক। তিনি লিখেছেন—'আমাদের নিজেদের প্রয়োজনে আমরা লিখি। জীবনকে জানার জন্যে। আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের অনুভূতিকে সম্পূর্ণ করার জন্যে। জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা অর্ধেক সৃষ্টির মাধ্যমে চিন্তার ক্ষেত্রে হলেও—বাকি অর্ধেক আমাদের অর্জন করতে হয়। জীবনের ভাণ্ডারকে আমরা এই পথেই সম্পূর্ণ করে তুলি। না লিখেই যদি সেই সম্পূর্ণতাকে অর্জন করা যেত, আমরা লিখতুম না।'[১১] অতএব স্পষ্ট যে সমাজজীবন এবং আপন সত্তাকে নিত্য অনুভব করতে হয়। তাই যতই বলুন—

'আমি বৃক্ষের স্বভাবে
মগ্ন হতে চাই; আমি জানি,
দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বড় কোনো শান্তি নেই।
কেউ কোথাও না গিয়ে যদি বৃক্ষের স্বভাবে
মগ্ন হয়, অনায়াসে পাবে
সেই শান্তি।'

কিন্তু কবি তো থেকে থাকতে পারেন না। তাঁকে চলতে হয়। তাঁর চলার শেষ নেই। তিনি দেখতে দেখতে চলেন; আর চলতে চলতে নতুন কথা বলেন—

দেখি, বল্লমের ধাতু
রোদ্দুরের প্রেম পায়, বন্দুকের কুদার উপরে
কেটে বসে কঠিন আঙুল।
যে কোনো মুহূর্তে ঘোর মারামারি হতে পারে, তবু
অস্ত্রগুলি উল্টানো রয়েছে আপাতত।
পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে সকলে এখন
সমান রচনা করে। আমি দেখি
অজুত নিজুত অন্ধ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছে রাস্তার উপরে
আমি চক্ষুষ্মান হেঁটে যাই।'

এই চল্‌বার স্পষ্টতা ও অকপট বলবার সামর্থ্য তাঁর অধিকাংশ কবিতায় লক্ষণীয়। হয়তো এই কারণেই তাঁর পক্ষেই বলা সম্ভব হয়েছিল কবিতা আর লেখা হল কই! পরিবার পরিজন ও সামাজিক দায়িত্ব অনেকখানি সময় নিয়ে নিয়েছে—কবিতাকে আরো সময় আমার দেওয়া উচিত ছিল। দিতে পারিনি। যে নিষ্ঠা, যে একাগ্রতা, যে পরিশ্রম, যে যত্ন দেওয়া দরকার ছিল, তা দিয়েছি কি? জীবনের অসংখ্য রকমের দাবি, সে দাবিগুলোকেও মেটাতে হয়। শুধু দাবি কেন, আমার আসক্তিটাও বড়ো বেশি, ফলে এত ব্যাপারে আসক্ত হয়ে পড়তাম যে কী বলব।.....আমি তো কবিতাকে কোনো কল্পনালতা ভাবি না। আমি যে

মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই, কবিতা তার একটা মাধ্যম, কবিতার মারফত আমার কথাগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছি। তাই কবিতার জন্য যা আমার করা উচিত ছিল, তা আমি করতে পারিনি। ভেবে কষ্ট পাই।'[১২] এই বেদনা বোধ হয় সব বড় কবিদের। তিনি তাঁদেরই একজন। তিনি মানুষের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গ হয়ে তাদের সুগভীর আর্তিকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমরা ভুলিনি একদিন এই তিনিই কী প্রচণ্ড চাবুক মারতে মারতে চেয়েছিলেন 'চতুর্থ সন্তান', 'উলঙ্গ রাজা', 'শকুন', 'চৌরাস্তায় কিংবা উলটো ঠিকানা'য় কবিতাগুলোর সর্বাঙ্গে। ভুলিনি তাঁর 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' কবিতাটির পাগলীর আর্তধিক্কার;

'নিস্তার নেই গো বাবুমশাইরা
এই তোমাদের বাঘ সিঙ্গিতে ভরা জঙ্গলের মধ্যে
পাগলদেরও নিস্তার নেই।'

শুনতে শুনতে ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিলাম আমরা। আর 'হ্যালো দমদম' এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে এই আজও আমরা সেদিনের মতই একই রকম আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ হওয়ার উপলক্ষ খুঁজে ফিরি। আজও তিনি সমাজভাবনা থেকে সরে যাননি এতটুকু। কবিতার জন্য এখনো তাঁকে উপজীব্য করে তুলতে হয় মানুষের অসহায়তা ও বিপর্যস্ত জীবন যাপনের খণ্ড খণ্ড যন্ত্রণার এপিসোড। আমাদের চমক দেয় 'অন্য গোপাল' এর মত মর্মান্তিক কবিতা। আত্মজন ছাড়া নিঃসঙ্গ মৃত্যুর নিরূপায় প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে 'ফ্ল্যাটের ভিতর বুড়ি' কবিতাটিতে। আর নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির ধারণা থেকে উৎপন্ন হতে দেখি যে 'সাকুল্যে তিনজন' কবিতাটির অসাধারণ নির্মাণ, তার মধ্যে থেকে যায় এখনকার ছাচে ঢালা জীবন বিন্যাসের হিসেব কষা ইঙ্গিত।'[১৩] সুতরাং দায়িত্বের চাপ যতই তাঁকে বিচলিত করুন না কেন, সংসারের যে ঘটনা তাকে বিচলিত করেছে তার মর্মে প্রবেশ করে মর্মকথাকে পাঠকের মনের গহনে পৌঁছে দিয়েছেন।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থগুলির এক একটি করে আলোচনা হচ্ছে এবং আগামী দিনে সেই কাজ করা হবে। সেই আলোচনায় সহায়ক হয়ে উঠ্‌ছে 'কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা' কিংবা 'কবিতার কী ও কেন'—এর মত গ্রন্থগুলি। আবার কবিতার শৈলি নিয়ে তাঁর লেখা চমৎকার এই কবিতার ক্লাস। তবে আরো একটি দিকে তাঁর সৃষ্টি মাধুর্য ঝরে পড়েছে স্নিগ্ধ ধারায়। ছোটদের জন্য সাহিত্য। একটু বেশি বয়সে লিখেছিলেন ছড়ার বইগুলো। ৫৫ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ছড়ার বই-'সাদা বাঘ'। পরে লিখেছেন—'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি,' 'বিবির ছড়া', 'ডাইনোসর', ও 'কলকাতা', 'ছেলেবেলা', 'হরে কর কমবা', 'পাঁচ বছরের আমি', 'নদীনালা গাছ পালার মত ছড়াকাব্য'। ছড়াগুলো পড়লে অনুভব করা যায় শিশুমনকে গভীরে স্পর্শ করার সাধনা ছিল তার। শিশুমনকে রপ্ত করেছিলেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন 'খোকনের খাতা', 'দাশুর কথা', 'মায়ের কাঁথা' বা 'বারো পুতুলের ছড়া'র মত ছড়াগ্রন্থ।

একটা ছোট প্রবন্ধের পরিসরে শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে নিয়ে প্রায় কিছুই বলা সম্ভব

নয়। তাঁকে জানবার জন্য তাঁর আত্মজীবনী 'নীরবিন্দু' পড়া অত্যন্ত জরুরী। আবার আকাদেমি থেকে প্রকাশিত গদ্যসমগ্র পড়লে মনে হয় গদ্যই বুঝি তাঁর লেখবার প্রধান বাহন। অথচ অন্তত ৩০টি কাব্যগ্রন্থ, একটি উপন্যাস, চারটি ভ্রমণ কাহিনি, ১৮টি রহস্যকাহিনী, ছোটদের উপন্যাস এবং প্রায় ২০টি ছোটদের ছড়া ও কবিতার বই লিখেছেন। এখনো একটু সুস্থ থাকলেই কাউকে ফেরাতে চান না। তিনি। লিখে দেন এক টুকরো। এখনো অবসরে মগ্ন হন শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ পাঠকের গানের সুরে।

তথ্যপঞ্জি :

১। বাবার কথা—কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, কোরক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃ-২১৪

২। তদেব, পৃ. ২১৫

৩। আমার বাবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—সোনালী চক্রবর্তী, নতুন কবি সম্মেলন, জুলাই ২০১৭, পৃ. ২৬

৪। বাবাকে নিয়ে—শিউলি সরকার, নতুন কবি সম্মেলন/সম্পাদক-শ্যামলকান্তি দাশ, জুলাই ২০১৭, পৃ.২৭

৫। নীরবিন্দু১, দে'জ পাবলিশার্স, জানুয়ারি ১৯৯৩

৬। সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ—শ্যামলকান্তি দাশ, কোরক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা। বইমেলা ১৪১৮, পৃ. ৬০

৭। নীরেনদার জন্যে এক আশ্চর্য কোলাজ—রতনতনু ঘাটী, কোরক, বইমেলা, ১৪১৮, পৃ. ২৭০

৮। সহজিয়া সাধক নীরেন্দ্রনাথ—পিনাকী ঠাকুর, নতুন কবিসম্মেলন, জুলাই ২০১৭, পৃ. ৩৮

৯। তদেব

১০। বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন, ২০১৬

১১। নীরেন্দ্রনাথের পাগলাঘন্টি ঃ সত্তা ও সমূহের বোঝাপড়া—প্রসূন ঘোষ, কোরক, বইমেলা সংখ্যা ১৪১৮, পৃ. ৭৬

১২। ২০১১ কবি সম্মেলন শারদ সংখ্যায় দেওয়া আলাপচারিতা, নীরেন্দ্রনাথকে পাঠ করা আমার কাছে এক পাঠক্রম-সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, কোরক, বইমেলা ১৪১৮ পৃ. ১৯

১৩। নীরেন্দ্রনাথকে পাঠ করা আমার কাছে এক পাঠক্রম—সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, কোরক, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সংখ্যা, বইমেলা ১৪১৮, পৃ. ২০

ছোটো গল্প

ভেজা তুলোর নৌকা

সোহারাব হোসেন

এক

'অঙ্ক কষে চলাটা জীবন নয়/গাছের শাখে আলোর জাফরি খেলা/জীবন এখানে উজান স্রোতে বয়'—ছেলে সৌরিকের হাত ছেড়ে, পঁয়তাল্লিশের শৌভিক, হঠাৎ বউ সুচরিতার আঁচলে টান দেয়। দিয়ে সদ্য মাথায় আসা কবিতার পঙক্তিগুলো দ্বিতীয়বার আওড়ায়। তারপর সেই উচ্ছ্বাসে বলে—'শান্তিনিকেতনে এলে আমার মন ভালো হয়ে যায় সুচরিতা। টাটকা বাতাস। গাছপালার দুলুনি। আত্মশুদ্ধি ঘটে আমার!'

—আমারও!—সুচরিতা নিজের আঁচল সামলে, সামনের বটগাছটার দিকে তাকিয়ে, সৌভিকের কবিতায় ফিরে গিয়ে জানতে চায়—জীবন এখানে তো সোজা স্রোতেই বয়। এটাই তো জীবন। তুমি উজান বলছ কেন?

—বুঝতে পারছ না?—শৌভিক রহস্যময় হাসে।

—না।

—শোনো তা'লে। আমাদের শহুরে জীবনটা তো অঙ্ক কষে-কষে এগোবার জীবন। এন-জি-ওতে তোমার ঠাসা-রুটিনের চাকরি, প্রকাশকের দপ্তরে আমার দমবন্ধ করা কাজ, সৌরিকের যান্ত্রিক বড়ো হওয়া, সব কিছুই তো অঙ্ক মেনে চলে। কি চলে না?

—চলে তো!—সুচরিতা ঘাড় নাড়ে।

—সেই প্রেক্ষিতে, হ্যাঁ সুচরিতা, বছরের এই দুটো-কী-তিনটে দিন আমাদের শুদ্ধ জীবন মুক্ত জীবন। এ তো সত্যিই উজান স্রোত সুচরিতা!

—এবার বুঝেছি!—সুচরিতার হঠাৎই যেন কান্না পেয়ে যায়—এ-সব ভেবে তুমি খুব কষ্ট পাও বুঝি?

—মিথ্যে বলব না!—শৌভিক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—কষ্ট তো পাই-ই! অন্যরকম জীবন তো হওয়া উচিত ছিল আমাদের। রেজাল্ট তো আমাদের ভালোই ছিল! অথচ....!

—শৌভিক!—সুচরিতা শাসনের গলায় শৌভিককে থামিয়ে দেয়—আমি তো এ নিয়ে কখনও অনুযোগ-অভিযোগ করিনি। কী করেছি?

—করোনি বলেই তো কষ্ট বেশি পাই!

—অঙ্ক কষে—কষে?—হাওয়া পালটে দেবার লক্ষ্যে সুচরিতা হালকা রসিকতা করে—তালে উজান স্রোতের কুলকুল সুখ অনুভব করবে কখন? কী করে? ছাড়ো ওসব।

সুচরিতার বলার ভঙ্গিতে না-হোক সৌরিকের হাত-টানাটানিতেই বোধ হয় অঙ্ককষা জীবন থেকে উজান-প্রবাহের রোদ্দুরে ফিরতে হল শৌভিককে। ছোট্টো সৌরিক আবদার

ধরে—'মা-র সঙ্গে পরে কথা বোলো বাবা। এখন আমার সঙ্গে বলো।' অতঃপর আত্মজকে আশ্রয় চেনানোর সরণিতে ফিরতে হয় শৌভিককে। পায়ের তলায় লাল মোরাম-বিছানো পথ, শালবীথির রাস্তা ছেড়ে সামান্য বাঁ-দিকে বেঁকেই ডান-হাত উঁচিয়ে বলল—'ওই জায়গাটার নাম কী জানো?'

—কী বাবা?—ক্লাস সিক্সের সৌরিক চঞ্চল পায়ে অন্য কোনোখানে যাবার তাগিদে জানতে চাইল!

—আমি বলে দিলে তো হয়েই গেল। তুমি আন্দাজ করো।

—কী করে করব?

—আমি একটু সুলুক ধরিয়ে দিচ্ছি—শৌভিক ছেলেকে বোঝাতে থাকে—ধরো ওই পথটার দু-পাশ শালগাছের সারি আছে বলে ওর নাম শালবীথি। এবার তুমি এ -জায়গাটা দেখে বলার চেষ্টা করো!

—করব?

—করো।

—ওই জায়গাটার নাম বটতলা!—তিন থাকে সিমেন্ট-বাঁধানো ঝাঁকড়ালো বটগাছটার দিকে কৌতূহলী তাকিয়ে সৌরিক মিচ্ মিচ্ করে হেসে ফেলল—ঠিক বলেছি বাবা?

—উঁহু। ঠিক বলোনি।

—তবে জায়গাটার ঠিক নাম কী?

—তিন পাহাড়!

—তিন পাহাড়?—সৌরিক কপাল কুঁচকে সন্দেহ জানায়—একটাও পাহাড় নেই তবু তিন পাহাড়?

—হ্যাঁ।

কী করে হয়?—কিছুতেই মেলাতে না-পেরে সৌরিক বলে—এই নামটা মেলেনি বাবা!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ তো! —সৌরিক মাথা নাড়ে—এটা ভুল নাম বাবা!

—না-ভুল না! তবে শোনো বৃত্তান্তটা.....।

ছেলের মাথায় হাত রেখে শৌভিক ইতিহাস বর্ণনায় ডুবে যায়। কথকের মতো বলতে থাকে—'মন দিয়ে শুনে রাখো। ওই জায়গাটার তিন পাহাড় নাম দিয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোট্টো রবীন্দ্রনাথকে একবার এখানে বেড়াতে এনেছিলেন মহর্ষি। শিশু-কবি সেদিনে তিনটি পাথর সাজিয়ে ওখানে খেলা করেছিলেন। সেই খেলাকে অমর করার জন্য ওই গাছতলার নাম দেওয়া হল তিন পাহাড়, বুঝেছ?'

হ্যাঁ বলে মাথা নেড়ে সৌরিক ফের বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র দৌড় লাগাল! সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুচরিতা মন্তব্য করল—উপযুক্ত বাবার উপযুক্ত পুত্র।

—কে?—শৌভিক সুচরিতার সামনে দাঁড়ায়।

—রবীন্দ্রনাথ!—সুচরিতা খিলখিল করে হেসে ওঠে—তবে তুমি আর তোমার ছেলেও

হতে পারে!

—মানে?

—তিনটে পাথর থেকে তিন পাহাড় জন্মানোর কল্পনা-পথে ঠিক ঠিক ভাবেই মহর্ষি ছেলেকে ঠেলে দিয়েছিলেন। মহর্ষি ঠিকই বুঝেছিলেন উস্‌কে দিলেও ছেলে বিশ্বজয় করবে। তাই না?

—হ্যাঁ তো!—শৌভিক সুচরিতাকে সমর্থন করে—কল্পনা ছিলও বটে কবির। দেখো যেটাকে বেণুবন নাম দিয়েছেন সেখানে মাত্র দু-চারটে বাঁশগাছ ছাড়া কিচ্ছুটি নেই। অথচ কল্পনা আর বলবার জোরে সব কিছু বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়ে গেছে। সাংঘাতিক মানুষ একজন....!

—সাংঘাতিক?—সুচরিতা থামিয়ে দেয় শৌভিককে—সাংঘাতিক বলছ কেন?

—সবদিক বিচার করেই!

—মানে?

—আচ্ছা সবদিকের কথা ছাড়ো। একটা দিকের কথাই ধরো! সারা জীবন কী লড়াইটা-না করেছেন! এই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা কি সোজা কথা! কত বিপর্যয়, কত দুঃখ—কিছুই পরোয়া করেননি।

—উজান-স্রোতের মানুষ ছিলেন বলো!—সুচরিতা অস্ফুটে বলে!

—বটেই তো!

—আমাদের মতো?—সুচরিতা দুষ্টুমির মিচ্‌মিচে হাসি হাসে—মানে তোমার মতো?

সুচরিতা হঠাৎ মৃদু সুরে গেয়ে ওঠে—'তুমি সুখ নাহি যদি পাও যাও সুখের সন্ধানে যাও!'—গান থামিয়ে ছেলের সন্ধানে চোখ ঘোরাতেই চমকে ওঠে। ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে সুজাতা। পাশে প্যান্ট-কোট-টাইয়ে এক সুদর্শন পুরুষ। নিশ্চয়ই ওর স্বামী। সুচরিতার চমক ও বিস্ময় কাটার আগেই সুজাতা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে—'কেমন আছিস তুই, সুচরিতা?'

জাপটে-ধরা সুজাতার দু-বাহুর ফাঁস থেকে নিজেকে সামান্য আলগা করে নিয়ে সুচরিতার সই নিঃশ্বাস ছেড়ে পাল্টা জানতে চাইল—'তুই? তুই কেমন অছিস?'

—ভালো। মারাত্মক ভালো আছি রে!—একঝলকে ঝরনা-হাসি ছড়িয়ে সুজাতা পাশের পুরুষটিকে দেখিয়ে জানায়—বেশ ভালো রেখেছে তমাল! দাঁড়া আলাপ করাই আগে!

—থাক, থাক! ওসব ফরমালিটি করতে হবে না! আমরাই আলাপ করে নিচ্ছি!

সুচরিতা আড়চোখে তমালকে চকিতে দেখে নিয়ে নিজের নাম-পরিচয় বলে। জানিয়ে দেয় ছেলে সৌরিকের কথা। তারপর হাত-ইশারায় শৌভিককে ডাকে। কৌতূহলী শৌভিক আসার ফাঁকেই সুজাতা কথা বলে ওঠে :

—ইউনিভার্সিটি-জীবনের মতো সমান স্মার্ট আছিস দেখছি! একটুও বদলাসনি দেখছি! মানে বেশ তুরীয় আনন্দেই আছিস তালে?

—ওই আছি একরকম।

একরকম মানে? ভালোই তো আছিস! লুকোচ্ছিস কেন?—সুজাতা 'আয়-আয় সহচরী

হাতে-হাতে ধরি ধরি'র ভঙ্গিমায় সুচরিতার হাত টেনে জানতে চায়—হ্যাঁরে শৌভিক কি সেই আগের মতোই আছে? লেখে এখনও?

—লেখে। সাতটা বই বেরিয়েছে!

—বলিস কী?—সুচরিতা যেন ঈর্ষার স্বরে বাজে—কী করে ও?

—ওই তো!—সুচরিতা উদাসীনতা দেখায়—লেখে!

না-ন্না। কী কাজ, মানে চাকরি করে?

—তেমন কিছু না! প্রুফ দেখে প্রকাশকের ঘরে!

আর তুই?

—বলার মতন কিছুই করি নে! একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় আছি। সামান্য বেতন!—সুচরিতা প্রসঙ্গ পাল্টায়—বাদ দে আমার কথা! তোর খবর বল। দাদা তো শুনেছি বিশাল বড়ো পোস্টে আছেন! তুই?

—আমি কলেজে পড়াই! ও সরকারি দপ্তরের ডিরেক্টর। —সুজাতা শৌভিকের দিকে নজর ফেলে—একইরকম আছে, তাই না? ছেলেটাও দেখছি শৌভিকের কপি হয়েছে!

—হুঁ!—ছেলের দিকে দৃষ্টি মেলে সুচরিতা জানতে চায়—তোদের ক-টা? একটা না দুটো?

—একটা!

—কোথায় সে?

হস্টেলে!—সুজাতার গলা কাঁপে—তমাল অন্য ধরনের মানুষ! এত করে বললাম তবুও সঙ্গে আনল না!

—কত বয়স? কী নাম তোর ছেলের?

—সায়ক। আপার কে. জি.-তে পড়ে।

—এত ছোটো? তার মানে.... !—সুচরিতা থেমে যায়।

—মানে একটাই। আমরা অনেক পরে সন্তান নিয়েছি!—সুজাতা কৈফিয়ত দেয়—আসলে এস-ডি-ও থেকে এ-ডি-এম, এ-ডি-এম থেকে একটা দপ্তরের ডিরেক্টর, এই সব সিঁড়ি ভাঙছিল বলে তমাল এত ব্যস্ত ছিল যে...।

সুচরিতার কথা শেষ হবার আগেই যেন এক-ঝাপটা ঢেউ আছড়ে পড়ে তাদের ওপর। কিছু একটা বলার জন্য উত্তেজিত সৌরিক সুচরিতার হাত-ঝাঁকানি দ্যায়—'মা ঘন্টাতলাটা দেখবে এসো! কত্তো বড়ো ঘন্টা! একবার বাজাব মা?' সৌরিকের বলবার ধরন ও ছটফটানি দেখে সুচরিতা-শৌভিক সুজাতা-তমাল—চারজনেরই হেসে ফেলে। তার মধ্যেই শৌভিক আবৃত্তি করে—'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি, আছে আমাদের পাড়াখানি, তালবন তারি চারি ভিতে,—চলো সেই জায়গাটা দেখবে এবার চলো!'

ছিল তিনজনের, এবার পাঁচজনের দল হয়ে সুচরিতারা আশ্রম ঘুরে-ঘুরে দেখে। ছাতিমতলা, উপাসনাগৃহ, দক্ষিণায়নের সবকটা ক্লাস-তলা, আর্ট-গ্যালারি, ভাস্কর্য, যামিনী রায়ের ছবি, রামকিঙ্করের ভাস্কর্য, আজকের দিনের মুর‍্যাল, উত্তরায়ণের সংগ্রহশালা, কবির

মোটরগাড়ি, অসম্ভব সুন্দর বাসস্থানগুলো, প্রতিমাদেবীর স্টুডিয়ো, ফুলবীথি সব। ঘুরতে-ঘুরতে বেলা গড়িয়ে যায়। শৌভিকই মূলত ঘুরিয়ে দেখায়। গাইডের কাজ করে। সুচরিতা সারাক্ষণ সুজাতার সঙ্গে কথা বলে যায়। তমাল ডিরেক্টর সুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে সব দেখলেও কোথায় যেন ছন্দকাটা মানুষ হয়ে থাকে। সৌরিক পথের পাঁচালীর অপু হয়ে সব কিছু জেনে নেয়। গাছের নাম, ফুলের নাম, বাড়িগুলির নাম ফরফর বলেও যায়। শেষে আশ্রম ছাড়ার আগে সুজাতা নিমন্ত্রণ জানায় সুচরিতাকে—'জানিস আজ আমার জন্মদিন। তোদের আমন্ত্রণ রইল। আজ রাতের খাবার আমাদের সঙ্গেই খাবি তোরা।' তারপর তাদের হোটেলের ঠিকানাটা দেয়। রাস্তায় তৈরি ছিল গাড়ি। গাড়ি চড়ে চলে যায় তমালরা!

দুই

হোটেলের ২০১ নম্বর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপতেই ওপার থেকে উদাত্ত আহ্বান শুনল সুচরিতা—'আয়। তোদের জন্যই অপেক্ষা করছি।' তারপর দ্রুত হেঁটে আসার আওয়াজ ও টুকুস করে দরজা খুলে যাওয়া—'আয়-আয়। এত দেরি করলি কেন?'—মিচ্-করে একটু হেসে শৌভিকের মুখে নজর ফেলে সুজাতা—'এসো'। তারপর পিছন ঘুরে দু-পা হেঁটে ফের সুচরিতার উদ্দেশে ছুড়ে দেয় প্রশ্নের ঝাপটা :

—এত দেরি করলি কেন হ্যারে?

—কই দেরি? মাত্তর—ন-টা তো বাজে—সুচরিতা মুচকি হাসে—তা ছাড়া সৌরিককে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তবে তো আসা!

—সে কী?—সুচরিতা চারপাশে অন্বেষী দৃষ্টিতে তাকিয়ে সামান্য রাগত কণ্ঠে বলে—ছেলেকে আনিসনি নাকি?

—না!

—অন্যায় করেছিস!

—রাগ করিস নে! আসলে.... !—

—ছেলেটিকে না-এনে থাকতে পারলি? কী মিষ্টি ছেলে? ওর জন্যই তো..... !

সুচরিতাকে থামিয়ে দিয়ে সুজাতা কথা বলতে শুরু করেছিল। যদিও বাক্যি শেষ না-করে সে নিজেই থেমে যায়। একটু আগের উচ্ছলতা এখন তার গলায় নেই। কেমন যেন বিষাদের সুর অনুরণিত হয়—ও'কে কাছে পাওয়ার জন্যই তো এত আয়োজন!'

—মানে;—সুচরিতা অবাক হয়!

—মানে.....—সুজাতা একটু তোতলায়। তারপর চকিতে সামলে নেয় নিজেকে। নিয়ে ঝরনা হয়ে যায়—সৌরিককে আনিসইনি যখন তখন মানে-টানের কথা থাক। চল আনন্দ করি এখন!

—তাই চল!—সুচরিতাও সহজ হয় ঝট করে—তমালবাবু কই?

—টেবিল সাজিয়ে বসে আছে!—সুতাজা ভেতর-ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে—চল, ভেতরে চল আগে!

ভেতর-ঘরে ঢুকেই সুচরিতা চমকে ওঠে। সারা ঘরে মোহময় আলো। কুসুম রঙের সঙ্গে আশমানি নীলের মিশ্রণে অদ্ভুত একধরনের রং তৈরি হয়েছে। খুব হালকা-মাত্রায় এ-সি ছাড়া। ঘরের মাঝখানে একটা ছ-কোনো টেবিল। সুন্দর পাত্রে পাঁচ-ছ-রকম খাবার। চারধারে চারটে গেলাসে রঙিন পানীয়। সুগন্ধি মদ। টেবিলে একা বসে-বসে গেলাসে চুমুক দিচ্ছে তমাল। সুচরিতাদের দেখেই কথা ছাড়ল গড়গড়—'আসুন, আসুন। বি সিটেড প্লিজ!'

সুজাতাই হাত টেনে সুচরিতাকে বসিয়ে দেয়। পাশে নিজে বসে। তারপর মিস্টি সুরে আহ্বান জানায় শৌভিককে—'বোসো শৌভিক।' তমালের মুখোমুখি একটা চেয়ার দেখিয়ে ফের কথা ছাড়ে সুজাতা—'তোমার চলে তো ওসব?'

চলে। —বসতে -বসতে শৌভিক মদের গেলাসগুলোর দিকে পূর্ণ-নজরে চায়-তবে খুব বেশি না। এক-আধ পেগ।

—ব্যস-ব্যস। ওতেই হবে।—তমাল নিজের গেলাসে ঢকাস করে একটা ঢোঁক-মেরে উৎফুল্ল শব্দ ছাড়ে—সঙ্গী না-হলে এসব খেয়ে সুখ নেই মশায়। নিন। ধরুন!

তমালই সুদৃশ্য পানীয়ের গেলাস শৌভিকের হাতে তুলে দেয়। গেলাসে গেলাস ঠুকে 'চিয়ার্স' বলে ফের ঢোঁক মারতে গিয়ে থেমে যায়—'ম্যাডাম আপনি? খান তো?'

'না'—বলে ঘাড় নাড়ে সুচরিতা—'আমার অভ্যাস নেই!' কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সে। নজর পায়ের দিকে ফেলে সুজাতাকে বলে—'আমি না খেলে কি উনি অখুশি হবেন?'

—তা কেন?—সুজাতা খিলখিল হেসে ফ্যালে—তোর যেটা পছন্দ, যা-পছন্দ তাই খা। কেউ কিচ্ছু মনে করবে না। তবে...!

—তবে কী রে?—সুচরিতা জানতে চায়!

—আমি কিন্তু খাব! আপত্তি করবি নাকি?

—না-ন্না!

সুচরিতা তাড়াতাড়ি কৈফিয়েত দেয়—'সত্যি বলতে কী এসবে হাই-ফাই সমাজের ব্যাপার তো! আমাদের রপ্ত হয়নি! তুই খা!'

সুজাতাও হাতে গেলাস তুলে নেয়। 'চিয়ার্স' করার জন্য টেবিলের মাঝখানে হাত বাড়ায়। তিনটে গেলাস ঠোকাঠুকি হতেই শৌভিক ছড়া কাটে—'তিনটে গেলাস ঠকাস করে আভিজাত্যের চালে/মদ্দা শালিক চুম্মা খেলো পরস্ত্রীর গালে!'—শৌভিকের বলার ধরনে ও সুরে তমাল-সুজাতা হেসে ওঠে। সুচরিতাও!

চোঁ-করে নিজের গেলাসের সবটুকু গলায় ঢেলে তমাল লাফিয়ে ওঠে:

—আপনি তো মোশায় দারুণ প্যারডি করতে পারেন!

—এটা আমার সহজাত!—শৌভিক ফের ছড়া কাটে—'মানবজীবন দিয়ে বিধি পাঠিয়েছে পৃথিবীতে/কবির জীবন শুকিয়ে গেছে অনাহারের শীতে।'

—বেশ! বেশ! আবার বলুন। আরও বলুন!—নিজের গেলাস ফের ভরে নেয় তমাল।

—'সব পাখি ঘরে আসে, সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন/ বসের প্রেমে বউ

মজেছে স্বামীর উঠেছে 'পেন'।'

—সাধু-সাধু!—তমাল ক্রমশ তুরীয় আনন্দে প্রবেশ করতে থাকে— এবার একটা শান্তিনিকেতন নিয়ে হয়ে যাক বস্। হাজারহোক আমরা বাঙালি তো বটে! রাবীন্দ্রিক-পরশ না থাকলে তো সব আল্‌লি হয়ে যাবে, কী বলেন?

—হুম্! —শৌভিক তমালকে নিয়ে মজায় মাতে—'ক্ষণিক শান্তি কিনবে বলে লগ্নি করেছে ধন/হুজুগে-বাঙালিরে বকলেসে বেঁধেছে শান্তিনিকেতন!'

এবার ঘর-ফাটানো হাসিতে পরিবেশ মাতিয়ে তোলে তমাল। চেয়ার ছেড়ে বনবন বারকতক ঘুরে নেয় ঘরের যত্রতত্র। দেখাদেখি সুজাতাও উল্লাসে যোগ দেয়—কী তমাল তোমাকে বলেছিলাম না, সুখ যদি তুমি চাও তবে শৌভিক-সুচরিতার সন্ধানে যাও। এবার মিলছে তো?

—জরুর মিলছে!—তমাল ফের হাতের গেলাস এক ঢোঁকে শেষ করে—ড্যাম তোমার আর সব বন্ধু-বান্ধবী! শৌভিকবাবু জিন্দাবাদ!

—আর সুচরিতা?—সুজাতা কপট অভিমান জানায়—ও জিন্দাবাদ পাবে না?

—পাবেন, অবশ্যই পাবেন। তবে....।

—তবে কী?

—ওনাকে তো এখনও টেষ্ট করা হয়নি। মানে..। টেষ্ট না-করে তো কাউকে....মানে কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো?

সুজাতাকে উদ্দেশ করে কথা বললেও তমাল মোহময় নজরে সুচরিতাকে দেখতে থাকে। সে-নজরের তাৎপর্য বুঝে নিয়ে সুজাতা কথার-চিমটি কাটে—'ওহে আমার টেস্টের বাদশা যা টেস্ট করছ তাই নিয়েই মশগুল থাকো। এদিকে নজর দিয়ো না জিভ পুড়ে যাবে, হ্যাঁ!'

ঘরে আরও এক দাপট হাসির ঢেউ খেলে যায়। কেমন যেন একধরনের হালকা হয়ে ওঠে পরিবেশ। সেই হালকা-মজার তরঙ্গের মাথায় চড়ে তমাল পটাশ করে একটা চুমু খায় সুজাতার ঠোঁটে—'শৌভিক-সুচরিতা সঙ্গ উপহার দেবার জন্য হাজার স্যালুট তোমাকে।'

'ব্যাস্-ব্যাস। থামো-থামো'—সুজাতা দু-হাতে তমালকে ঠেলে দেয়—'আর এগিয়ো না। গেলাসে মন দাও। যাও চেয়ারে বোসো।'—শরীর—ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে তমালের লাজহীনতা ও দ্বিধাহীনতার গতিকে এ মুহূর্তে থামিয়ে দেয়। তমাল থামেও। থেমে চেয়ারে বসে—'বেশ আমরা নিরামিশ প্লেটনিক দেহতত্ত্বের চর্চাই করি তা'লে।' সামান্য হাসে তমাল। তারপর—'বলুন শৌভিকবাবু রবীন্দ্র-সাহিত্যের যৌনতা বিষয়ে কিছু বলুন দেখি।'

শৌভিক অনুচ্চ হাসে। তারপর তমালের সঙ্গে আড্ডায় ডুবে যায়। পাশাপাশি সুজাতা আর সুচরিতা মগ্ন হয় গাঢ় আলাপচারিতায়। সুচরিতাই শুরু করে :

—বেশ সুখেই আছিস তুই! মানে তোরা! তমালবাবুর মত স্বামী। দুজনের বড়ো চাকরি। কী বলিস?

—অস্বীকার করব না!—সুজাতা ছোট্টো হাসে!

—শৌভিক হলে কী বলত জানিস?

—কী?

—'জীবন উহাদের পুষি বিড়ালের ডাক/ঘরটি গড়েছে মধুমক্ষিকার চাক/ হাতে হাত-বাঁধা মার্বেলে মোজাইক/সহবাসে সুখ সদা করে চিকমিক।'

—এটা কি শৌভিকের লেখা?

—হ্যাঁ। সুচরিতা কাটা-কাটা বাক্যে জানায়—তোদের মতো সুখী দম্পতিকে দেখে এটাই ওর অভিব্যক্তি। বড়ো সুখেই আছিস তোরা!

—তা আছি। তমাল কোনোদিকে খামতি রাখেনি!—সুজাতা কণ্ঠে বাড়তি খানিকটা উচ্ছ্বাস এনে বলে—রাখেও না। পাগলের মতো ভালোবাসে! মাতালের মতো প্রশস্তি করে। বাদশার মতন উপহার দেয়। চাষির মতন শরীরী খেলায় মাতে। উথলানো দুধের মতন আনন্দ দেয়। রসিকের মতন সাজসজ্জা দেয়। শ্রমিক মৌমাছির মতন রক্ষা করে। ইভটিজারদের মতন শৃঙ্গারে মাতে। আর....! —সুজাতা মুখস্থের মতো বলতে-বলতে একটু থামে!

—আর কী করে?—সুচরিতা হীনমন্য কণ্ঠে জানতে চায়!

—আর মা-পাখির ওম নিয়ে আমাকে চোখে হারায়!

—সত্যি ভাগ্যি করে বর একটা পেয়েছিস তুই!

—তুইও তো পেয়েছিস! কত সুন্দর-সুন্দর কথা বলে শৌভিক! কী বলে না?

—তা বলে।—সুচরিতা নিজের দারিদ্র্য মলিন সংসারের প্রসঙ্গকে আলোচনায় না-এনে চকিতে প্রসঙ্গ ঘোরায়—তোর জন্মদিন কি ফি বছর শান্তিনিকেতনে এসে পালন করিস?

—সব বার শান্তিনিকেতন কেন হবে?—সুজাতা কলকল কথা ছাড়ে—একঘেয়েমি আমার পছন্দ নয়। এক-আধবার এক-এক স্পটে যাই। কখনও পেলিং, কখনও গোয়া, কখনও আরাকু, কখনও জয়পুর.....ঘুরে ঘুরে পালন করি!

—কী সুভাগ্যি তোর !—সুচরিতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—না এমন একা একাই কাটাস নাকি?

—না-ন্না!—সুজাতা সাগর-ঢেউ হয়ে জানায়—তা কেন! এবার আমি আর তমাল ঘনিষ্ঠ কাটাব বলে একা-একা বেরিয়েছি। অন্য—অন্যবার কাউকে-না-কাউকে সঙ্গে নিই!

—কাদের ডাকিস?

—জয়া-অমিতাভ, সীমা-কোরক, ইতিকণা-সৌমিত্র....ইউনিভার্সিটি জীবনের কোনো-না-কোনো বন্ধুকে ডাকি!

—কেমন আছে ওরা?

—দারুণ। সব্বাই সুখী। দারুণ সুখী! বিবাহিত জীবনের স্বাদ কোথাও রাখেনি কোনো খাদ!

—সবার সঙ্গে যোগাযোগ আছে বুঝি তোর?—সুচরিতার গলায় গ্লানিমা—কুয়োর ব্যাঙ হয়ে অছি আমি! কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই আমার। ওরাও তোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে তাই না?

—হ্যাঁ! সুচরিতার গলায় নেতৃত্বের পোঁচ—শুধু তোর খবরই ছিল না এতদিন! অনেক

চেষ্টা করেও তোদের সন্ধান পাচ্ছিলাম না! যোগাযোগ রাখিসনি কেন তুই?

—শুনলি তো সংসারের হাল! কী করে সব সামলাব বল?

—তা অবশ্য ঠিক! তোর অবস্থাই দেখছি সবচেয়ে....!

কথা শেষ করতে পারে না সুজাতা। তার কথা ঢেকে যায় শৌভিকের কথার প্রতাপে। সামান্য উত্তেজিত ও আবেগী হয়ে যেন বক্তৃতাই করছে সে—'অহংকে প্রশ্রয় দেবেন না তমালবাবু। রবীন্দ্রনাথকে দেখে আমাদের শেখা উচিত। শিলাইদহ আর ছেউড়িয়ায় গিয়ে আমি দেখে এসেছি। পাশাপাশি দুই মহাজীবন। রবীন্দ্রনাথ আর লালন। শহুরে বুদ্ধিজীবী আর গ্রাম্য-দার্শনিক। লালনের উদারতা ও সত্যকে স্বীকৃতি দিতে পিছপা হননি। গোরা উপন্যাসের মর্মবাণীই করে দিলেন লালনের গান—'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।' শুধু তাই না, বুদ্ধি আর চিন্তনের মুক্তি দেবার জন্যই এই মুক্ত-বিশ্ববিদ্যালয়—ছাতিমতলায় মহাপাঠশালা। এর সমস্ত আর্কিটেক্টে লোকজ মোটিফকে সম্মান দিয়েছেন। দিয়ে....!'

'ড্যাম ইয়োর মুক্ত-চিন্তন আর রবিঠাকুর!'—ঠকাস করে টেবিলে মদের গেলাস ঠুকে শৌভিককে থামিয়ে দিয়ে তমাল চেঁচিয়ে ওঠে—'সব মিথ্যে। রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতন মিথ্যে। কী সত্যি জানেন? ভাঁড়ামি সত্যি ভোগ সত্যি। সারাজীবন শুধু ভোগের পেয়ালায় চুমুক দেওয়াটাই সত্যি। তোমার রবিঠাকুর শুধু আস্‌লি পিরিতের কবি। বুয়োছ? তবে ওর জীবনটা কিন্তু.....'

তমাল কিছুটা বেসামাল। সেদিকে ইঙ্গিত করে সুচরিতা জানতে চায়—'বারণ কর। আর খেতে দিস না!' সুজাতা পাত্তা দেয় না যদিও। বলে—'শুনবে না।' তারপর ফিরতে চায় আগের প্রসঙ্গে—'বাদ দে ওর কথা। একসময় থেমে যাবে! তোর কথা বল!'

—আমার কথা?—সুচরিতা মুচকি হাসে—আমার, মানে আমাদের তো বলার মতো কোনো কথা নেই যে বলব।

—তাই আবার হয় নাকি?—সুজাতা চেপে ধরে—শৌভিক জিনিয়াস ছেলে। ইউনিভার্সিটিতে ওর প্রেমে অনেকেই হাবুডুবু ছিল। শেষমেশ তুই পেয়েছিস। কেমন আছিস বলবি না? লুকিয়ে রাখবি?

—সত্যি বলছি বলার কিছু নেই! কী বলব? যা বলব সে-সব তোদের ভালো লাগবে না! মানে এতই সামান্য আমাদের জীবন যে.... কী বলি তোরে!

—যা জিজ্ঞেস করি তাই বল!

—কী?

—আমার জন্মদিন পালনের কথা তো শুনলি।—সুজাতা স্মার্ট জানতে চায়—তোর জন্মদিন কী করে কাটাস!

—সে বলার মতো কিছু নয় রে!

—মানে?

—ওই নিতান্ত গদ্যের মতো। একটু পায়েস! একগাছি ফুল! আর কী?

—শৌভিক কী করে সেদিন? কী দেয়?

—পাগলামি!—সুচরিতা মুখ ফসকে বলে ফেলে!

—পাগলামি?—সুজাতা কৌতূহলী হয়ে—কী করে?

—নৌকা ভাষায় অলকানন্দা জলে!

—মানে!

—মানেটা বড়ো দীন রে সুজাতা—জড়তা ভেঙে সুচরিতা এতক্ষণে দৃঢ় গলায় কথা বলে—বড়ো টানাটানির সংসার। করবে আর কী? ওর সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া। কবিগুরু পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর জন্মদিনে ফি বছর বাড়ির ভেতর ছোট্টো একটা ডোবাতে কাগজের নৌকা ভাসাতেন। শৌভিক তারই ভিন্নরকম সংস্করণে আমার জন্মদিনে নৌকা ভাষায়। ভাষায় আর বলে—'ভালো যদি বাসো সখি কী দিব গো আর কবির হৃদয় এই সব উপহার।' জানিস সুজাতা প্রতিটি জন্মদিনে ও রক্তক্ষরণ করে। বলে—'বড্ডো কষ্টে রেখেছি তোমাকে। কিছুই দিতে পারিনি। তাই অক্ষমের এই পাগলামিটাকেই গ্রহণ করো। এই কাগজের নৌকাটাকেই পালতোলা সপ্তডিঙা ভেবে নাও। এই ডোবাটাকেই ভাবো অলকানন্দার পুণ্যতোয়া। আর...!'

—আর কী বলে?—সুজাতা চাতকের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করে!

—বলে, 'তুমি সুখ নাহি যদি পাও যাও সুখের সন্ধানে যাও!' বলে...! হঠাৎ থেমে যায় সুচরিতা। তার গলায় দলা পাকিয়ে যায় কথারা। টেবিলে মাথা রেখে সে কীসের যেন একটা ধাক্কা সামলায়! সুজাতা যদিও এসবকে পাত্তা দেয় না। সটান দু-হাতে টেনে তোলে সুচরিতাকে। এবং পটপট বলে যায়—'ওম্মা! কী মিল রে তমালে-শৌভিকে! ওই একই পাগলামি তো তমালও করে। ফি-জন্মদিনে ওই-তো নৌকা ভাষায়। তবে ঘরের মধ্যে। রাত্রের বিছানায় যাবার আগে। বড়ো রূপোর একটা পাত্রে জল ঢেলে ছোট্টো একটা সোনার নৌকা ভাষায় সে জলে। ওটাই তো ওর জন্মদিনের উপহার!'—সুজাতা একটু থামে। সুচরিতার চোখের ওপর চোখ রাখে—'আর আমার শরীর নিয়ে শুরু করে পাগলামি। আর....।'

সুজাতা, তারপর সত্যিকারের সুজাতা হয়ে যায়। হয়ে একদা কোনা এক সামন্তকন্যার পায়েসান্ন গ্রহণে যেভাবে উপাসক গৌতম সিদ্ধি পেয়ে বুদ্ধতে পরিণত হয়েছিল, সে ইতিহাসেরই-নব-আখ্যানের গল্প বলে। আর সেই আখ্যান শুনতে শুনতে সুচরিতা কুঁকড়ে যায়। শৌভিক যায় গুটিয়ে। তমাল বেশ খানিকক্ষণ আগে থেকেই আউট। গুম মেরে গেছে। সুজাতা ওসব ভ্রূক্ষেপে আনে না। সে বলে যায়। অনেকক্ষণ ধরে বলে যায়। বলতে বলতে সুচরিতাদের খেতে দেয়। নিজের স্বাধীনতার গল্প করে। হাতে তুড়ি দিয়ে জানায়—'সুখ কেউ পায় না। দেয়ও না। সুখকে কেড়ে নিতে হয়। আমি সুখ কেড়ে নিই। বুঝলি?'

সুচরিতা-শোভিক এখন নির্বাক। শুধু শুনে যায়। শুধু মাথা নেড়ে যায়। তারপর খাওয়া শেষ করে যখন বিদায় লগ্ন আসে সুজাতা জানতে চায়— 'ওহ্, ভালো কথা। তোরা কোথায় উঠেছিস? ঠিকানাটা দে। কোন্ হোটেলে?'

সুচরিতার মুখটা আরও ছোটো হয় এ প্রশ্নে। সে মাথা নীচু করে থাকে। তা দেখে সুজাতা তাড়া দেয়—'কী রে চুপ মেরে রইলি কেন বল!'

—আমরা কোনো হোটেলে উঠিনি!—সুচরিতাকে চুপ থাকতে দেখে শৌভিক উত্তর করে।

—তা'লে? নিজেদের বাড়ি? কই বলোনি তো আগে!

—না, নিজেদের বাড়িও নয়!

—তবে?

—আমরা তো টুনটুনি পাখি। অপরের অট্টালিকাই সার!

—মানে?

—আমি যে প্রকাশকের প্রুফ দেখি তাঁর বাড়ি আছে 'সোনারতরীতে'। ওখানেই উঠেছি।

—কোথায় বললে? সোনারতরীতে? কত নম্বর? কাল যাব একবার। কেমন?

'ঠিক আছে!'—বলে কোনোরকমে বিদায় নেয় শৌভিক-সুচরিতা! ঘরের বাইরে এসে সোজা সিঁড়ি ধরে নামতে থাকে। নামতে-নামতে দরজা বন্ধ হবার শব্দ পায়। আর পায় সুজাতার গলা—'যদি আর কারে ভালোবাসো, যদি আর ফিরে নাহি আসো/তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাই আমি যত দুখ পাই গো.....!'

তিন

যা কখনও নয় এতদিনে তার গুটি গুটি আগমন ঘটে সুচরিতার সংসারে। সুজাতার জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে এসে কেমন যেন গুম মেরে গেছে শৌভিক। না স্বভাব-মাতনে একটাও কবিতা পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করেনি। তারা ফিরে আসার পর মালি-বউ চলে গেছে। সৌরিক ঘুমে কাদা। সুচরিতার মনেও যেন দুঃখের কুঁই-কুঁই ডাক। সেই প্রথম কথা বলে :

—সুজাতার সঙ্গে দেখা না-হলেই ভালো হত!

—কেন?—শৌভিক ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে—ভালোই তো হল! এতদিনে একটা সত্যকে ভালো করে বুঝলাম।

—কী?

—তোমাকে আমি এতদিন যে ঠকিয়েই এসেছি সেটা বেশ করে টের পেলুম!

—মানে?

—ওরা, মানে সুজাতারা তোমার থেকে অনেক পিছনের সারিতেই ছিল, ইউনিভার্সিটিতে। অথচ আজ কত ওপরে। তার তুমি....!—শৌভিক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে—সব আমার দোষ!

—তা কেন?—সুচরিতা খানিকটা প্রতিবাদে যায়—স্বাচ্ছন্দই কি জীবনের সব? প্রেম-ভালোবাসা—শান্তির কি কোনো দাম নেই?

—'হায় রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল/গরিব কবি বসে আছি ধরে শুকনো ডাল।' রূপকথার যুগ শেষ সুচরিতা! আমি সত্যি তোমাকে ঠকিয়েছি! কী দিয়েছি তোমাকে? কিচ্ছু না!

—এমন করে বোলো না শৌভিক!—সুচরিতার প্রতিবাদে তেমন জোর আসে না—আমি

তো কখনও অনুযোগ করিনি এসব নিয়ে।

—'জুড়ি ভেঙে উড়ে গেছে কাজল-চোখো শালিক/পায়েতে তার বেড়ি দেছে মোটরগাড়ির মালিক!'—শৌভিক অসহায়ের হাসি হাসে—চলো ঘুমাবে চলো!

নিঃশব্দেই শুয়ে পড়ে দুজনে। দীর্ঘক্ষণ কেউ কোনো কথা বলে না। চিৎ হয়ে পাশাপাশি শুয়ে থাকে। স্পর্শহীন। অনেকক্ষণ এভাবে কাটার পর শৌভিক বিড়বিড় করে—সকালের পদ্যটার লাইনগুলো পালটে দিয়েছি বুঝলে। এইভাবে সাজিয়েছি ওদের—'অঙ্ক কষে চলাটা জীবন নদী/সোনারতরীতে সুখের জাফরি দোলে/কণ্ঠকূজনে সব পাখি আজ ভোলে/ভোগের থলিটা ভরা থাকে সদা যদি!' একবার নয় বারবার বিড়বিড় করে লাইনগুলি আবৃত্তি করতে থাকে শৌভিক। ঘুমপাড়ানি-সুরের সেই পাঠের ঘোরেই যেন সুচরিতা ঘুমিয়ে পড়ে। শৌভিকও।

সে ঘুম ভাঙে মোটরগাড়ির হর্নে আর সুজাতার ডাকাডাকিতে। ঘুমচোখেই দরজা খোলে সুচরিতা। আড়ষ্ট আহ্বান জানায়—'আয়!'

—উঁহু!—সুজাতা খুব শীতল গলায় অস্বীকার করে—যাব না।

—তবে? এলি যে সাত সক্কালে?

—চলে যাচ্ছি প্রোগ্রাম পাল্‌টে!

—মানে?—সুচরিতা অবাক হয়!

—যাবার আগে একবার দেখা করে গেলুম! আর...!—সুজাতা বারকতক তুতলিয়ে জানায়—এই নে! ধর!

—কী এটা?

ছোট্ট কাগজের একটা চিরকুট হাতে নিতে-নিতে সুচরিতা গাড়ির মধ্যে নজর ফেলে। গাড়িতে ম্রিয়মাণ তমাল। চুপচাপ বসে আছে। চোখ ঘুরিয়ে সুজাতার মুখে ফেলতেই দেখে দরজা খুলে নিজেও সিটে বসতে-বসতে সুজাতা নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে—'চালাও।' চকিতে গাড়ি ঘুরে গেল। চলতেও শুরু করল। বাইরে মুখ বাড়িয়ে সুজাতা জানাল—'এবার পড় চিরকুটটা।'

ছোট্টো কাগজটা খোলে সুচরিতা। পড়তে থাকে—'মাপ করিস সুচরিতা! কাল রাত্তিরে যে এপিসোড তোর সামনে তুলে ধরেছিলুম ওটা অভিনয়। এখন আমি ফি-দিন একা থাকি। বড়ো অসহায়ও থাকি! জয়া-সীমা-ইতিকণা-সৌমিত্র-কোরকদের সম্পর্কেও যে কথা কাল বলেছি সেসবও বানিয়ে। যতদূর জানি ওরাও ভালো নেই! আসলে এ সময়টা ভালো থাকার নয় রে। চেনাজানা কেউ ভালো নেই জেনে এতদিন এরকম ছিলামও আমি। কাউকেই, কিছুকেই, পরোয়া করতাম না! অথচ কাল তোকে দেখে মনে হল বেশ সুখেই আছিস তুই। কী যে হয়ে গেল মুহূর্তে? ক্ষমা করিস! আর একটা কথা! কাল রূপোর পাত্রে সোনারনৌকা ভাসানোর যে কথা বলেছিলুম সেটা কি জানিস? তুলোর নৌকা। ভেজা তুলোর ওই নৌকা দিন দিন ডুবে যাচ্ছে কেবলই। শোন, কাল যাকে তমাল বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম ও তমাল নয়। নিছক সেক্স-পার্টনার। তমালের সঙ্গে অনেকদিন আগেই ডিভোর্স হয়ে গেছে।...ভাবছিস

এসব তোকে জানাচ্ছি কেন? না-জানালে যে তুই অসুখে থাকবি! সেটা ঠিক হবে না। অনেকদিন পর সুখে থাকা কাউকে দেখলাম। ঠিকই বলেছে শৌভিক—'অঙ্ক কষে চলাটা জীবন নয়/গাছের শাখে আলোর জাফরি খেলা/জীবন তোদের উজান স্রোতে বয়।' ভালো থাকিস সুচরিতা। সুখে থাকিস। তুই সুখে না-থাকলে যে....!' ইতি সুজাতা!

চিরকুটটা শেষ করে চোখ তুলে তাকাতেই সুচরিতা দেখে শৌভিক উঠে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। চোখে প্রশ্ন—'কী ব্যাপার?' সুচরিতা কোনো উত্তর দেয় না। বড়ো-বড়ো চোখের দৃষ্টি ফেলে শৌভিকের দিকে তাকিয়ে থাকে। দৃষ্টিতে টলটল করে দু-ফোঁটা জল। শৌভিক প্রশ্ন করে—'কী হয়েছে সুচরিতা?'

—কিছু না।

—কাঁদছ যে বড়ো।

—কই?—সুচরিতা নিঃশব্দে হাসে—আমি ভালো আছি গো! খুব ভালো।

বসে সামনে তাকায়। সুজাতাদের গাড়িটা দেখতে চায়। শৌভিকও। দেখতে চায়। কিন্তু পায় না। গতিবান গাড়িটা মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে।

খেলনা বাড়ি

রাসবিহারী দত্ত

ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় জয়ব্রত। দিদিমার সঙ্গে টুবলুর ধস্তাধস্তি চলছে। শো-কেসে সাজানো খেলনা-বাড়িটা টুবলুর চাই-ই-চাই। দিদিমা কিছুতেই সেটা টুবলুকে দিতে চান না। জেদি টুবলু বলছে, চাবি দাও, নইলে বাড়ি মেরে কাঁচ ভেঙে দেব। শাড়ি কামড়ে, হেঁচড়ে চরম অবস্থার সৃষ্টি করেছিল বোধহয়। কেননা রান্নাঘর থেকে জয়তীও ছুটে এসেছ। টুবলুকে ধমক-ধামক লাগিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করছে। টুবলু নাছোড়বান্দা।

এমন সময় বাবাকে ঘরে ঢুকতে দেখে মরিয়া হয়ে টুবলু ছুটে এল বাবার কাছে।—দেখো না বাবা, দিদিমা ও মা কেমন করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে। ঐ খেলনা-বাড়িটা কিছুতেই দিচ্ছে না। তুমি একটু বকে দাও তো।

জয়ব্রত কোলে তুলে নিল টুবলুকে। আদর করতে করতে বলল, এ ভারি অন্যায়। আমার টুবলু সোনাকে খেলনা-বাড়ি দিচ্ছো না। তোমরা কেমন গো?

এবার জয়ব্রত মায়ের দিকে ফিরেই বলল, দাও তো মা সো-কেসের চাবিটা। টুবলু সোনাকে আমি বের করি দিচ্ছি খেলনা-বাড়িটা।

মা ঠিক আগের মতই প্রতিবাদ করে উঠলেন, না খোকা, এ খেলনা বাড়ি টুবলুকে দেবে না। ও ওখুনি এটাকে নষ্ট করে ফেলবে।

—না বাবা, আমি একটুও নষ্ট করবো না। একবারটি খেলে রেখে দেব। তুমি যে গাড়ি কিনে দিয়েছিলে, এখনো নষ্ট করি নি।

—দাও না মা। ও কি আর নষ্ট করবে। আমি কাল না হয় আর একটা প্লাস্টিকের খেলনা-বাড়ি সেট কিনে আনব।

—না খোকা, তোর বোধ হয় মনে নেই। এ তোর ছেলেবেলার খেয়ালের তৈরি বাড়ি। তোর বাবা একটা খেলনা বাড়ি কিনে এনেছিলেন। পরের দিন ভোরে উঠেই এই অদ্ভুত বাড়িটি তুই বানিয়েছিলি। তোর বাবা মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়েও চমকে উঠেছিলেন। কিছু কিছু জায়গায় বাড়িটির অদ্ভুত সুন্দর নক্সা দেখে। এই আইডিয়া দিয়ে তোর বাবা তাক লাগিয়ে দিয়েছিল কোম্পানির কর্তাদের। কর্তাদের প্রমোশনের পর প্রমোশন হয়েছিল। তোর সেই ছেলেবেলার তৈরি বাড়িটি শো কেসে সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলেছিলেন, এই খেলনা বাড়িতে কেউ যেন হাত দিও না। সেই থেকে একইভাবে আছে এখানে। আমিও ভুলে গিয়েছিলাম। সারা দুপুর না ঘুমিয়ে তোর ডাকাত ছেলে খুঁজে বের করেছে। তার ঐ বাড়িটাই চাই। চমকে উঠলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে তোর বাবার কথা মনে পড়ল। তিনি বেঁচে থাকলে কি করতেন জানি না। আমি কোনভাবে বাড়িটা বের করে দিতে পারি না।

জয়ব্রত কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে পড়ল। কই দেখি তো? প্রায় চমকে উঠল জয়ব্রত। কোন কোন জায়গায় সত্যিই অভিনব নক্সা। কবে কোন ছেলেবেলায় কি তৈরি করেছিল কোনভাবেই

স্মৃতিতে এলো না। কিন্তু যত দেখতে লাগল ততই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

জয়ব্রত বলল, না মা আমিই দেখব। এতদিন আমাকে তুমি বলনি কেন!

আমারই কি মনে ছিল ছাই। নেহাৎ টুবলু বায়না ধরতে দেখি ঐ খেলনা-বাড়িটা। তখনই আমার স্মৃতিতে ভেসে উঠল তোর বাবার কথা।

টুবলু অবাক হয়ে কথাবার্তা শুনছিল। যেই মুহূর্তে জয়ব্রত বলল, আমিই দেখব। তখনই টুবলু বলে উঠল, না বাবা, ওটা আমি নেব। সে ছুটে গিয়ে শো কেসের কাঁচের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টুবলুকে আদর করে দিতে দিতে বলল, হ্যাঁ সোনা, এই খেলনা বাড়িটা তোমার আর আমার। একা একা তো খেলা হয় না। আমরা দুজনে গিয়ে স্টাডিতে বসে খেলব। কি বল?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালোই হবে। আমি কিন্তু আগে হাত দেব। তুমি তার পরে।

জয়ব্রত বলল, তাই-ই হবে। তবে আমরা কেউ বাড়িটা ভাঙবো না, শুধু দেখব।

এক মুহূর্ত টুবলু ভাবল। তারপর বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুধুই দেখবো। কেউই ভাঙবো না।

এবার মা সেই খেলনা বাড়িটা বের করলেন। জয়ব্রতর চোখ জোড়া বড় হল। কী অভিনব নক্সা কোথাও কোথাও। হয়তো কোন স্বীকৃত ব্যাকরণ নেই। তবুও মাথায় বিদ্যুৎ খেলল। জয়ব্রত জয়তীকে ডাকলো, শিগগিরই স্কেচ পেন আর রাইটিং প্যাড নিয়ে এলো।

টুবলু বাবার মতিগতি বুঝতে পারছিল না। সংশয়ে দুলছিল। হয়ত বাবাই আমার.....। জয়ব্রত এক পলক চেয়ে টুবলুর ভাব বুঝতে পেরে বলে উঠল; হ্যাঁ টুবলু সোনা, বুঝলে এই খেলনা বাড়ি তোমার আর আমার।

—না, না, আমার, কেবল আমার।

—আচ্ছা, হবেখ'ন। বুঝলে, বেশি বেশি হাত দিলে তা ভেঙে যাবে।

কে শোনো কার কথা। টুবলু অস্থির। সে খেলনা বাড়িকে হাত দিয়ে ছোঁবে। আর হাত দিয়ে ছোঁয়া মানেই এক একটা সাজানো প্লাস্টিক তুলে নেওয়া।

জয়ব্রত নানা কসরৎ করে টুবলুকে আটকে দ্রুততার সঙ্গে খেলনা বাড়িটার স্কেচ করে নিল। আর আটকাতে পারল না টুবলুকে। সে নিমেষে খুলে ফেলছে লন, কাগজের নক্সা, টাওয়ার, ব্যালকনি। খুবই আক্ষেপ হচ্ছিল জয়ব্রতর। কি আর করা।

জয়ব্রতর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। কিছু একটা হারানোরা বেদনায় কাতর। মনে পড়ছিল ছেলেবেলাকার স্মৃতি। ভীষণভাবে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, সে মায়ের কথায় সম্বিৎ ফিরে পায়। হলো তো, এতো দিনের আগলে রাখা বাবার ইচ্ছেটা মাটি হলো তো! জয়ব্রত কিছুটা লজ্জা পেল।

টুবলু ততক্ষণে সবকটি প্লাস্টিক টুকরোকে আগলা করে ফেলেছে। দিদিমার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে জয়ব্রতকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, তুমি কিছু ভেবো না বাবা। আমি কাল সকালেই আবার একটা বাড়ি বানিয়ে দেব।

সেদিন বেশ রাতেই ঘুমিয়েছিল জয়ব্রত। সারাক্ষণ এই ভাবনাটা জুড়ে বসেছিল—সেই ছেলেবেলায় এমন অদ্ভুত বাড়ির নক্সা সে কি করে তৈরি করেছিল।

বাবার ছিল বদলির চাকরি। কতশহর-গঞ্জ-গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়ে চুড়ইভাতি খেলে বালু-কাদার ঘর তৈরি করেছিল হয়তো। কিন্তু পাকা ইঞ্জিনিয়ারের মত পাকা নক্সা যে কি করে তৈরি করেছিল কোন মতে ভেবে পায় না।

পরদিন ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হল। আর ঘুম ভাঙলো ঐ টুবলুরই ডাকে। বাবা ও বাবা। রোদ উঠে গেছে, এখনো ঘুমোচ্ছ যে। উঠে পড়। উঠে পড়।

তারপর নাকে-মুখে তার সেই ছোট্ট হাত দিয়ে টেনে টেনে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। তখনো জয়ব্রতর চোখে ঘুম জড়িয়ে। টুবলুর আর তর সইছিল না। চোখের পাতাকে টেনে খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, দেখো বাবা আমি কেমন বাড়ি তৈরি করেছি।

সারা শরীরে ঝাঁকুনি খেল জয়ব্রত। চোখ খুলে অবাক হয়ে দেখল, বেশ অভিনব বাড়ি বানিয়েছে টুবলু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল জয়ব্রত।

ততক্ষণে টুবলু তার দিদিমা ও মাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে। দেখো, আমি কেমন বাড়ি বানিয়েছি। তারপর জয়ব্রতর মুখ টেনে ধরে বলল, বলো বাবা বলো দিদুকে, আমি কেমন সুন্দর বাড়ি বানিয়েছি।

এবার জয়ব্রত মার দিকে উজ্জ্বল চোখ জোড়া তুলে বলতে থাকল, সত্যি সত্যিই টুবলু আমার ছেলেবেলার থেকেও অভিনব সুন্দর মডেলের বাড়ি বানিয়েছে।

আর সেই কথাটা শোনা, অমনি টুবলু দিদু-বাবা-মার চারদিকে নাচতে নাচতে ঘুরতে থাকল।

জয়ব্রতর কপালে তখন চিন্তার বলিরেখা। এই শৈশবে এমন অভিনব নক্সা তৈরি কি করে সম্ভব হয়!

নগর বাউলের চিঠি

আনসার উল হক

সাদা ধবধবে খামে একটা চিঠি এসেছে ইয়র্কশায়ার থেকে। লিখেছে বারো বছর আগেকার এক পরিচিত বন্ধু। নাম আকাশ। মাইক্রো-বায়োলজি নিয়ে সে পড়ছে হার্ভার্ডে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত চিঠি পেয়ে মেঘলা আশ্চর্য হয়ে যায়। এতদিন পরেও আকাশ তাকে মনে রেখেছে! চিঠি লিখেছে ভার্সিটি-লাগোয়া টেমস নদীর তীরে বসে। প্রিয়তমা সম্বোধন করে সে লিখেছে, আমাকে ক্ষমা করো। তুমি শিল্পী, তুমি কবি। আমার অপরাধ নিও না। ক্ষমাসুন্দর চোখে আমাকে আগের মতই দেখবে, আশাকরি। অসময়ের এই চিঠি হয়তো তোমার বিরক্তির কারণ হতে পারে। পড়া হয়ে গেলে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে তোমার বাড়ির পাশে ডুংলু-র জলে ভাসিয়ে দিও। আমার এখানে সমুদ্রের নীল জল কারণে অকারণে গর্জন করে তীরে আছড়ে পড়ে। এখানকার মাতাল বাতাসে চুল ওড়ে। আমাদের ফেলে আসা সময়গুলোকে মনে করিয়ে দেয়। কলেজের সোনালী দিনগুলোর কথা হৃদয়ের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে। ভালোবাসার দাবি না থাক, সহপাঠীর দাবি তো থাকতে হবে তোমার ওপর। তাই এই লেখা। এতদিনে হয়তো তোমার সংসার হয়েছে, ঘরবাড়ি হয়েছে। আরো অনেক কিছুই হয়েছে। সুখে শান্তিতে তোমরা আছ। নির্ভাবনায়, হৈ-হুল্লোড় আর গভীর শান্তিতে তোমার সময় কাটছে তোমার আপনজনকে নিয়ে। এমনি অনেক কথাই লেখা হয়েছে চিঠিতে।

চিঠি পেয়েই মেঘলা আবেশ আর স্বপ্নের মধ্যে তলিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নের ঘোর কাটে। এই চিঠি হয়তোবা অপ্রত্যাশিত নয়। হতাশায় জর্জরিত মেঘলার কাছে এই পত্র যেন প্রচণ্ড গরমে এক চিলতে ঠাণ্ডা বাতাস। এই চিঠি তার কলেজ জীবনের নানা স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় আকাশ আর মেঘলার পবিত্র ভালোবাসার দিনগুলোর কথা, কলেজের করিডরে অফ-পিরিয়ডে আড়ালে-আবডালে চোখে-চোখে দু-চার কথা বলার বিশেষ মুহূর্তগুলো। মেঘলা জানে একসময় কলেজের মধ্যে আকাশই ছিল সেরা ছাত্র, সেরা স্পোর্টসম্যান। হাইজাম্প আর পোলভল্টে তার পুরস্কার ছিল বাঁধা। কবিতা লেখায়ও সে ছিল পারদর্শী। চিঠির শব্দচয়ন আর অঙ্গিক দেখে তার খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। গানের গলাও ছিল তারিফ করার মত। কোন কোন সময় প্রভাতফেরী বা নগর পরিক্রমায় তাকে নগর বাউল বলে সবাই খ্যাপাত, খ্যাপানোর অবশ্য একটা কারণ আছে। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অবৃত্তি ছাড়া তাকে বাউল গান পরিবেশন করতে হতো শ্রোতাদের অনুরোধে। কলেজের বারো মাসে তেরো অনুষ্ঠান ছাড়া তাকে যেতে হয় শহরের বিভিন্ন জায়গায়। অংশ নিতে হয় বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। সেখানেও অতিরিক্ত বাউল গানের আবদার। গেরুয়া রঙের ফতুয়া বা পাঞ্জাবিতে আকাশকে দারুণ মানায়। যেমন মানায় বাউল গীতি তার ভরাট-দীপ্ত গলায়। আচার-অনুষ্ঠানে

বন্ধুদের কাছে সে পরিচিত নগর বাউল হিসাবে। এতে তার কোন অভিমান নেই, বাউল পদবাচ্য হওয়ার কোন আগ্রহও নেই। দাম বাড়ানোর চেষ্টা নেই, সস্তায় নাম কেনার অহেতুক আকাঙ্ক্ষাও নেই। নামেই কী এসে যায় এটা সে ভালোভাবেই জানে। মূলতঃ কলেজের আবৃত্তি আর বক্তব্য মেঘলাকে কাছে টেনে ছিল। অজান্তে সে স্থান করে নিয়েছিল আকাশের বুকের ভিতর। চিঠির লাইনগুলো পড়তে পড়তে তার মনে হয়েছে পৃথিবীটা এখনও কবিতাময় আছে। এখনও আকাশের মত ছেলেদের হৃদয়ে সুবাসিত ভালোবাসা আছে, গভীরতা আছে। বাঁচতে গেলে জীবনে যা একান্ত দরকার। অবশ্যই অপরিহার্য। যে বোঝে সেই বোঝে, যে বোঝে না সে বোঝে না।

আকাশ তাহলে তাকে এখনও মনে রেখেছে। এখনও কেউ তার ধ্যান করে। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে মেঘলার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। এই চিঠি নিয়ে সে এখন কী করবে? তার সারা দেহে এখন উচ্ছল বাতাস বইছে; যে বাতাস বইত পাঁচবছর আগে, যৌবনের ঠিক প্রারম্ভে। এতদিন পরে আবার সেই হাওয়ায় সে উতলা হয়ে উঠল। মেঘলা চটপট ভেবে নেয়, এই চিঠি নিয়ে এত আনন্দ করার কিছু নেই। তার কারণ অনেক। প্রকাশ করে কি লাভ? আর করবেই বা কার কাছে!

মেঘলা আকাশের কথা ভুলতে চাইলেও, পারছে না। তার সমস্ত সত্ত্বায় যে আকাশ জড়িয়ে আছে। নিখাদ ভালোবাসার বাঁধনে সে অজান্তে কখন বাঁধা পড়েছে। বারবার মনে পড়ছে, শেষ দেখার কথা। কলেজের শেষ সেমিনারের কথা। কবিতার কথা বলতে গিয়ে সে বলেছিল, 'বুদ্ধিমান লোকে সম্পদের পাহাড় বানাতে পারেন কিন্তু কবিতা নির্মাণের জন্য হৃদয়ের স্পন্দন প্রয়োজন।' আর একবার কোথায় যেন কথায় কথায় সে নাকি মেঘলাকে বলেছিল, 'ভালোবাসার অনুভূতিগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলে প্রেম হয় না। নারীকে পণ্য হিসাবে পাওয়ার একটা অপচেষ্টা মাত্র। এই চেষ্টা আমি জীবনে কোনোদিন করিনি, করবও না। আসলে সৃষ্টি আনন্দই উপলব্ধির অনুঘটক।

মেঘলা ভাবছে তার দাম্পত্যজীবন মনের মত হল না কেন? দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনে সে অভিনন্দনের কাছ থেকে কী পেয়েছে? কিছুই পায়নি—না ভালোবাসা, না আদর। পেয়েছে আলুথালু করে দেওয়ার কষ্ট, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তার স্বামী তাকে ষোলকলায় ভরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিনরাত তাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করেছে। মেঘলা স্বামীর কাছ থেকে যেটা উপহার পেয়েছে তা হল দুটো সন্তান। মেঘলা মাঝে মাঝে ভাবে, জন্ম দিলেই কি পিতা হওয়া যায়, কিংবা মাতা? স্ত্রী কি শুধু দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর বস্তু? সংসার মানে কি শুধু ভাত-কাপড় আর ইলেকট্রিক কিংবা টেলিফোন বিল পেমেন্ট করা। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুভব আর উপলব্ধির অভাব ইথার তরঙ্গে সারা পৃথিবীকে জানান দেয়। অভিনন্দনের অবজ্ঞা, ক্ষোভ, দুঃখ, অপমান মেঘলার নরম বুকের খাঁচায় বাসা বাঁধে। দিনের

পর দিন পাশাপাশি বাস করেও সে বুঝতে পারে দুজনের সত্ত্বা ভিন্ন। তখন তার মনে হয় সংসারের মায়ায় সে এক বন্দী বলাকা। মুক্তি পেতে ডানা ঝাপটায়। সামনে জমাট অন্ধকার, মুক্তির কোন পথ নেই।

অভিনন্দন, সে তো পৃথিবীর ব্যস্ততম মানুষ। অফিসের একজন অপরিহার্য বড় কর্মকর্তা। অফিসই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। কর্মচারিরা ঠিক ঠিক এল কিনা, কজন দেরি করল, কজন অনুপস্থিত, কাকে কোথায় বসালে কাজ সুষ্ঠুভাবে উঠে যাবে—এসবই তাঁকে দেখতে হয়। শীততাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটা ঠিকমত কাজ করছে কিনা, কোনো কম্প্যুটার বিগড়েছে কিনা—এগুলোও পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে তাঁকে নাকি তদারকি করতে হয়। এছাড়াও অফিসের যাইরে আছে সভাসমিতি, আর কিছু আড্ডা। সংসারের দিকে তাকানোর তাঁর সময় কোথায়। বৈধ বিয়ে, বৌ যখন আছে, ওই-ই সব সামলে নেবে। এসব ঘটনা তো মেঘলার মনে পীড়া দেয় কি জানি না, তবে ভাবায়।

আকাশের চিঠি আঁকড়ে গাঢ় অন্ধকারের ভিতর ভালোবাসা হাতড়াতে হাতড়াতে সে মানসিক যন্ত্রণায় নীল হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে আরো কঠিন করে রুমালে চোখটা মুছে নিল। চিঠিটা ভাঁজ করে সযত্নে দেরাজের ভিতর রেখে দিল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলো মুখ থেকে সরিয়ে ফেলে। নিজেকে হাল্কা করার জন্য মনের সঙ্গে সত্ত্বার, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মেঘলার সঙ্গে আমিত্বের লড়াই শুরু করল, অজান্তে অবচেতন মনে। একটু পরে নিজেকে স্বচ্ছ ও হাল্কা বলে মনে হল। ছিমছাম গদ্যের মতো কিংবা পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের নরম কবিতার মতো মনে হচ্ছে। সুনীল সন্ধ্যায় নীলাভ শালিকের মতো মেঘলার মনে একঝলক স্মৃতির প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মেঘলা স্বগতোক্তি করল : আকাশ তো আমাকে পেতে চেয়েছিল। আমাকে তার হৃদয়ের আসনে বসাতে চেয়েছিল। আমিও তার ভালোবাসার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলাম, তাকে পেতে চেয়েছিলাম। আমার শিকল-ছেঁড়া প্রেমিক মন নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল আকাশের বুকে। তারপর কি যে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল। সামাজিক রীতিনীতি আর ধনী দরিদ্রের বিভেদটাই আমার জীবনটাকে তছনছ করে দিল। হোক না সে গরিব, নাই বা থাকুক রাজপ্রসাদ, তার তো হৃদয় আমাকে একটা আসন সুনির্দিষ্ট করেই রেখেছিল। উত্তরটা বাবার-ই দেওয়ার কথা, বাবা আজ নেই। উত্তরটা সমাজের দেওয়ার কথা, সমাজ বোবা মেয়ের মতো যন্ত্রণায় ডুকরে কাঁদছে।

মেয়েরাই নাকি ভালোবাসার কাঙাল। মেঘলাও তাই, ভালোবাসা হাতড়ে বেড়িয়েছে প্রতিমুহূর্ত, পায়নি। তার মন বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ। স্বামীকে সে এখন একটা জড়পদার্থ বলে মনে করে। আবেগ নেই, আকুতি নেই, আনন্দ নেই, অনুভূতি নেই— কয়েকদিন আগের কথা এই মুহূর্তে তাকে আরো অসহায় করে তোলে। সেদিনই তো কলিংবেলের শব্দে মেঘলা ছুটে গিয়েছিল সদর দরজায়।

দরজা খুলে স্বামীকে দেখে সে সময় যন্ত্রণা ভুলে যায়। মনে ভাবে আজ তাকে নিয়ে সারারাত গল্প করে কাটাবে। নতুন করে ভালোবাসাবাসি হবে, নতুন করে দুজনই দুজনকে আবিষ্কার করার খেলায় মাতবে। আকাশকে নিয়ে এখন আর কোন সুখের স্মৃতি রোমন্থন নয় কিংবা দুঃখও নয়। ওসব ভাবা মানে নিজেকে অসহায় করে তোলা। ওসব ভাবা মানে পাপ, দাম্পত্য জীবনের মধুর মিলনকে বিষাক্ত করে তোলা, স্বর্গীয় সুখকে বিসর্জন দেওয়া।

অভিনন্দনকে একেবারে একলা পেয়ে, কোয়েল পাখির মত একটা আওয়াজ করে মাথার খোঁপাটা ঠিকঠাক করে নিল। দু-হাত বাড়িয়ে তাকে খুব কাছে পেতে চাইল। বুকের ভিতরের প্রস্ফুটিত গোলাপটাকে আজ সে সর্বতোভাবে স্বামীকে নিবেদন করবে। অভি বলল : দাঁড়াও। অত উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। বিয়ে তো পাঁচ বছর হল, এখনও তোমার....। মেঘলা তাতেও কিছু মনে না করে বলল : এই নাও তোমার গামছা, কাপড় ছাড়ো।

—না, না। আমাকে এখনি বের হতে হবে। নন্দনে সাহিত্যসভা আছে। অভিনন্দন খুব দ্রুত কথাগুলো বলছিল। আরো বলল—মন্ত্রী আসবে, কবিসাহিত্যিকরাও আসবে। আমার ফিরতে একটু রাত হবে। বেশি দেরি হলে তোমরা খেয়ে শুয়ে পড়বে। কিছু মনে করো না।

ঠিক সেইদিনই মেঘলার সমস্ত চিন্তা তাসের ঘরের মত হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল। তার যে আর মনে করার মত কিছু নেই সে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারল। বুঝতে পারল কোন সুবাসিত ভালোবাসা আজ তার অনুভূতির রাজ্যে জোয়ার আনতে পারবে না। ঘরের কোণের জীর্ণ আরাম কেদারায় ধপাস করে বসে পড়ল মেঘলা। ডুকরে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে সে হঠাৎ কান্না থামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, এ কান্না তার মানায় না। তাকে আরো দৃঢ় হতে হবে, আরো কঠিন হতে হবে—ইস্পাত কঠিন। একটা বিক্ষুব্ধ চেতনায় সে যেন বিদ্রোহিনী হয়ে ওঠে। পাশে লম্বা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেই যেন চিনতে পারছে না। তবুও চিবুক শক্ত করে প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পুরুষরাই এরকম হয়। ভোগতৃপ্তির কোন নির্দিষ্ট মাত্রা তাদের অভিধানে নেই। এটা তো গোটা দেশের চিত্র, সমাজের চিত্র।' হয়তো নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এসব কথার অবতারণা।

স্মৃতি সবসময় তো প্রতারণা করে না। কলেজ পালিয়ে ডুংলু নদীর তীর বরাবর পড়ন্ত বিকেলে পায়ে পায়ে হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় গায়ে গা লাগানো, চোখে চোখে গোপন ভাষায় দুষ্টুমির কথা বলা—এসবই তো মেঘলার পরিষ্কার মনে পড়ছে। তাই তো বাধার পাহাড় ঠেলে সে আকাশের কাছে ধরা দিতে চায়। ডুংলুর ধারে হেলে পড়া পাকুড়ের মোটা শিকড়ে বসে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে মেঘলা বলেছিল—'ছেলেরাই মেয়েদের শরীরকে পেতে চায় নিছক আনন্দ করার জন্য। ভালোবাসা দিতে জানে না।' উত্তরে আকাশ বলেছিল —'শাড়ি খুললেও তোমাকে দেখতে পাব না। আর কখন চাইবও না। কারণ আমি জানি একজন মেয়ের শরীর ছাড়া আর অনেক কিছুই থাকে যা দিয়ে তাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়।

তোমার মধ্যে সে দুর্লভ গুণের সন্ধান আমি পেয়েছি, অনেক পেয়েছি। তারপর বলল—তুমি তো আর পাঁচজনের মতো নও। সাধারণের থেকে অসাধারণ, একটু আলাদা, অন্যরকম। তোমাকে যে পাত্রেই রাখা হবে সেই পাত্রের আকার ধারণ করবে তুমি। মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তোমার অসীম। তাই তুমি আমার কাছে অবশ্যই এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা।

যাই হোক, এসব কথা চিন্তা করতে করতে মেঘলা বাথরুমে ঢোকে। চোখে জল ছিটিয়ে নিজেকে একটু তরজাতা করে। দেরাজ থেকে আকাশের সাদা খাম বের করে ফেলল, বুকে চেপে ধরে একান্ত হতে চাইল। হয়তোবা চিঠির ভেতর আকাশের রামধনু রঙা মুখ দেখতে পেয়েছে। এটাই হয়তো তার দাম্পত্য কলহের বীজ হিসাবে জীবনের মাটিতে সযত্নে চারিয়ে দিল।

আকাশের মাঝে মেঘলা আবার নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চাইল। তাই চিঠিটা শেষবারের মতো খুলে প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। আর চিঠিটাকে কাঁপা কাঁপা দু-ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরে 'আকাশ-আকাশ' শব্দে নিজেকে ছড়িয়ে দিল, নির্মল আকাশে নিজেকে হারিয়ে ফেলল, মনে হল আকাশকে সে যদি সামনে পায়, সমস্ত বাধা ঠেলে, স্ত্রী না হোক বন্ধুর অধিকারে তার দু-বাহুর মধ্যে বাঁধা পড়বে। মাতাল ভালোবাসার মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়ে, একটা রাতের জন্য হলেও, সে অন্যায় করতে পারবে কিনা, চিঠি আঁকড়ে ভাবতে লাগল মেঘলা।

কে চোর? বলতো খুকি

অনুষঙ্গ ঠাকুর

আজ অনেক তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে গেল। তখনও পুব আকাশে লাল মোহিনী রঙ লাগেনি। মোরগ ডাকছিল দু'একটা। খালের ওপার থেকে ভেসে আসছে মাছের কাঁটার ডাকের আওয়াজ। ঘরের পেছনে ধুপধাপ শব্দ—বোঝা যাচ্ছে প্রথম ট্রেন ধরার তাড়া—কারখানায় যারা কাজ করে, কিংবা সব্জির দোকানদার; যারা বইঠকখানা বাজার থেকে ভোর ভোর সবজি আনতে যায়। ফুলওয়ালা নাটমন্দিরে খুটখাট আওয়াজ করছে, সে খুব গরীব—রাতের বেলায় হাওড়া ফুলবাজার থেকে ফুল নিয়ে এসে কিষাণ বাজারে বেচে, এখানে বিনে পয়সায় থাকে—রাধাগোবিন্দ মন্দিরে ফুল বিনে পয়সায় দেয়। আর মন্দিরের চৌহদ্দিতে একটা ভাঙাচোরা একটা ঘরে চারটে প্রাণী দুটো চৌকিতে যেন পিছমোড়ার মতো বাস করে। গ্রাম থেকে এসেছে—পড়াশোনার তাগিদে। বাইরে তখনও মশারির সঙ্ঘারামে মশারা আনন্দে আটখানা।

এপাশ ওপাশ করতে করতে পিন্টু উঠে বসল। মশার কামড় থেকে বাঁচতে বেরোবে কিনা ভাবছে—দোটানায়। শিকারের নেশায় বুঁদ—ডেঙ্গু আরো অনেকে। খেয়ে পরে তো বাঁচতে হবে। এ জগতে সবাই তো বাঁচতে চায়। অথচ এই বাঁচতে চাওয়ার মধ্যে কখনো সখনো অপরাধও জন্ম নেয়। মশারির ভেতরে নাক ডাকছে আশোক। সারাদিন টো টো করে টিউশানি পড়ায়—গরীব ছেলে, ভাই আর নিজের খরচ খরচা জোগাড় করতে হয়। ডাক্তারি পড়াটা অনটনে শিকেয় উঠেছে। ভাই বাংলায় অনার্স পড়ে। আর দিব্যেন্দু একটু স্বচ্ছল বাড়ির—পড়ে পি. জি. হাসপাতালে। এই মন্দির মেসে নাকি পড়াশোনা ভালো হয়, প্রায় সবাই পর পর চাকরি পেয়ে অন্যত্র বাসা নেয়। তাই দিব্যেন্দুও। অনেক জায়গা—নাটমন্দিরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়া যায়, নিরিবিলি-শান্ত পরিবেশ। বাপি ধড়ফড় করে উঠে দেখে পিন্টুদা, মেসের ম্যানেজার বসে আছে, পাশেই। মশা কাটছে, হুঁশ নেই।

—কী হল দাদা?

আরে বুড়ি মাসি তো তিনদিন হয়ে গেল, আসছেন না। ভাবছি যাব।

—এই ঝুঁঝরো বেলা? আর একটু শোয়।

ধপ্ করে শব্দ হল, খবরের কাগজ দরজায়। পিন্টুদা বাইরে বেরোয়, সাথে বাপিও। নাটমন্দিরে সবে আলো এসে পড়ছে। খবরের কাগজে একটু চোখ বুলিয়ে পিন্টুদা বলে, বাপি আমি আসছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে লোকে কেবলই ছুটছে, সব হাভাতে মানুষ, শ্রমিক, মুটে মজুর, কেউ কেউ পড়ি মরি করে ছুটছে, ট্রেনটা ছেড়ে গেল বলে। সবজি ব্যাপারিরা বস্তার চট খুলে দোকান সাজাচ্ছে। মাছের বাজারে কেবল দোকানদার—একটাও খদ্দের তখনো আসেনি। দেখে যে কালু সারারাত ঘেউ ঘেউ করে সজাগ করে সবাইকে, সে নিশ্চিন্তে ঘুম

ধরেছে। কত নিরাপদে রাখে মানব সভ্যতাকে। যেন দেশের বি. এস. এফ., অথচ পারিশ্রমিক বলতে উচ্ছিষ্ট ভাত অথবা ছেঁড়া রুটি। আদি গঙ্গায় জোয়ার এসেছে। ভেসে এসেছে কত কী, সেই কালীঘাট হয়ে কালো কালো জল—গন্ধ ছড়ায়, কত আবর্জনা বুকে বয়ে আনে, কখনো কখনো মৃত গবাদি পশু, কুকুর ইত্যাদি। কিছুটা যাওয়ার পর দেখে কিছু মানুষের জটলা। পথচলতি লোক একটু দাঁড়ায় আবার ট্রেন ধরতে দৌড় দেয়। আজ আদি গঙ্গায় ভেসে এসেছে একটা লাশ। পরনে শাড়ি, মুখটা জলের গভীরে লুকিয়ে, উপুড় হয়ে ভাসছে। হাজার কলঙ্কেও চাঁদের লজ্জা হয় না। এ মেয়েটার কত লজ্জা, মুখ দেখাতে চায়নি। মুখ লুকিয়ে ঘাড় গুঁজে নোংরা জল মেখে চিরঘুমে মগ্ন।

অনেকের মতো পিন্টুও দেখে, চেনার চেষ্টা করে, এই এলাকার কেউ নাতো? কেন না, গড়িয়ার খবর দুনিয়া জানে, খাল-গড়িয়ায় প্রায়শই দেখা যায় বাইরে থেকে লোক মার্ডার করে এখানে ফেলে যায়। তাই অভ্যস্ত এখানকার লোক। ভিড় হয়, আবার খালি হয়। পুলিশ আসবে। তারপর খবর হবে। অনেকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে পিন্টু এগিয়ে যায় ঢালুয়ার দিকে। বুড়ি মাসি এদিকেই থাকে। আদি গঙ্গা বয়ে চলেছে ঢালুয়া হয়ে গঙ্গাজোয়ারার দিকে। বুকে কত কষ্ট। তার পাড় ধরে চলেছে পিন্টু। তার মনে পড়ে—মাসির কথা। প্রায় দশ বছর হল বুড়ি মাসি রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। প্রতিদিন সকালে বিকেলে। সকালে ঢুকেই, ও খোকা আজ কী আন্না হবে? তোরা কী করে এক আন্না খাস? সেই বাড়ি থেকে যে আনা ডিম, খেসারির ডাল। এট্টু বাজারে যেতি পারিস না। আমি না হয় গরীব.....তোরা?

কী রে খোকা আজ শুয়ে আছিস? জ্বর বুঝি? অশোকটা পড়াতে গেছে?

মাথায় জলপট্টি দিয়ে কতবার আদর করেছে মাসি। ভাবতে ভাবতে কালীমন্দির মোড়ে পৌঁছে গেছে। দেখে স্থানীয় বিধায়ক মর্ণিং ওয়াকে বেরিয়ে জন-সম্পর্ক বাড়াচ্ছে। তাকে ঘিরে কতলোক। অথচ খালের জলে ভাসছে যে মেয়েটা, যার ভোটাধিকার আর নেই। কিংবা কেউ প্রক্সি দিয়ে দেবে—তার কথা কেউ ভাবছে না। পিন্টু এগিয়ে যায়। জিতেন ডাক্তারের পুকুর পাড়ে লম্বা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন থাকার একটা মেস আছে। সেই পুকুর পাড় বেরিয়ে দেবুদার বস্তি। সেখানে থাকে বুড়ি মাসি। বুড়ি মাসি বলতো, পুন্ন কত গরীব ছেল, বেধায়ক হয়ে দুদিনেই আজা। চিনতে পারে না।

বুড়ি মাসি বেঁটে খাটো মানুষ। মায়ের মতো মমতা মাখানো। যখন রান্না শুরু করেছিল, তখন বেশ শুঠাম ছিল, তারপর হঠাৎ যেন ভেঙে পড়েছিল তাঁর শরীর, গায়ে সাবান দেওয়ার সামর্থ না থাকলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গরীব হলেও কোথায় যেন আভিজাত্য লুকানো ছিল। একটা ছেলে ছিল। সে নাকি রেললাইনের বস্তির একটা বেবাহিত মেয়ের সঙ্গে পেইলেছে। খুব দুঃখ মাসির। সব গল্প করে পিন্টুর কাছে। মনের অজান্তে পিন্টু কখন যে মাসির খোকা হয়ে গেছে সে জানতেই পারেনি। দরমার ঘর। দরমার দরজা। পিন্টু ধাক্কা দেয়—ও মাসি, মাসি। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। দরজার ফাঁক দিয়ে পিন্টু দেখার চেষ্টা করে।

পাশ থেকে বেরিয়ে এল মমতা, ফুটফুটে এক কিশোরী। ভাঙা ঘরে যেন চাঁদের

আলো। চোখ ফেরাতে পারেনা পিন্টু।

—কী গো, কাকে ডাকছ? মাসি?

হ্যাঁ, এখানে বুড়ি মাসি থাকেন না?

হ্যাঁ, কদিন থেকে মাসিকে দেখতে পাইনি। যাদের বাড়ি বাড়ি মাসি কাজ করে সবাই ডেকে ডেকে ফিরে যাচ্ছে। তুমি কে?

আমি? আমি...আমতা আমতা করে পিন্টু, বলতে পারেনি যে, সে মাসির পাতানো খোকা, কিংবা বলতে পারেনি যে মাসি তাদের মেসে রান্না করেন। পিন্টু ফিরে যেতে যেতে পেছন ফিরে বলে, আচ্ছা তুমি মাসি এলে বলো, মাসি তোমার খোকা পিন্টু এসেছিল।

—ও, তুমি পিন্টু?

—কেন?

মাসি কদিন যেন আপন মনে বিড় বিড় করছিল, না রে পিন্টু আমি চুরি করিনি।

—মাসি কি তোমার টাকা চুরি করেছিল?

—কই নাতো।

পিন্টু ধীরে ধীরে পিছন ফেরে। আনমনা হয়ে যায়। অপরাধবোধ কুরে কুরে খেতে থাকে। মমতা আবার বলে,

—তোমরা মাসিকে তাইড়েছ কেন?

—না তো। মাসি তিনদিন যায়নি বলেই, ডাকতে এসেছিলাম। তোমাকে কথাটা বলেই ফেলি। মনের মধ্যে আর আটকে রাখতে পারছি না।

গত বুধবার প্রতিদিনের মতো আমি দরজার ফাঁকে চাবিটা রেখে কলেজ গিয়েছিলাম। একটু তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যায়। টিউশান পড়ানোর ফাঁকে সময় ছিল। মেসে ফিরে আমি ঘরে ঢুকি, দেখি কোনো বাজার নেই। বাক্স খুলে টাকা নিয়ে বাজারে গেলাম। চাবিটা ঠিক তেমনই রাখি। মাসি যেমনভাবে এসে দরজা খুলে রান্না করেন, সেদিনও মাসি এসেছিলেন। স্টোভে ভাত চড়িয়েছিলেন। ভুল করে আমি বাক্সে চাবি দিই'নি। মাছ কিনে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি। সাধারণত বিকেলে কেউ থাকে না, দিব্যেন্দু আসে দেরিতে, অশোক পড়াতে যায়। আর বাপির ইভিনিং কলেজ। যখন মাছ কিনছি, তখন আমার ছাত্রীর বাবার সঙ্গে দেখা। বলে শাশ্বতীর জ্বর, মাষ্টারমশাই আজ আসার দরকার নেই। আমি নিশ্চিন্ত মনে মেসে ফিরে আসি—দেখি—মাসি বাক্স খুলে যা দু-চারটাকা ছিল, সব মিলিয়ে দু'তিনশোর মতো হবে, গুনছে মাসি। আমি হতবাক। আমি কিচ্ছু বলিনি।

—অ, খোকা কী হয়ে গেল! অ, খোকা কী হয়ে গেল বলতো।

আমি নিরুত্তর ছিলাম।

হাঁড়ির চাল ফুটতে ফুটতে উপচে পড়ে, সেটাও নিভে যায়।

মাসি বলে,

—ও খোকা আমার শরীল খারাপ নাগছে, চলে যান।

তারপর আর আসেননি।

পিন্টু পিছুটান নেয়। মমতা নিশ্চল। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে খোকা পথ চলে, যেন পথই টালমাটাল। কুচিন্তা তার মাথা খেয়ে ফেলছে। মমতা খেয়াল করে, মা আর খোকার সম্পর্কের চোরাস্রোতে বালি জমছে। মনে পড়ছে আজকের খবরের শিরোনাম—'পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় লালুর জামিন'। এদের কোনো শরম নেই। আদি গঙ্গা দূষিত করে কারোর লজ্জা হয় না। কেউ দু'দিনেই বড়লোক হয়—পাপের কোনো অনুশোচনা নেই। তোমার তো কোনো দোষ নেই মাসি। সারাটা রাস্তা সোনালি রোদে ঝলমল করলেও পিন্টু যেন চোখে আঁধার দেখে। কত বড় বড় চোর দেশটাকে চুরি করেও জামিন পায়, রাজা হয়। আর মাসি তো নিজের ছেলের সম্পদে যেন হাত দিয়েছিলো। সকালের মিঠে রোদ তেতো লাগে। পিন্টু আর ঘরে ফিরতে পারে না—চলার পথ আর যেন শেষ হয় না। সে আর খোঁজ নেয় না আদি গঙ্গার জলে ভাসমান সে লাশ কার? মুহূর্তের মধ্যে অনন্তজীবনের রহস্যে সে উদাসীন হয়ে যায়। মানব সংসারের তুচ্ছ বেদনায় অপরিসীম বিস্ময় আর সংকেতে দিশাহীন। পথ যেন হাসে—তার মুর্খতা দেখে। এমন কত মৃত্যু স্বভাবিক সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে বিলীন হয়—তার হিসাব কে মেলাবে? অনন্ত কাল ধরে চলেছে এই যাওয়া-আসা। সেখানে একটা সামান্য মৃত্যু, সামান্য অপরাধ—যা অবশেষে সংঘটিত হয়নি। তার মর্মবেদনার সুর বীণার তারে যেন ঝংকার তোলে। কী যায় আসে—না, সে উপেক্ষা করতে পারেনি। চলবে এমনভাবে জীবন যার জোর আছে, কপটতা আছে—আর আছে চতুর হওয়ার প্রাণশক্তি, হয়ে উঠতে পারবে অমানবিক যন্ত্রদানব; সেই হয়তো টিকবে এ গণতন্ত্রের তন্ত্র ছুঁয়ে।

মিনির রবীন্দ্রনাথ

সাহানারা খাতুন

মায়ের কোলের কাছে শুয়ে শুয়ে প্রথম চিনেছি রবিঠাকুরকে। রোজ রাতে ঘুম পাড়ানি গান ছিল "বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা।" কিংবা "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।" এভাবে কবিকে নিয়ে কখন যে বড় হয়ে উঠেছি তা অনুভব করার অবকাশ ছিল না। সেই নার্সারি থেকে আজ কলেজ সবেতেই প্রকাশ্যে ছিল আমার রবীন্দ্রনাথ। শৈশবে "আয় আয় চাঁদ মামা, 'আয় রে আয় টিয়ে', তারপর 'দামোদর শেঠ' বাল্যে সমব্যথী, সদ্য কৈশোরে 'দুই বিঘা জমি' পূর্ণ কৈশোরে 'একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু' তারপর 'হারিয়ে যাওয়া', কৃপণ, গীতাঞ্জলী একের পর এক রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমাকে সিঁড়ির পথ হয়ে আজ আমিতে পরিণত করেছে।

সবসময় মনে হতো আমার রবীন্দ্রনাথ, আমার মা হেসে বলতেন "দুর বোকা! অন্ধকার সরুগলিতেও রবি আলো ছড়ায়" তাই রবীন্দ্রনাথ কারও একার নয়, রবীন্দ্রনাথ সবার। আমার এই প্রবণতা মাকে বেশ আনন্দ দিত বুঝতাম। তাই আমার এক জন্মদিনে স্কুল থেকে ফিরে দেখলাম আমার ঘরটির চার দেওয়াল ভরা রবীন্দ্রনাথ। আমার ঠাকুর। মা নিজ হাতে রবিঠাকুরের ছবি দিয়ে সাজিয়েছেন। সে বছর ওটাই ছিল আমার সেরা উপহার। স্কুলের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে প্রতি বছর মা আমাকে পরিয়ে দিতেন লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। কি যে ভালো লাগত আমার! এমনি এক পঁচিশে বৈশাখে স্কুল যাবার পথে দেখলাম বাস স্টপেজে সাদা ধবধবে এক বেদি ঘিরে ভিড় করা কত মানুষ। কাছে গিয়ে দেখলাম খুব বড় একটি রবীন্দ্রনাথের মূর্তি। খুব আনন্দ পেলাম। মন ভরে গেল আমার। পাড়ার রাস্তা শেষ করে বাস স্টপেজে পা রাখলেই মন্দিরের ঠিক পাশেই আমার ঠাকুরকে বসানো হয়েছে।

স্কুল যাবার পথে রোজ প্রথমে গিয়ে দাঁড়াতাম তাঁর কাছে। তারপর প্রণাম জানিয়ে বাসে উঠতাম। দু-একদিন যেতে না যেতেই লক্ষ্য করলাম তাঁর গলার মালাটা প্রায় শুকনো। মনে মনে ভাবতাম মন্দিরে কত ভক্ত আসে প্রতিদিন। সাজানো কত ফুল দোকান। হয়তো একদিন ঠিক বদলে যাবে ওই শুকনো মালা। কিন্তু প্রতিদিন হতাশ আর হতাশ হতাম আমি। ধীরে ধীরে সেই মালা শুকনো হয়ে ঝরে পড়ল একদিন। মানবতা যেখানে নীরব, সেখান থেকে শুরু হল আমার পথ চলা। আমার টিফিন বাঁচানো টাকা দিয়ে কিনলাম এক রজনীগন্ধার মালা। গলায় পরানো মাত্র আমার রবিঠাকুর যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। আমি স্পষ্ট বুঝলাম তাঁর ইঙ্গিত। সাক্ষী হল শুধু আরও এক জোড়া চোখ। মদিরের পাশে বসে থাকা ভিখারির সেই ছোট্ট মেয়ে মিনি। এসব কিছুর অর্থ বোঝায় অনেক আগে থেকেই সে শুধু শিখেছিল মন্দিরে আসা ভক্তদের সামনে কীভাবে বাটিটা তুলে ধরে ভিক্ষা চাইতে হয়। সকাল বিকাল তাই ছিল তার জগৎ। একদিন অথবা দুদিন টিফিনে না খেলেই জোগাড় হয়ে যেত আমার রবি ঠাকুরের মালা। প্রতিবার মালা দিয়ে যখন প্রণাম করতাম খুব মন দিয়ে

Vol. IV Issue-VII / ISSN : 2394-4889

দেখত মিনি। এইভাবে কেটে গেল আরও কয়েকবছর। অবশেষে বারো ক্লাসের শেষ পরীক্ষা দিয়ে আমার কলেজে আসার দিন উপস্থিত হল। সেই প্রথমবার চোখে জল এল আমার। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। রবীন্দ্রনাথের মূর্তির পাদদেশে গিয়ে প্রণাম করলাম আর মালা পরাতে গিয়ে মনে হল এ মালাটাও শুকনো হবে একদিন।

কলেজের হোস্টেলে এসে খুব মনে পড়ত আমার সাজানো সেই বাস স্টপেজ, জাগ্রত মন্দির, সামনে বসে থাকা ভিখারি, পাশে সারি সারি দোকানে সাজানো জবা, গাঁদা, রজনীগন্ধা। মিনি আর আমার শুকনো মালা পরা রবীন্দ্রনাথ! হঠাৎ একদিন কলেজের ক্যান্টিনে হাতে পেলাম দৈনিক সংবাদপত্র, চমকে উঠলাম আমি। এতো আমাদের বাসস্টপেজের মিনির ছবি। চুরির দায়ে গণপিটুনিতে গুরুতর আহত শিশু ভিখারি। খবরটা পড়ে আর স্থির থাকতে পারলাম না। ঝড়ের বেগে কলেজ থেকে বেরিয়ে পালাম। বাড়িতে ফেরার আগেই ছুটে গেলাম মন্দিরের পাশের বস্তিতে মিনিদের বাড়ি। ঘরে ঢুকে দেখলাম অচৈতন্য মিনি! মাথায় রক্ত মাখা ব্যাণ্ডেজ। শরীরে তখনও কালসিটে দাগ মেলায়নি! বিছানার সাথে মিশে আছে মিনি! আমার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল হৃদয়ে।

মিনির মায়ের মুখের সবটা শুনে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এলাম আমি। ওতো কখনো মায়ের পাশে শুয়ে রবিঠাকুরের কথা শোনেনি, ওতো কখনো রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়নি, ওতো কখনো মঞ্চে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলেনি! তাহলে? এতো ভক্তি এলো কোথা থেকে। ও শুধু রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পরাতে দেখেছে। তাই কি তাঁর গলায় একটা মালা পরাবে বলে ও চুরি করতে গিয়েছিল! না না টাকা নয়, একটা মাত্র রজনীগন্ধার মালা!

কবি মূর্তির কাছে এসে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করলাম হে কবি! মিনিকে তুমি আর্শীবাদ করো। কেউ না শুনুক তুমি শুনো! তোমার দেশে এখনও এমন মিনি জন্মায় যাদের হাতে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পরিবর্তে রোজ সকাল বিকাল থাকে ভিক্ষার বাটি। অথচ কারোর সাধ না জাগুক, দুবেলা খেতে না পাওয়া একমাত্র সেই মিনির সাধ হয় দেখতে তোমার গলায় একটা তাজা রজনীগন্ধার মালা!

সেদিনের পর উদার মনে অনুভব করলাম—"রবীন্দ্রনাথ শুধু আমার নয়—মিনিরও"।

ফেক্‌বুক্-ফেক্-লভ্-ফেক সোসাইটি

মদনচন্দ্র করণ বিদ্যালঙ্কার

সাকিনাকে ভোলা খুব কঠিন তারপক্ষে সেটা বুঝে রাতুল তিন দিন চুপ চাপ থেকে ধীরে ধীরে হাতেম সেখের ঘরের দিকে পা বাড়ালো। চৌধুরী পাড়ার মাতব্বররা তুচ্ছ কারণে হাতেম সেখকে গাঁ ছাড়া করেছে। ভাবতে বিষয়টা রাতুলের গা ঝিম্ ঝিম্-রিম্ রিম্ করে। সেদিন ছিলো শীতের বিকাল হ্যাংলাহুলোর চক-রাস্তার নাক বরাবর চ্যাংদোলা বাজার ছিলো দাঙ্গাটার আগে। ওই বাজারের শিথেন বরাবর ছিলো গাজী আর মিদ্দের গুষ্টির গড়া জামে মসজিদ। মসজিদের পিছনে আছে সোঁদর বনের অখ্যাত আনামা এক নদী। স্থানীয় লোকজন নাম দিয়েছেন দায়টা নদী। দরিয়ায় দু'কুল ভরা জল আর ঊর্বশীর অনন্ত যৌবনের মতো স্রোতের বেগ। বালিহাঁস, গাঙচিল, আলতিপাকি, চলবক, কুঁজবক ইত্যাদি নানা পাখি এই নদীর মাছ আর পোকার খেয়ে জীবন রক্ষা করে।

তেমনি করেই সেখপাড়া, দলুইপাড়া, গাজীপাড়া, জোলা পাড়া, নিকিরিপাড়ার তামাম গরীব মানুষের কেউ মাছ ধরে, কেউ খেয়া বেয়ে, কেউ জেলের জাল, আঁটল, ঢোছনা বুনে কেউবা নদীর চরের বাজারে ধান, চাউল, সব্জী, আলু-পটল বাঁশ, টিন, অ্যাসবেষ্টস, চুন, বালি, টালি—খড়ের ব্যবসা করে জীবিকা করে। কী-হিন্দু কী মুসলমান একে অপরের ভাই-ভাই হিসাবে সুখে দুখে বাস করছিল। আর চ্যাদোলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রাতুল আর সাকিনার প্রেম চলছিল। তারা পরস্পরকে কথা দিয়েছিল রাতুল থাকবে বৈষ্ণব আর সাকিনা থাকবে শেষ নবির পথের অনুসারি। কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ না করে ভারতের সুন্দরতম পরিবার সৃষ্টি করে তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলে। কিন্তু, কিন্তু.....

"হঠাৎ দেশে উঠলো আওয়াজ
হো হো হো.....
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে
দাঙ্গা বিদ্রোহ
নিরীহ বেচারা গরীব মুসলিম্ চাষা ভুষা,
জেলে-নিকিরী-বেপারী মানুষ গুলোর
হলো কী? বাঁটি-কাটারী, লাঠি-শোঠা
নিয়ে কেন দৌড়চ্ছে?
রাতুল খবর পেয়েছে সাকিনার কাছ থেকে—
কী সেই খবর?
—ফেস্‌বুক।

হাতেম শেখের পরিবার ওস্বজনবরা চৌধুরীদের তুলনায় কোনো অংশে শিক্ষায় পিছিয়ে নেই। এগাঁয়ের চৌধুরীরা জাতিতে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, আর বাংলার শেখেরা তো পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়,

 Vol. IV Issue-VII / ISSN : 2394-4889

তথা চলতি কথায় পোদ্ জাতিরই ধর্মান্তরিত অংশ। মুসর্লমান শাসনে পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় জাতির যে অংশটি রাজনৈতিক ফায়দা নিতে মুসলমান হয়েছিল, বাংলা শেখরা তার বড়ো অংশ।

শেখ হাতেম্, চৌধুরী পাড়াকে, নিকিরী পাড়াকে, শেখ পাড়াকে তকবীর করে বুঝিয়েছেন যে—মহানবীকে হিন্দা নামক ইহুদী বুড়ি কত অপমান করেছেন। কিন্তু নাতো রুসল আল্লাহ প্রেরিত নবী হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করেন নি। বরং ঐ ইহুদী বুড়ির জ্বর হলে তার খিদমত করে—সেবা করে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটান। মহানবী-বলেছেন—ইন্‌নামাল মুমিনুনো ইখ্‌ওয়াতুন—কিন্তু, চৌধুরীরা হিন্দু-মৌলবাদের প্রচারক। আর গাজী গুষ্টির ছেলেপিলে চৌধুরীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে হ্যাংলা-ভোলা—চ্যাংদোলা আঞ্চলের মৎস্যভেড়ি তথা জল-খরগুলির মালিকানা চায়, কারবারে মূলধনী হতে চায় আর গুচ্ছমূল-দলে প্রতিপত্তি করতে চায় ফেক্‌বুক? না ফেসবুক? কারও কী সাধ্য আছে মহানবীর অপমান করতে পারেন? মহানবী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানীয়দের অন্যতম। মানবাধিকার এবং মানবতাবাদের দৃষ্টিতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানীয় আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ। তবুও স্বার্থের জন্য গাজী আর চৌধুরীদের ইঙ্গিতে ছয়দিন দাঙ্গা চললো। মৃত্যু হলো খগেন দাস, খবিরআলী আর গজেন মণ্ডলের। অনেক ঘরবাড়ি, সম্পত্তি ধ্বংস হলো, অবশেষে শান্তি মিছিল। হাতেম দু'চোখ ভরে দেখছেন—চৌধুরীরা আর গাজীয়া হাত ধরাধরি করে নজুরুলের গান-আর কবিতা গেয়ে মিছিল বের করেছে। রাতুলের নামে এফ আই-আর-তে, তাকে দাঙ্গাবাজ লিখে জেলে পাঠানো হয়েছে। হাতেম্ শেখ, স্বয়ং গাঁ ছাড়া আরও অনেক শান্তিপ্রিয় মানুষকে জেলে পাঠানো হয়েছে। সাকিনা নীরবে চোখের জল ফেলছে?

এখন আগের মতোই গাঙচিল, কাক-বক, নদী-হাট সব আছে। কিন্তু। একে অপরের সাথে প্রীতিবন্ধন আর বিশ্বাসটুকু শুধু নেই।

এই বিশ্বাসের কালো সামিয়ানার নীচে গুচ্ছমূল দলের কর্মীরা কবি নজরুল আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যুগল মূর্তি স্থাপন করেছে চ্যাংদোলা হাটে। যা হাজার-সাকিনা-রাতুলকে ফেসবুক—ফেক্‌বুক আর ফেক্‌লীভ-এর তফাৎ শিখাচ্ছে।

প্রবন্ধ

যাযাবর জাতির জীবন কথা

শচীন্দ্রনাথ বালা

অতি প্রাচীন কাল থেকে জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে আদিম মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে জীবনজন্তু, পশু-পাখি শিকার করে জীবন যাপন করত। স্থায়ী ঘর-বাড়ি তাদের ছিল না। এদের যাযাবর বলা হত। এদের বৃত্তিটাকে বলা হত যাযাবর-বৃত্তি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় বহুশত বছর আগে আর্যরা মঙ্গোলিয়া, চীন বা ওই রকম কোনো এক জায়গা থেকে ঘুরতে ঘুরতে ভারতে প্রবেশ করে। তারা যাযাবর ছিল। ভারতবর্ষে বহিরাগত তারা। ভারতবর্ষীয়দের তারা অনার্য বলত। কালক্রমে এদেশের প্রধান হয়ে গেল। তখনকার দিনের নগর বন্দর সমস্ত তাদের হাতে গেল। অনার্যরা দূরে সরে গেল। শাসক হল আর্যরা। ধীরে ধীরে আর্যরা ভারতীয় হয়ে গেল। তারপর আর্য-অনার্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। এখন সকলেই ভারতবাসী। তারপর রাজপট পরিবর্তন হয়েছে বারবার। এসেছে তুর্কী, ইরাণী, আফগান, পাঠান, মোঘল। এদেরকে হটিয়ে দিয়ে এসেছে পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ। কালের নিয়মে তাদেরও বিদায় ঘটেছে। এখন এদেশের শাসন ভার এদেশেরই মানুষের হাতে। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, পেশা বা বৃত্তি এবং মানসিকতার পরিবর্তন হতে হতে এখন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্ভর যুগে এসে ঠেকেছি আমরা। কিন্তু এখনো ভারতবর্ষ শুধু নয়, পৃথিবীর বহু জায়গায় বেশ কিছু গোষ্ঠী মানুষ সেই পুরাতন আদিম যুগের যাযাবর বৃত্তি প্রথা মেনে জীবন-যাপন করছে। এত আধুনিক চাকচিক্য জীবনযাত্রার আলোকমালার মধ্যে থেকেও তারা অন্ধকারই দেখতে পায়। ঠিক সদ্য ভূমিষ্ঠ পক্ষিছানার মতো। যারা শতশত বছরের বৃত্তিবলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি, আসার চেষ্টাও করেনি; সেই আদিম যুগের যাযাবর বৃত্তিকে এখনো আঁকড়ে ধরে জীবনযাপন করছে, তাদেরই একটা গোষ্ঠী পাখ্‌মারা সম্প্রদায় তথা পাখিমারা সম্প্রদায়। এই পাখমারা সম্প্রদায়েরই কতকগুলো দৈনন্দিন চলমান জীবন ছবি বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হবে।

একদিন বিকেল বেলা পঁচিশ-তিরিশ জনের একটি দল কালীঠাকুরপুর মাঠের উত্তর পাশে আমবাগান ঘেঁষে তাদের মোট মাটালি রাখল। এদলে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, বাচ্চা-কাচ্চা, কোলের শিশু, নবদম্পতি সবই রয়েছে। এই দলে রয়েছে আবার পাঁচ-ছয়টি পরিবার। প্রত্যেক পরিবার আলাদা আলাদা তাঁবু বা মাদুর বা চট নিচে পেতেছে। পাশে এদিক ওদিক থেকে ভাঙা ইঁট কুড়িয়ে এনে পাশে পাঁচ-ছয়টি উনুন বানিয়েছে। তবে এরা মাথার উপরে তাঁবু খাটালো না। জানা গেল পাখমারা সম্প্রদায়ের আদি বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুড় পাহাড়ের কোলে। এদের কুর্মি সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে। এরা নিম্নশ্রেণির যাযাবর। এরা খোলা আকাশের নিচেই থাকে। মাথার উপরে তাঁবু টাঙায়

না। ঝড়বৃষ্টি হলে আশে পাশের মানুষের বারান্দায় কিংবা সরকারি ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজের পড়ে থাকা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদের পরণের জামা কাপড় খুবই নোংরা, উস্‌কো খুস্‌কো চুল, তেল, চিরুণি, সাবান পড়ে বলে মনে হয় না। শুধু বড়োদের নয়, ছোটো ছোটো কোলের শিশুদের অবস্থাও তাই। তাদের অযত্নের শেষ নেই। গায়ে জামা প্যান্ট নেই, গা-গতর-চুল খুবই অপরিষ্কার। ঠিকমতো খেতে পায় বলেও মনে হয় না। গায়ের রং প্রত্যেকেরই কালো, কারো কারো ছাই রং-এর। অযত্নের জন্য, অপুষ্টির জন্য এবং সারাদিন রোদে রোদে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোর জন্য এদের এই চেহারা। দল বেঁধে কিছুদিন এখানে কিছুদিন ওখানে ঘুরে ঘুরে দিন যাপন করে। এদের পূল জীবিকা পাখি শিকার করা। তাছাড়া মেয়েরা, মহিলারা ছোটো ছোটো কোলের শিশু কোলে করে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। কেউ কেউ গাছ-গাছড়ার, জরি বটি বিক্রি করে। এথেকে যা পায় তাই দিয়েই সংসার চালায়। এদের পুরুষদের নাম যেমন ভোলা পাহাড়ী, রবি পাহাড়ীর নাম, দাতিয়া, হারুয়া, লালকোম, রচিয়া, পাচুয়া, বাচাধন, ভাকু প্রভৃতি; মেয়েদের নাম পাখা, চামেলি, দালালি, ভূতনি, ধনিয়া প্রভৃতি।

এরা এক একটা জায়গায় কুড়ি দিন, পঁচিশ দিন বড়ো জোর এক মাস থাকে। আবার অন্যত্র চলে যায়। এই যাওয়া আসার জন্য ট্রেন, বাস প্রভৃতি যানবাহন ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু ট্রেন, বাসে সহজে তারা উঠতে পারে না। অনেক সময় ট্রেনের যাত্রীরাই তাদের উঠতে দিতে চায় না। কারণ তারা এতো নোংরা থাকে যে তাদের গা-গতর থেকে, উসকোখুস্‌কো চুল থেকে কিংবা পরিধেয় ময়লা জামাকাপড় মোট-মাটালি, জিনিসপত্র থেকে একটা বিশ্রীগন্ধ বেরয় যা সাধারণ যাত্রীদের বিরক্তকর বোধ হয়। তারপর এরা টিকিট কাটে না। ফলে সিটে বসার জায়গা পায় না। নিচে মেঝেতে, যাওয়া আসার রাস্তায়, বাথরুমের কাছে, নামা-ওঠার সামনে শুয়ে বসে থাকায় যাত্রীদের অসুবিধা হয়। তাছাড়া এরা দলে থাকেও যেহেতু অনেক জনতাই কয়েক ট্রেন ছেড়ে দিতে হয় পরের কোনো এক ট্রেনে চেপে গন্তব্য স্থলে যেতে হয়। বাসেও তাদের ওঠা হয় না। তাই, হয় বাসের ছাদে অথবা ট্রাকে চেপে যেতে হয়।

সকালবেলা নারী পুরুষ বেরিয়ে পড়ে আপন আপন কাজে। পুরুষ ছেলেরা যায় বাঁশের কঞ্চির লাঠির গোছা, গুলতি নিয়ে পশু-পাখি শিকার করতে এবং জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে। মেয়েরা, মহিলারা যায় ছোটো ছোটো কোলের শিশু কোলে নিয়ে রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, হাট, বাজার, জনবহুল রাস্তায় ভিক্ষে করতে। আবার তো কোলের শিশু থাকে না। এদের মধ্যে যার যার একাধিক বাচ্চা থাকে তার কাছ থেকে অন্যরা টাকার বিনিময়ে বাচ্চা ধার নেয়। চুক্তি থাকে বিকেল বেলা বাচ্চা সহ একশো টাকা কিংবা তারও বেশি টাকা সহ বাচ্চা ফেরত দেবে। এই প্রথাই এদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আর সর্দার বা এই গোছের যারা, তারা থাকে আস্তানায়। এদের শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর। প্রতিদলে একজন সর্দার থাকে। এই সর্দারের নিয়ম মেনেই চলতে হয়। তার বাইরে গেলেই কঠোর দৈহিক পীড়ন এবং শাস্তি পেতে হয়। এদের যুবক যুবতীদের মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা

নেই তা নয়, আছে। তবে সর্দারের কঠোর বিধি-নিষেধের জন্যই কেউই তা বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। এদের ছেলেদের থেকে মেয়েরাই বেশি উপার্জন করে। মেয়েদের উপার্জিত অর্থ সংসারে ব্যয় করে। আর ছেলেদের অর্থ বেশির ভাগই চলে যায় নেশা জাতীয় দ্রব্যে। আজকালছেলেদের হাতেই মোবাইল দেখা যায়। তারা বিকেল বেলা এসে মোবাইলে সিনেমার দৃশ্য দেখে এবং গান শোনে।

নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়। বিয়ের পর ছেলে চলে যাবে মেয়ের দলে। বিয়েতে পণ নেওয়ার চল নেই। তবে মেয়ের বাড়ির সামর্থ থাকলে কেউ কেউ মোবাইল, ঘড়ি, রেডিও নেয়। জোর করে না। মেয়েদের চোদ্দো-পনেরোতেই বিয়ে হয়ে যায়। বাইরের লোককে বিয়েতে নেমন্তন্ন করে না। দলের সর্দারই বিয়ের পুরোহিত। বিয়েতে নারী-পুরুষ মদ খেয়ে আনন্দ করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব হলে বউ পালিয়ে যায় বাপের আস্তানায়। ছেলেটি তার দলের সর্দারের পরামর্শ মতো বউয়ের কাছে গিয়ে বউয়ের হাত-পা ধরে এবং অন্যায় স্বীকার করে। শেষে শ্বশুর শাশুড়ি এবং পরিবারের সকলকে বেশ ভালোমতো একটা খাবার খাইয়ে তারপর বউকে নিয়ে আসে। এরা ফাঁকা মাঠে পাশাপাশি বিছানা ফেলে রাত্রে শুয়ে থাকে বাচ্চা-কাচ্চা, পিতা-মাতা সহ। কিন্তু অনেক দম্পতি থাকে। তাদের তো যৌন চাহিদা হতেই পারে। তখন তারা কী করে? এ প্রশ্ন জাগতেই পারে। জানা গেছে রাত্রে বেলা দম্পতিরা যৌন পিপাসা নিবারণের জন্য আস্তানার বিছানা থেকে একটু দূরে নির্জনে চলে যায়। তারপর খানিক সেখানে কাটিয়ে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

এদের কারুররোগ ব্যাধি হলে ওষুধ খাওয়ায় না, নিকটে হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স থাকলে ও নিয়ে যায় না। এদের দলের সর্দার কিংবা কোনো এক কবিরাজ গাছা-গাছড়া, জরি-বটি দেবে। তাতে অনেক সময় ভালো হয়, কখনো বা হয়ও না। এমন কি সন্তান প্রসবিনী মহিলা প্রচণ্ড প্রসব বেদনায় ছটফট করছে, একের পর এক জরিবটি দিচ্ছে তাতে কিছু হচ্ছে না, তবুও হাসপাতালে নেবে না। অনেক সময় মৃত সন্তান প্রসব হয়। কিংবা মহিলাটির অবস্থাও গুরুতর হয়, তবুও হাসপাতাল নেবে না। সন্তানাদির জন্ম হলে সকলেই মদ খেয়ে আনন্দ করে। লেখাপড়া শেখার প্রচলন নেই। হয়তো কখনো কখনো কোনো কোনো যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর মধ্যে বাইরের ছেলে মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়া দেখে ইচ্ছে হয় কিন্তু সর্দারের এমন নিয়ম, তার বাইরে যাওয়ার সাহস নেই। এরা মূলত হিন্দু। কারণ কালীদেবীকে খুব ভক্তি করে এরা। প্রত্যেক দলে কালির ফটো থাকে। সন্ধ্যেবেলা সেই ফটোর সামনে বসে ঢোল বাজিয়ে গান করে। মাঝে মাঝে মদ দিয়ে গলা ভিজিয়ে নেয়। পুরুষরাই এটা করে। আবার গোরুর মাংসও খায়। ঈদের সময় মুসলিম অঞ্চলে যায়। তখন মুসলমানেরা দান-খয়রাত ভালো দেয়। মাংসও পায়। কেউ মরে গেলে দাহ করে, কখনো বা নিকটবর্তী নদী থাকলে ভাসিয়ে দেয়, আবার কখনো মাটিতে চাপা দিয়েও রাখে। সব রকম প্রথাই রয়েছে।

প্রত্যেক দলেই কিছু যুবতী মেয়ে থাকে। যুবতী বলতে বারো/তেরো/চোদ্দো বছরের

মেয়ে। কারণ পনেরো/ষোলোতে বিয়ে হয়ে যায়। এদের চেহারা যে নেই তা নয়। রূপ আছে, লাবণ্য আছে। কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশের সুযোগ নেই, চর্চাও নেই। কারণ সেজেগুজে রূপসী হয়ে থাকলে তো কেউ ভিক্ষে দেবে না। তাই অগোছালো অবস্থায়ই থাকতে হয়। জানা গেছে যখন মাঝে মাঝে এক দু'মাস নিজ বাড়ি পাকুড়ে গিয়ে থাকে তখন তারা ভালো জামা-কাপড় পরে। বেশ সেজে গুজে পরিপাটি হয়ে ঘুরতে বেরয়। কিন্তু যখন পয়সা ফুরিয়ে যায় তখন আবার তারা দল বেঁধে অর্থ উপার্জনের জন্য দূর-দূরান্তে যায়। তখন আবার সেই নোংরা অপরিষ্কার উসকো খুস্‌কো অবস্থায়ই থাকে। তা না হলে ভালো ভিক্ষা মিলবে না।

এক একটা জায়গায় এরা পনেরো দিন, কুড়ি দিন কিংবা উপার্জন ভালো হলে এক মাসও থাকে। সেখানকার কিছু লম্পট যুবক ছেলে, শুধু যুবক কেন কিছু মাঝ বয়সী কিংবা আরো বেশি বয়সী পুরুষ এই দলের কিশোরী যুবতী মেয়েদের দেখে কিংবা মহিলাদের দেখে যৌন পিপাসায় লালায়িত হয়। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় তারা ওই আস্তানার আশে পাশে এস ঘোরাঘুরি করে, আর হিংস্র-লোভী কামাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আড়াল আবডাল থেকে। ওই সব যুবতী, মহিলাদের প্রতি খাতির বানাতে চায়। এক সময় ভোগ করার জন্য প্রস্তাব দেয়, বিনিময়ে অনেক টাকার নোট তাদের সামনে তুলে ধরে। তারা ভিক্ষা করে খাবে কিন্তু মান ইজ্জত নষ্ট করে না। তারা সেই সব লালায়িত পুরুষদের অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, এই সব কিশোরী-যুবতী এবং মহিলারা সকালবেলা দল বেঁধে প্রাতঃ ক্রিয়া কর্মাদি সারতে যায় নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, ডোবা-খানা, জলাশয়ের ধারে কিংবা গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড়-এর আড়ালে। তখনো একদল পুরুষ ছেলে কিংবা পথ চলতি পুরুষ দূর থেকে গাছ-পালার আড়াল থেকে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে। কখনো কখনো এদের কারুর চোখে পড়ে যায় পুরুষদের এদৃশ্য। তখন তারা প্রাতঃকর্ম থেকে উঠে এসে এক সঙ্গে তাদের দিকে ধাওয়া করে। তখন যে যেদিকে পারে দৌড়ে পালায়।

যেহেতু এই পাখিমারা সম্প্রদায় মাথার উপরে তাঁবু খাটিয়ে থাকে না। খোলা আকাশের নীচে থাকে। তাই বৃষ্টি হলে আশে পাশের স্কুল কলেজ কিংবা সরকারি বেসরকারি ঘর-বাড়ির বাড়তি পড়ে থাকা জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈকালে হয়তো উনুনে সকলে রান্না চাপিয়ে দিয়েছে, তখন হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় এসে উনান, জ্বালানি সব ধুয়ে মুছে গেছে। সব ভিজে গেছে. তখন রান্না করার কিছু নেই। সে রাত তাদের অনাহারেই কাটাতে হয়। তাছাড়া ভিক্ষে করতে গিয়ে কত মানুষের চোখ রাঙানি, কটু কথা শুনতে হয় তার তো ইয়ত্তা নেই। এরকম মানুষ এবং প্রকৃতির নানাবিধ বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে এই যাযাবর শ্রেণির মানুষের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হয়। এত সব সত্ত্বেও এরা আদিম বৃত্তি পরিত্যাগ করতে পারছে না। সরকারি বেসরকারি নানাভাবে এদের সমাজ জীবনের মূলস্রোতে আনার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছু কিছু যাযাবর গোষ্ঠী এখনো অনড়। পাখ্‌মারা সম্প্রদায় তাদের মধ্যে একটি। যাযাবর জীবনই তাদের ভালো লাগে। এই সভ্য সমাজের রূপময় সুখ-স্পর্শ অবলীলায় ত্যাগ করে-জীবনের আদিমতাকে ভালবাসায়।

‘জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প ঃ মানবমনের আখ্যান’

মৌসুমী সাহা

জীবনকে খুব কাছের থেকে দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই পথ চলা শুরু, ভাবনার জারণ-বিজারণেই তাঁর গল্প-সাহিত্যের ইমারত সুঠাম, উজ্জ্বল, সহজ-সচেতনতার গহনে আত্মসমাহিত। সমরোত্তর পর্বের বাংলা ছোটগল্পের অন্তর্লোক-উন্মোচনকারী সৌন্দর্যবাদী শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র-নন্দী তাঁর আত্মকথায় লিখেছিলেন—‘সাহিত্য-রচনা শিল্প-সৃষ্টি কিছু আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একটু একটু করে সে গল্পলেখক হয়ে ওঠে, ঔপন্যাসিক, কবি বা চিত্রকার হয়ে ওঠে’। গল্পের ফর্ম নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। প্রকৃতি ও জীবনের বহুবিচিত্র বর্ণচ্ছটায় ভাসতে ভাসতে এক স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর ভাষার প্রবাহে অক্লান্তকর্মা লেখক এগিয়ে গিয়েছেন সৃজনক্রিয়ার চূড়ান্ত লগ্নে। নিজের গল্প লেখার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, কোন একটা বিশেষ দৃশ্য বা বিশেষ মুহূর্ত তাঁকে হন্ট করলে লিখতে শুরু করে দেন তিনি, অথবা কোনো বিশেষ শব্দ বা গন্ধ নাকে এলে, সেইটিই হয়ে ওঠে তাঁর গল্পের সূত্র ঃ

> ‘এত ভাবুক ছিলুম। আসলে পূর্ববাংলার ছেলে। দু’পা বাড়ালেই নদী, ধূ-ধূ গ্রাম, গাছপালা, ক্ষেতে খামার ধানক্ষেত, পাটক্ষেত। এসব দেখে কেমন যেন হয়ে যেতুম। মেঘলা আকাশের মতো মুখ ভার হয়ে থাকত। ড্যাবড্যাব করে পুকুরঘাটের দিকে তাকিয়ে থাকতুম। খেজুর আর ডালপালা ছড়ানো একটা ঝুপসি শ্যাওড়া গাছের পিছনে লাল দগদগে আকাশ। ঝাঁক বেঁধে লাল ফড়িং উড়ছে, খেজুরগাছের মাথায়। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি তখন থেকেই, ...নাক আর কান খুব সজাগ ছিল। তিতাসের বুকে নৌকোদৌড় বা দুর্গা প্রতিমার ভাসান বা পচা-পাটের গন্ধ, অঘ্রাণে ধান, বর্ষায় মৌরলা-খলসের আঁশটে গন্ধ এসব ভোরের বাতাসে ভুরভুর করে নাকে লাগত। এসব থেকেই লেখালেখির শুরু .... উত্তেজনা।’

সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্যবোধে গড়া ওঠা স্বতস্ফূর্ত প্রাণ প্রবাহের ধারায় বেড়ে ওঠা শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র জন্ম ২০শে আগষ্ট ১৯১২ বা বঙ্গাব্দ ১৩১৯, ৪ ভাদ্র, কুমিল্লা শহরে, পৈতৃক নিবাস তিতাসের পাড়ে ছোট মফঃস্বল শহর ব্রাহ্মাণবাড়িয়ায়। শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা কুমিল্লা শহরের মামাবাড়িতে। জীবনানন্দের কবিতায় উজ্জীবিত জীবন, বাংলার নদীনালা-ধানক্ষেত-গাছ-গাছালি আর সেইসঙ্গে তীব্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতির অনুরণন আশ্চর্য তাৎপর্য দান করেছিল তার লেখায়। প্রৌঢ়ত্বে প্রান্তসীমায় উপনীত হয়ে বলেছিলেন,

> ‘...আমিও তো ধানের গন্ধ পাই, মাসের গন্ধ পাই, ফুলের গন্ধ,

> পাখির, পোকামাকড়ের গায়ের গন্ধ, খড়কুটো, কাঁকড়া, মাটি, মুলো, শশা, এমনকি ঘরের কোণার, মাকড়সার জালের গন্ধ আমার নাকে লাগে।’.....

বয়ঃসন্ধি পর্বে, ১৯২৭-এ পদ্য লেখ ছেড়ে দিয়ে ছোটগল্প রচনায় মনোনিবেশ, প্রকৃতি তথা মানবমনের বারমাস্যায় অবগাহন। বিষয়ের অভিনবত্ব ও বিন্যাসের পারিপাট্যে এমন সুকৌশলে তাঁর গল্প জমে ওঠে যে, একে অস্বাভাবিক বা অবাস্তব বলার উপায় নেই। আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা কত সাধারণ উপকরণ নিয়ে অপ্রত্যাশিত চকিত চমক সহযোগে গোটা গল্পকে জীবনরসের ব্যঞ্জনায় কিভাবে তরঙ্গিত করে তোলেন, তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

‘গাছ’ গল্পটি লেখকের নান্দনিক চেতনা বিজড়িত। একটা গাছ। অনেকদিনের গাছ তার স্নেহময়ী রূপ নিয়ে কিভাবে ধাপে ধাপে মানুষের মধ্যে স্নেহ-অনুভূতির সঞ্চার করছে, আবার নিঃস্ব-অসহায়-পাস্তুর মন নিয়ে মানুষের অমানুষিক প্রবৃত্তিতে কষ্ট পাচ্ছে, যা সত্যিই বেদনাদায়ক—‘গাছ চোখ বুজল, তার ঘুম পেয়েছে, গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারে নি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নিজের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে। গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না’।

লেখক তাঁর অনুভব ব্যঞ্জনাকে সংকেততত্ত্ব সংলাপের মাধ্যমে মানুষের চেতনার মূলে আঘাত করে পাঠকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেন যে, প্রকৃতি কখনও মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না, ‘দিনের পর দিন যায়, ঋতুর পর ঋতু কাটে, বছরের পর বছর যায় আসে—গাছের জায়গায় গাছ দাঁড়িয়ে।

বর্ষার পাতাগুলি বড় হয় পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ সেই সবুজ কালো ধূসর হয়ে ওঠে তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নিরক্ত প্রসূতির পাণ্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। গাছ রিক্ত হয়।

তখনও গাছ গাছই থাকে’।

গল্পে সজীব জীবনের ব্যঞ্জনা প্রায় সাংকেতিকতার সূক্ষ্ম সীমায় উপনীত হয়েছে।

প্রকৃতির আন্তরিক নিবিড়তা মানবজীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কিভাবে মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করে তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ‘নদী ও নারী’ গল্পটি, যা ‘নির্বাচিত গল্প ‘সংকলন’-এর প্রথম গল্প, জনপ্রিয় হয়েছিল ভীষণভাবে, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল গল্পটি।

এক দম্পতি ‘রাক্ষসী পদ্মা’য় একটানা নৌকায় ভেসে ভেসে যখন ক্লান্ত, তখন লক্ষ্য করল এমন এক নারীকে, যার বয়স ‘একুশ-বাইশও হতে পারে।’ সম্পূর্ণ অন্যধরনের অভিজ্ঞতা বলা যেতে পারে। সুদৃশ্য সাদা রঙের নৌকায় ভ্রমণরতা মেয়েটির পরনে ফিকে নীল রঙের শাড়ি, রোদের দিকে তেরছা করে ধরা একটি ছাতা, কেশবিন্যাসে উগ্ররকমের আধুনিকা।

পদ্মার চরে বেড়াতে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়, দীর্ঘছন্দ নিটোল-নির্ভাজ গড়নযুক্ত কোমরে আঁট করে জড়ানো আঁচল, হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটিকে দেখতে অনেকটা চিতাবাঘিনীর মত। যাইহোক মেয়েটির সঙ্গে আলাপচারিতার পর সুরপতি ও নির্মলা ব্যক্তিগত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে অবশেষে উপস্থিত হয় তার নৌকায়। যদিও কৌতূহল মানুষের মজ্জাগত, আর তাই মনে মনে বিদ্বেষ বা বিতৃষ্ণা নিয়েও বোটের ভিতর একবার উঁকি না দিয়ে পারে না।

গল্পের নায়িকা যাকে এই দম্পতির মনে হয়েছিল 'ফ্যাশানের ফানুস', চিকিৎসকের নির্দেশে হাওয়া বদলের মাধ্যমে স্বামীকে সুস্থ করার অভিপ্রায় জেনে, ওর সম্বন্ধে ওদের সন্দেহের নিরসন হয়। একবিন্দু শিশিরের মত তাঁর জীবনসংগ্রামের ইতিহস জেনে বিস্মিত হয়ে ওঠে তারা। এইভাবেই প্রাকৃতিক পটভূমিতে মানুষের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জীবনকে মেলাতে চেয়েছিলেন লেখক।

আরেকটি গল্প 'সমুদ্র'। গল্পের কথক তার স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সামনে যে বিবিক্ত—চিত্ততার আশ্চর্য সুযোগ পেয়েছিলেন তারই ফসল এই গল্পটি, 'মনে হতে পারে সব মানুষ বুঝি এখানে এসে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে; মনে হতে পারে সব মানুষ সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল, তারপর যার যেখানে যাবার চলে গেছে। আসলেও কি তাই নয়, ভাবলাম মানুষ আসে মানুষ যায়, আর নগ্ন নির্জন সমুদ্র একভাবে ফুঁসে চলেছে। তার মধ্যে জীবনের চঞ্চলতা আছে, প্রাণের ঔজ্জ্বল্য আছে, আবার মৃত্যুর নিষ্ঠুর নিরবয়ব অন্ধকার অতলস্পর্শ গর্ভ জুড়ে লক্ষ ষড়যন্ত্রের আবর্ত তৈরী করে চলেছে'।

মানুষের মনের গহনে অনুপ্রবেশ করে লেখক খুঁজে পেয়েছেন আরেকটি মন। আসলে কবিস্বভাব মৌলধর্মে খুবই রোমান্টিক। আর তাই 'সমুদ্র' গল্পে লেখকসত্তা পাঠকমনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলে শোনান এমন অসম্ভব ইতিহাস।

মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনচেতনায় ভাববাদ বা বস্তুবাদ যে বিরুদ্ধ প্রতিবেশের সৃষ্টি করে তার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে 'রাইচরণের বাবরি' গল্পে। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় সংখ্যায়।

অভাবের সংসারে রাইচরণের সেলাইয়ের দোকান শেয়ালদা'র কাছাকাছি, বৌবাজারের মাথায় রাইচরণের একদরজার দোকান, 'তাহার দোকানের সে নিজেই একটা বিজ্ঞাপন, মানে—মাথার বাবরিটা।'।

ভাল মানুষ রাইচরণের নিঃসন্তান স্ত্রী ঝগড়ার গন্ধ পেলেই, তার সমস্ত আস্ফালন ছুঁড়ে মারে রাইচরণের বাবরি লক্ষ্য করে, যদিও 'উট্‌কা-ছুটকা সাধারণ ঝগ্‌ড়াঝাঁটি স্বামী-স্ত্রীর প্রাত্যহিক-জীবনে কিছু অপ্রত্যাশিত নয়।'

এরপর এক নাটকের দলে রাইচরণের অভিনয়ের কথা-বার্তা হয় 'বাবরি'র সুবাদে। কিন্তু তিনদিন রিহার্সাল করেই রাইচরণের মনে বিতৃষ্ণা জন্মায়। কষ্টের সংসারে স্ত্রী মানদার সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে নাটকের দলের ম্যানেজারকে জানায়—'যেখানে সাজ-পোষাক, হাব-ভাব, মায় কথাবার্তা পর্যন্ত কৃত্রিম, আপনি কি মনে করেন সে-স্থলে কোনও দর্শক

আমার বাব্‌রিটা সত্যিকারের বাবরি বলে ধরে নেবে?'

তারপর এ রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে আপাতত কলেজ স্ট্রীটের একটি দোকান থেকে একজোড়া হাল্‌ফ্যাসানের স্কার্টপাড় শাড়ী কিনে বাড়ীর রাস্তা ধরে।

গল্প পড়তে পড়তে লেখকের গল্প-বয়ন কৌশলের টানে একাত্ম হ'য়ে পাঠক ছুটে যায়। সামান্য বিষয় সংবেদনীয় চেতনার মূর্ত হয়ে ওঠে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তীব্র প্রখর জীবনানুভবে। এইখানেই তাঁর প্রতিভার গ্রন্থি।

বাস্তবজীবনের কার্যকারণসূত্রে মানুষের যে জীবনসংগ্রামের চাহিদা তার সঙ্গে অন্তর্লীন হয়ে আছে জৈব চাহিদা। 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' গল্পটি তারই শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ।

খালপোল মিতালি পাতিয়েছে এপারের সঙ্গে ওপারের। নতুন কংক্রিটের পোল তৈরী হওয়ার পর জায়গাটার চেহারা বদলে গেছে কদিন পর্যন্ত পোলটাই একটা বিস্ময়, নতুনত্ব হয়ে রইল ওপারের মানুষ আর এপারের মানুষের কাছে। তারপর সেই নতুনত্ব যখন সকলের চোখে আস্তে আস্তে সয়ে গেল, স্বাভাবিক হয়ে এল, তখন একদিন 'সবাই অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল এক অদৃশ্য শিল্পীর হাতের আঁকা নানা চিত্র পোলের গায়ে ফুটে উঠেছে।

এরপর ক্ষুধার আঁচে পুড়ে সেই চিত্রকর অর্থাৎ উমেশ বাঁচার মন্ত্র খুঁজে পায় তারই জীবিকার মধ্যে ঠাকুরদেবতার ছবি শুধু নয়, মেয়ে মানুষের ছবিও গোপনে বিক্রী করার প্রস্তুতি নেয়—'রোদটা এখন চড়া, একটু ছায়া, একটু বিকেলের জন্য উমেশ অপেক্ষা করতে থাকে যদিও'।

শৈলীকে যদি তুলনা করা যায় কঠিন কালো পাথরের সঙ্গে। যা সহজে ভাঙে না বা দুমড়ায় না—এই দৃঢ় সংবদ্ধ কঠিন রূপ নিজের জীবন দিয়ে যিনি তিলে তিলে আত্মস্থ করেছেন, তিনি শোভন শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রগোত্রের সৃজনভূমিতে আত্মপ্রকাশ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর। নির্মোজ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ব্যক্তি মানুষের স্বভাব বিশ্লেষণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই—তিনি নির্মোহ-নিপুণ শিল্পী। অনুজপ্রতিম লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একসময় আক্ষেপ জানিয়ে লিখেছিলেন 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনার যথাযোগ্য সমাদর এখনো হয়নি পাঠকের মধ্যে—এজন্য আমাদের বিবেক আহত বোধ করে।' এই সূত্র ধরেই জানাই যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মত সূক্ষ্ম সংবেদশীল, সৌন্দর্যসচেতন কথাসাহিত্যিককে বাদ দিলে বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আর, ছোটগল্প যে মনন প্রধান লেখকের আত্মপ্রকাশের তীব্রতম বাহন, এ সত্য কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে সত্যিই প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে গল্প পাঠকের পর পাঠের মনে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চারণভূমি : ব্রাত্যজীবনের আত্মদর্শন

দেবশ্রী ঘোষ (বিশ্বাস)

ভারতবর্ষে আর্য-বিজয়ের পর কৌম-বিভাজনের ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ে ওঠে, তার সর্বনিম্ন বা শেষ স্তর শূদ্ররা। যাদের জীবিকা উক্ত তিন বর্ণের দাসত্ব করা। মানুষের ন্যূনতম স্বীকৃতি তাদের প্রাপ্য ছিল না। জীবন ধারণের প্রাথমিক তিনটি শর্ত খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। ধর্মীয় বর্ণ-বিন্যাসের কারণে শুরু থেকে শূদ্ররা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত। বঞ্চনার দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী এরা। রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র-গণতন্ত্র-রাষ্ট্রব্যবস্থার এই পোশাকী নাম পরিবর্তনে তাদের জীবন-মান অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। স্বাধীনতা-উত্তর কালেও ধন-বন্টনের অসাম্য, বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থা ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার বলি হয়ে এরা রয়ে গেছে অপরিচয়ের অন্ধকারে। শিক্ষার আলোকবর্তিকা থেকে দূরবর্তী, চরম দারিদ্র ও কুসংস্কার মেনে, সমজাতীয় বা বিজাতীয় গোষ্ঠির শোষণ, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও যারা প্রকৃত ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তথাকথিত সভ্যসমাজ থেকে নির্বাসিত ভদ্রেতর বিশাল জনগোষ্ঠি 'অন্ত্যজ' বা 'ব্রাত্যজন' হিসাবে পরিচিত। জন্মলগ্ন থেকেই যারা সমাজচ্যুত, অথচ যাদের শ্রমনির্ভরতায় উন্নত সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

প্রকৃত অর্থে ব্রাত্যজন অর্থাৎ 'নিম্নবর্গ' প্রথম ব্যবহার করেন 'আন্তেনিয় গ্রামসি'। 'সাব-অলটার্ন' মার্কসীয় দৃষ্টিতে মূলত শাসক শ্রেণির অধীনস্ত শ্রমজীবী শ্রেণির দিকে লক্ষ্য রেখেই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আর্থিক ও ধর্মীয় মানদণ্ডে হীনভাবে যারা সমাজে বসবাস করে তাদেরই 'ব্রাত্যজন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মূলত জেলে, ডোম, বাজিকর, সাপুড়ে, কাহার, ব্যাধ, পশুচারণকারী ইত্যাদি নিম্নবৃত্তির পেশায় নিযুক্ত, হতদরিদ্র, কুসংস্কারের অতলে নিমজ্জিত, সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভর জীবনে অভ্যস্ত জনগোষ্ঠিকে 'ব্রাত্যজন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরা যেন সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা, বিচ্ছিন্ন, পাহাড়ে-জলে-জঙ্গলে নির্বাসিত। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। ক্ষুধা, পিপাসা, কাম-মমতা, স্বার্থ-সংকীর্ণতায়, আদিমতায় মোড়া জীবন এদের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই 'ব্রাত্যজন'দের পরিচয় দিয়েছেন 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে—

"জেলে পাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। একদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে কালবৈশাখী তাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করিয়া তাহারা হয়রান হয়, জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ, জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায় আর দেশি মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর

থাকেন ঐ গ্রামে ভদ্রপল্লীতে, এখানে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

ব্রাত্যজনের এই বিশেষণ বাংলা সাহিত্যে বিরল। ব্রাত্যজীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্য লেখা হলেও নিছক গতানুগতিক জীবনালেখ্য নয়, অঞ্চলভেদে তাদের জীবনের সামগ্রিকতার পরিচয় উঠে এসেছে। স্থান বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক বিন্যাস, সমাজ পদ্ধতি, সংস্কৃতি, জীবন সংগ্রাম, সর্বোপরি তাদের আত্মদর্শন বিভিন্ন ধরনের উপন্যাসগুলিতে বিদ্যমান।

নব্বই-এর দশকে লেখা ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' ব্রাত্যজীবনের বারমাস্যা। মূলত বিহারের হাজারিবাগ অঞ্চল থেকে মানভূমের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া অঞ্চলের ভেড়িয়ার অর্থাৎ ভেড়া চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা 'ভকত' জনগোষ্ঠির জীবনালেখ্য এই উপন্যাস। ভেড়িয়াদের জন্মলগ্নটা বড়ই রোমান্স-ঘেঁসা, পুরাণ-নির্ভর। ভকতদের পূর্বপুরুষরা ছিল ক্ষেত্রী অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, শৌর্য-বীর্যশালী পুরুষ। পৃথিবীর ধনসম্পদ, জমি, সুন্দরী নারী সবই ছিল তাদের করায়ত্তে। একদা মহাঋষি পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করতে উদ্যত হন। সেই চরম অস্তিত্বের সংকট-কালে কয়েকজন ক্ষত্রিয় দুর্গম পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। সেই চরম বিপদের দিনে মেষপালক পাহাড়িয়ারা তাদের আশ্রয় দেয়। কিন্তু পরশুরামের সেনারা তাদের সন্ধান পায়। তখন ক্ষত্রিয়রা ভেড়া-চারোয়া সেজে পাহাড়ের ঢালে ভেড়া চরাতে থাকে। পরশুরামের সৈন্য ধোঁকা খেয়ে ফিরে যায়। শুরু হয় তাদের ধারাবাহিক পথপরিক্রমা। ভেড়ার পালের পিছনে তাদের ইহকাল-পরকাল সবই আবর্তিত হয়। ঋতু চক্রের সঙ্গে পাক খেতে খেতে তারা হাঁটে, স্থান বদলায়, সময় বদলে যায়, বদলায় ভূ-প্রকৃতি, শুধু বদল ঘটে না তাদের যাপিত জীবনধারায়। এদের আসল সংসারটি গড়ে ওঠে ফাঁকা জমিতে, খোলা আকাশের নিচে পাহাড়ে-জঙ্গলে, নদীর ধারে, 'আদাড়ে-বাদাড়ে'। ভকতদের জীবনপথ পরিক্রমার সঙ্গেই মিশে থাকে মনুষ্যজাতির চলমানতার ইতিহাস। পৃথিবী এক বৃহত্তর চারণভূমি। আজন্ম মানুষ বিচরণ করে চলেছে প্রান্ত থেকে প্রান্তরে। তাই দাহো ভকত তার জীবন অভিজ্ঞতায় অনুভব করেছে, মানুষ জাতটাই পুরো ভকত-গোষ্ঠী। খাদ্যের সন্ধানে, আশ্রয়ের সন্ধানে, কাজের সন্ধানে আমৃত্যু শুধু ছুটে চলেছে। মানুষ আসলে জন্ম-যাযাবর। থিতু হওয়া তার বিধিলিপি নয়। দার্শনিক প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ না হয়েও দাহো ভকতের মতো অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষের জীবনের সত্য উপলব্ধি আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট করে। উদাহরণ স্বরূপ তার ভাবনার একটু অংশ তুলে ধরা যায়। সে ভাবে দীঘির জলে কচুরিপাড়া যেমন ভেসে যায়, স্থান থেকে স্থানান্তরে, কখনোই সে মাটির সন্ধান পায় না, কিংবা শিমূল ফুলের বীজ যেমন উড়ে চলে 'কাঁহা সে কাঁহা', ঠিক তেমনভাবে মানুষ জাতটা ছুটে চলেছে দিক থেকে দিগন্তে। 'লোগকে দোনো গোড় মে বিধাতা-পুরুষনে পাহিয়া লাগাওল বা'—কাজেই সে তো দৌড়বেই, বিধাতা-পুরুষ যে মানুষের দু'পায়ে চাকা লাগিয়ে দিয়েছেন। ভকতদের এই আত্মদর্শনই বোধ হয় তাদের আপাত সুখী জীবনের মূল চাবিকাঠি। তারা প্রতিবাদী হয় না, বরং জীবন সম্পর্কে বিশিষ্ট এক আত্মদর্শনের উদার স্থিতিতে যাবতীয় অপ্রাপ্তি উপেক্ষা করে এগিয়ে চলে।

ভেড়িয়ার ভকতদের পুরুষাণুক্রমে জীবন বাঁধা থাকে গোঠমালিকের লাল খাতায়। ধার

আর শোধ হয় না। সরল মানুষগুলো ঠকে চলে জীবনভর, কিন্তু ঠকানোর কথা ভুলেও ভাবতে পারে না। আদ্যন্ত সহজ মানুষগুলোর জীবন শেষ হয়ে যায় ভেড়ার পিছনে ঘুরে ঘুরে। মুনসীও পিতৃঋণ শোধ করতে শ্রীকৃষ্ণ ভকতের গোঠে ভেড়িয়ার হিসাবে নিযুক্ত হয় আর তার মানসী রুকমিনিয়া অস্তমিত সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলে—'ইস জিন্দেগি কা এক রোজ খতম হো গয়ীল বা। জিন্দেগীর একটা দিন খতম হয়ে গেল। খতম, খতম, খতম' অথবা ভিখরী ভকত যখন বলে, 'সাঁঝ বেলায় প্রত্যেক আদমি তার জীবনের শেষ দিনটা আগাম দেখতে পায়', তখন ব্রাত্যজনের এই আত্মদর্শন আমাদের কি ভাবিত করে? ছুঁয়ে যায় আমাদের মনকে? দাঁড় করিয়ে দেয় কি চরম এক নির্মম, ভয়ঙ্কর সত্যের মুখোমুখি? জীবনের প্রতিদিনকার হিসেব এভাবে আমরা করি কি? বোধ হয় না। ভদ্রজনের পৃথিবীতে প্রতি দিন এত অবাঞ্ছিত মৃত্যুর গ্লানি আমাদের বহন করতে হতো না যদি ভিখরী ভকত, দাহো ভকতের বা রুকমানিয়ার জীবন-ভাবনা চারিত হতো। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত—শুধু একটা দিনের শেষ নয়, আমাদের এক পা মৃত্যুর দিকে আরো বাড়িয়ে দেওয়া। জাগতিক সত্যের সঙ্গে জীবন-সত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মায়াময় পৃথিবীর বাঁধনের একটা গিঁট খুলে যায়। আবার রামনা ভকত যখন বলে, 'দানে দানে মে লিখ্খা হুয়া হ্যায় খানেওয়ালা কো নাম'—খাদ্যের দানায় দানায় তোর নাম লেখা আছে, তোর প্রাপ্যটুকু তুই পাবিই, —তখন, সত্য উপলব্ধির আন্তরিক প্রয়াসে যদি আমরা অগ্রণী হই, তাহলে অস্বীকার করতে পারি না যে, দার্শনিকতায় অনেক তত্ত্বকে হার মানায় এই বাক্যটি। চাওয়া আর না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব-জটিলতায় ক্ষুব্ধ হয়েই আপাত সুন্দর জীবনে যন্ত্রণাকে আবাহন করি আমরা। চরম দারিদ্র্য, অনাহারের মধ্যেও তারা বিক্ষুব্ধ হয় না, অভিযোগ জানায় না কারো কাছে। এক ধরনের আত্মতৃপ্তি প্রশান্ত অঞ্চল রাখে ভকতদের। ভেড়িয়ার জীবনে তারা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কোনোটাই পায় না। অথচ বেঁচে থাকে—অদম্য প্রাণের জোরে। এই আত্মিক দৃঢ়তা জীবনের সমস্ত অনৈতিক কাজ থেকে তাদের বিরত রাখে।

ভেড়িয়ারদের মধ্যে প্রকৃতির সন্তান হিসাবে বেঁচে থাকার বন্ধন-মুক্ততার যে সুখটুকু আছে, তা হাতছানি দেয় আপাত থিতু হওয়া সংসারী মানুষদেরও। চিরমুক্ত মানব-মনকে শৃঙ্খলিত করা হয় সমাজ-সংসার নামক অদৃশ্য শিকলে। আর সে সারাজীবন চেষ্টা করে সে শিকল কেটে মুক্তির আস্বাদটুকু প্রাণভরে উপভোগ করতে। তাই গোঠের মালিক শ্রীকৃষ্ণ ভকত-'সংসারের জ্বলন্ত কড়াইতে নিরন্তর ভাজা ভাজা হতে হতে হঠাৎ জ্যান্ত এই মাছের মতো কড়াই থেকে লাফিয়ে পড়ে—', এক অদৃশ্য টানে ছুটতে থাকে গোঠের দিকে। নিজের সম্পদ তদারকি করার আড়ালে থাকে এক অনাস্বাদিত মুক্ত জীবনের হাতছানি। খোলা আকাশের তলায় কাঁকুরে জমি উপর বসবাস। 'হু হু করে বাতাস বয়, আকাশ থেকে অগ্নি ঝরে, হিম-ওস ঝরে। উদ্যোম জমিনে পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, আনাচে-কানাচে খালে-খোবরে সাপ-খোপ, রাতের বেলায় চোর-ডাকাত, জন্তু-জানোয়ার। তবুও শ্রীকৃষ্ণ ভকত যেন যষ্টিমধু চিবিকে ঢোক গেলে।' পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যেই এই এক জন মানুষ বাস করে, যে শুধুই তার নিজের 'আমার আমি'র মতো। সাংসারিক সম্পর্কের দেনা-পাওনার

হিসাব তাকে যেখানে স্পর্শ করে না। অতি তুচ্ছ হলেও নিজের একান্ত মুহূর্তের সুখটুকু অনুভব করে নিতে চায়। এমন এক অনুভূতি যা অনুভব করা যায়, ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ ভকতের গোঠের কষ্টকর জীবনের প্রতি যে টান তাকে লেখক তুলনা করেছেন শ্রীরাধার কৃষ্ণ-অভিসারের সঙ্গে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বোধ হয় এমন একজন অভিসারিকা লুকিয়ে থাকে। চেনা জগতের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে অনির্দেশ কষ্টকর জীবন তাকে হাতছানি দেয় অহরহ।

প্রকৃতই প্রকৃতির সন্তান এই নিঃস্ব মানুষগুলোর জীবন-বোধ অত্যন্ত প্রখর। চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতেও এরা প্রবল আত্মসম্মানী। গোঠজীবনের অনেক বিড়ম্বনার মধ্যে অন্যতম হলো ডাকাতের ভয়। কারণ মালিকের লাখ লাখ টাকার সম্পত্তির পাহারাদার ভেড়িয়াররা। নিরস্ত্র মানুষগুলো প্রতি মুহূর্তে চরম আতঙ্কে দিন গুজরান করে। গোঠের 'ম্যাড়াল'ই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। গ্রামের প্রভাবশালী সম্পন্ন লোকেরা চায় ভেড়ার গোঠ তাদের জমিতে কয়েকদিন রাত্রিবাস করুক। সেই চুক্তি হয় 'ম্যাড়াল' ও সম্পন্ন চাষির মধ্যে, কারণ ভেড়ার বর্জ্য পদার্থ অতি উৎকৃষ্ট সার। পরের তিন-চার বছর বিনা সারে খুব ভালো ফসল উৎপন্ন হয় জমিতে। বিনিময়ে 'ম্যাড়াল'কে খাদ্য-খাবার, তামাক ইত্যাদি 'সিধে-পাতি' দেওয়া হয়। এমন কয়েকজন 'ম্যাড়ালে'র সঙ্গে দেখা করতে এলে বৃদ্ধ দাহো ভকত ডাকাত ভেবে প্রমাদ গুণে, কিন্তু ভুল ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। তবুও দাহো সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। গোঠ তাদের জমিতে থাকবে না কারণ 'ম্যাড়াল' অনুপস্থিত। বয়স্ক হিসাবে দাহো ভকতকে তোষামোদ করে লোকগুলো, তার হাতে গুঁজে দেয় দশ টাকার নোট। হঠাৎ দাহো আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলে ওঠে—'কিন্তু যদি শেষ-মেষ না যায় তুম্যাদার গেরামে?' তাহলে কথা দিয়ে কথা না-রাখার দায়ে যে ক্ষতবিক্ষত হতে হবে দাহোকে? লোকগুলো দৃষ্টি-পথের আড়ালে চলে গেলে দাহো টাকাটির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। টাকাটা সাবধানে ট্যাঁকে গুঁজতে যাওয়ার সময় হঠাৎ চোখে পড়ে সামনে খাঁচা-বন্দি একটি টিয়া পাখির দিকে। সে মুক্তির আশায় সারা দিন চিৎকার করে। হঠাৎ চিৎকার থামিয়ে নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে থাকে দাহোর ট্যাঁকের দিকে—'সেই দৃষ্টিতে আছে সীমাহীন বিস্ময় ও প্রচ্ছন্ন তিরস্কার'—নিজেকে দাহো ধিক্কার দেয় দশ টাকা ঘুষ নেওয়ার জন্য। একটা সূক্ষ্ম অপরাধ-বোধ, এক তুচ্ছ পাপে সে জর্জরিত হয়। তার জীবনের এই ঘটনাটা গোপন থাকলো না পৃথিবীর কাছে। অন্তত একটা প্রাণীতো সাক্ষী থাকলো। 'ধীরে ধীরে ওর শনের মতো সাদা চুলওয়ালা মাথাটি ঝুলে পড়ে মাটির দিকে। সমগ্র অন্তরাত্মা অন্তত কয়েক দণ্ডের জন্য নতজানু হয় বুঝি ঐ পাখিটারই উদ্দেশ্যে।' বর্তমান সময়ের নীতি ও মুল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাহো ভকতের মতো সর্বহারা মানুষটি মাত্র দশ টাকার জন্য যেন গভীর আত্ম-আক্ষেপ ও অপরাধ-বোধে ভুগছে। তাদের সততা আমাদের মাথা নিচু করে দেয়। নিরক্ষর এই মানুষটির বিবেক-বোধের তাড়না আমাদের কি বিন্দুমাত্র বিচলিত করে? যদি করতো তাহলে কোটি কোটি টাকার কালোবাজারি বন্ধ হতো; ধনবন্টন ব্যবস্থার অসাম্য দূর হতো; অশিক্ষা, অনাহার শব্দগুলি হারিয়ে যেত আমাদের অভিধান থেকে। শেষপর্যন্ত

এক অদ্ভুত যুক্তিগ্রাহ্য যুক্তি দেয় দাহো ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলে—'তোহারেই দেউল্ বা ই লালচ।' আমাদের শরীর, চোখ, দাঁত, নাক যেমন তুমি দিয়েছ, এই লোভও তোমার দেওয়া, আমি শুধু বহন করে চলেছি মাত্র। 'হাম তো খোদ নহি এ চিজ্ পয়দা কৈলেবা নি। হাবার কা কসুর?' আত্মযন্ত্রণায় দীর্ণ হতে থাকা মানুষটার কি আকুলতা মুক্তির! অথচ তথাকথিত ভদ্র মানুষের সমাজ থেকে এরা নির্বাসিত, এরা ব্রাত্য! এদের জীবন-দর্শন, যুক্তি, আত্মবিশ্লেষণী ক্ষমতা, সামান্যতম অন্যায় কাজের জন্য নৈতিক দহন আমাদের মাথা নিচু করে দেয়। আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা, আধুনিকতা সব মুহূর্তে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় যখন ভদ্রসমাজের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। দাহো ভকতদের কাছে তাদের অজান্তেই আমাদের প্রসাধন-চর্চিত মাথাটি ঝুঁকে পড়ে মাটির দিকে।

সহজ-সরল ভেড়িয়ারদের জীবন কিন্তু সরল-রৈখিক নয়। সমস্যা-সংকুল ও জটিল। প্রতি মুহূর্তে আতঙ্ক ও মৃত্যুভয় তাদের আজীবনের সঙ্গী। সামন্ত সূর্যকান্ত মোহান্তের জমিতে গোঠ পেতেছে দাহো, মুনসীরা। লোকটি দুর্ধর্ষ—অর্থ, ক্ষমতা, আইন, প্রশাসন সবই তার হাতে। কিন্তু 'সিধে পাতি' ঠিক দেয় না। খুব কঞ্জুস। মোহান্ত একদিন গোঠের ম্যাড়ালকে ডেকে পাঠায়। কারণ শহর থেকে দুই রাজনৈতিক নেতা আসছেন সভা করতে, তাই ভোজের আয়োজনের জন্য দুটো ভেড়া দরকার। প্রায় দু'হাজার টাকা দাম, কিন্তু দান করতে হবে। মালিকের প্রতি এদের অগাধ শ্রদ্ধা, সঙ্গে নিজেদের কাজের প্রতিও। কাজেই, কীভাবে অন্যের সম্পদ বিনা অর্থে তারা দান করবে? চরম সংকটের মুহূর্তে রাতের অন্ধকারে তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রায় সারা দিন-রাত পায়ে হেঁটে ভেড়ার পাল নিয়ে উপস্থিত হয় নিরাপদ দূরত্বে। দাহো ভকতের মন সায় দেয় না, তার কেবলই মনে হয় কাজটা ঠিক হলো না। ওদের ঠকানো হলো, কিন্তু সে নিরুপায়, একদিকে কর্তব্য-বোধের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা অন্যদিকে কথা দিয়ে না-রাখতে পারার যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হওয়া। আবার কোথাও কোথাও সে বাধ্য হয় মনের প্রবল বিরুদ্ধতা করতে। মাঝে মাঝে বনরক্ষীরা ভেড়া দাবি করে। জঙ্গলে সদ্য-বসানা চারা গাছ তাদের ভেড়া খেয়েছে—এই অজুহাতে অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ রেঞ্জার সাহেবকে ভোজের জন্য ভেড়া দান করতে হয়। শোষণের কী নির্মম রূপ! ভদ্রসমাজ থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করে, কিন্তু ভদ্রজনের হাত থেকে নিস্তার পায় না। রক্ষকই ভক্ষক হয়ে ওঠে। অসহায় মানুষগুলোর আর্তস্বর তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে পারে না।

বড় অদ্ভুত ভেড়াদের জীবন! তারা পালিত জীব, কিন্তু আস্তানা পায় না। মাঠে জন্ম, মাঠে জীবন, মাঠেই মৃত্যু অথবা বিক্রি হয়ে যাওয়া। ভেড়িয়াররা তাই লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি মাঠে নিয়ে ঘোরে। স্বাভাবিকভাবে ডাকাত বা দস্যুর আক্রমণের মুখে পড়তে হয় তাদের। মুনসীদের গোঠে এমন হামলা হয়। পাঁচ-ছ'জনের ডাকাতদল লাঠি হাতে 'ম্যাড়াল' রামনা ভকতকে আক্রমণ করে কেড়ে নিতে চায় টাকা। মুনসীর তৎপরতায় ও বীরত্বে সব রক্ষা হয়। মুনসী মাথা ফেটে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে, অন্য বাগালীরা ভাবে রামনা ভকত বুঝি প্রাণ-ভয়ে পালিয়েছে নিরাপদ দূরত্বে। তাকে খুঁজে পাওয়ার পর জানা

যায়—'পরাণের ডরে লুকাই নাই বাপ—দুটি হাজার টাকা রয়েছে আমার পাশ, মালিকের টাকা, এ টাকা চোট হইলে আর মুখ দিখাতে নাই পারব।' নিষ্ঠা, কর্তব্য-বোধ, আত্ম-সচেতনতা মুগ্ধ করে, শ্রদ্ধাবনত করেএই ব্রাত্য মানুষগুলোর আত্মদর্শনের সম্মুখে। নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে মালিকের সম্পদ রক্ষার্থে মৃত্যু বরণকে শ্রেয় মনে করে এরা। তাই মুনসী অসম লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, রামনা ভকত প্রাণ বাজি রেখে অন্ধকার জঙ্গলে পালিয়ে যায়। হিংস্র শ্বাপদ কিংবা সাপের কামড়ে তার মৃত্যু হতে পারতো। কিন্তু মালিকের সম্পদ রক্ষা প্রাণ রক্ষার চেয়েও অগ্রগণ্য তাদের কাছে।

ঋতুবিবর্তনের নিয়মে গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহের মাঝে ভেড়ার গোঠ নিয়ে মনুসীরা যায় পুরুলিয়া জেলার জিতুজুড়ির মাঠে। এক গ্রীষ্মের দুপুরে যুধিষ্ঠির মাহাতো নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে গোঠের পদিনা ভকতের আলাপ হয়। ভেড়িয়াররা জানায় প্রখর গরমে কম্বল গায়ে দিলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। সাধারণ ধারণাবশত যুধিষ্ঠিরের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় না কথাটা। কিন্তু সে হঠাৎ বাজি ধরে বসে, যদি সে মিথ্যা প্রমাণিত হয় তবে দশ টাকা দেবে পদিনা ভকতকে। পরীক্ষায় সে হেরে কথা রাখে, পদিনা ভকত টাকাটি নিলেও চরম অস্বস্তিতে ভোগে। টাকাটি স্পর্শ করা মাত্র বিবেকের দংশনে জর্জরিত হতে থাকে। এই প্রথম এত সহজে সে জীবনে টাকা রোজকার করলো। এক ধরনের অপরাধ-বোধ সঞ্চারিত হতে থাকে তার মধ্যে—'আমি খাইটল্যম নাই, কুনো দিগদারি সইল্যম নাই, খামোখা দশটা ট্যাকা লিয়ে গুঁজে দিব ট্যাঁকে? উ ট্যাকা আমার সইব্যেক কপালে? মানুষ শুনলে ফোট্টন্টি বলবেক নাই আমাকে?' এমন সততায় যারা বিশ্বাসী, শত কষ্ট-যন্ত্রণা, অনাহারের মধ্যে থেকেও আত্মসম্মানটুকু অটুট রাখে, তারা ব্রাত্য!! অশিক্ষিত, ভদ্রেতর জনগোষ্ঠি বলে তাদের চিহ্নিত করে ভদ্রসমাজ! ধনবন্টনের অসাম্যে ও বর্ণবিন্যাসের কারণে আমরা এদের শত হস্ত দূরে সরিয়ে রেখেছি। কেন? এর উত্তর বোধ হয় একটাই—এরা আমাদের আত্মদর্শন করাতে চায়, আয়নায় নিজেদের মুখোশহীন মুখচ্ছবি দেখতে আমরা ভয় পাই বলে!

ভকত গোষ্ঠির মানুষগুলোর শ্রেণি-চেতনা-বোধ অত্যন্ত প্রখর। তাই মুনসীকে তার মালিক শ্রীকৃষ্ণ ভকত মেয়ে দুর্গার দাবি মেনে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, মুনসী সরাসরি না বলে, যদিও তার মানসী রুকমানিয়া দেশে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর তার থেকে বড় কারণ আত্মসম্মান-বোধের দৃঢ়তা। মুনসীর বাবা ভিখারী ভকত মালিক শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবে কেঁপে ওঠে। তার মনে হয় অফুরন্ত সুখ ও বৈভবের মূল্যে কিনতে চায় মুনসীকে। কারণ তাকে ঘরজামাই থাকতে হবে। যেন তাদের দয়া-দাক্ষিণ্যে প্রতিপালিত জন্তু। সীমাহীন নিঃস্বতার মধ্যেও কিছু আত্মগত ভাবনা আছে তাদের, যা মানুষগুলোর অস্তিত্বের মর্মকেন্দ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এদের শোষণের বাস্তবতাকে কখনোই অস্বীকার করা চলেনা। তবুও নিজেদের মতো করেই এরা সংগ্রামী। নিজেদের অস্তিত্ব, নিজস্বতার জায়গাটুকু সযত্নে লালন করে।

সময়ের দাবি মেনে কালপ্রবাহের ভকতদের মধ্যেও বিশেষত নতুন প্রজন্ম আর আগের মতো 'বাগালী' করে না। দাহো ভকত, রামনা ভকত আক্ষেপ করে—তাদের শত পুরুষ

ধরে চলে আসা পেশায় দায়বদ্ধতার অভাব লক্ষিত হয়। যার প্রতিনিধি লোটন ভকত, যে গোঠজীবনের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করে না। তার বেপরোয়া মনোভাবের জন্য মুনসীদের পালিয়ে আসতে হয়। তবু নিজেদের মতো করে তারা সামনে চলার পথ খুঁজে নেয়। কারণ বৃহৎ এই চারণভূমিতে সকলেই যে বিচরণশীল। থামা মানেই মৃত্যুর স্তব্ধতা। সুতরাং চলতে সবাইকে হবেই। এই চলমানতার পথেই আসে প্রভুদয়াল সিংহের মতো সামন্ত প্রভু। অর্থবল, লোকবলে সমাজের ব্রাত্য মানুষদের শোষণ করে। তাদের জন্ম-মৃত্যুও নিয়ন্ত্রিত হয় তারই হাতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পদানত করা যায় না তাদের। বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। রুকমিনিয়া বা পার্বতীরা তাদের প্রতিনিধি। আসলে মানুষ অত্যাচার মেনে নেয় না, পরিস্থিতির প্রতিকূলতায় সহ্য করে মাত্র। আবার বুক চিতিয়ে ফিরে আসে লড়াইয়ের ময়দানে। ভকত গোষ্ঠি এই লড়াই নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য করে ঘরে-বাইরে লড়াই। ব্রাত্য মানুষগুলোর জীবন-বোধ, আত্মদর্শন কোথাও কোথাও ভদ্রসমাজকে বিচলিত করে, চরম অস্বস্তির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ভগীরথ মিশ্র বলেছিলেন—

'প্যাচপেচে প্রেমের উপন্যাস লিখে গরিব দেশের কাগজ-কালির অপচয় ঘটাব না।'

লেখক কথা রেখেছেন। 'চারণভূমি' এমন এক ব্রাত্য জনজীবনের চলমানতার ইতিহাস। ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন প্রবাহে যাবতীয় বাধাকে অতিক্রম করে ছুটে চলাই মানুষের প্রকৃত জীবন-সত্য।

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। চারণভূমি—ভগীরথ মিশ্র
২। পদ্মানদীর মাঝি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

খাঁচার পাখির মুক্তি-উড়ান : প্রসঙ্গ 'হেমন্তের পাখি'

সাগরিকা ঘোষ

সমাজ-পরিবারে নারীর অবস্থান, যন্ত্রণা, সংকট, সংগ্রাম, সংঘর্ষ জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের রচনায় এক ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। 'হেমন্তের পাখি' তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গৃহবধূ অদিতি সাংসারিক কর্মব্যস্ততায় হারিয়ে ফেলে নিজ সাহিত্যিক সত্তা। পুনরায় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলে বাধা আসে মূলত স্বামী সুপ্রতিমের দিক থেকে। স্বামীকে পাশে পায় না অদিতি। সংসারের খাঁচায় আবদ্ধ অদিতির অসহায়তা ব্যঞ্জিত হয়েছে খাঁচায় বন্দি টিয়াপাখির প্রতীকে । তবে নঞর্থকতায় নয়, লেখিকা উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এক সদর্থক মনোভঙ্গির সঞ্চারে। সাহিত্য সৃজনেই অদিতি আত্মিক মুক্তি লাভ করে। সাংসারিক সীমাবদ্ধ তাকে অতিক্রম করে ডানা মেলে উন্মুক্ত সাহিত্যাকাশে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাকার সুচিত্রা ভট্টাচার্য। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বিহারের ভাগলপুরে তাঁর জন্ম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর লেখালেখির প্রতি আগ্রহ দেখা যায় । তবে বিয়ের পর কিছুকাল লেখা বন্ধ রাখেন। কঠিন জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে প্রথম পর্বে জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা ছোটোখাটো কাজ করেন । শেষে যোগ দেন সরকারি চাকরিতে। তবে ২০০৪ সালে চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে নিজ কর্মজীবনের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ সত্তরের দশকের শেষপর্বে (১৯৭৮-১৯৭৯)। উপন্যাস রচনার সূচনা আশির দশকের মাঝামাঝি। 'কাঁচের দেওয়াল' উপন্যাসটি তাঁকে পাঠকসমাজে বিশেষ পরিচিতি দেয়। সারাজীবনে সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রায় চব্বিশটি উপন্যাস ও অজস্র ছোটগল্প লেখেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের পাখি', 'কাছের মানুষ', 'দহন', 'নীল ঘূর্ণি', 'অলীক সুখ', 'গভীর অসুখ', 'উড়ো মেঘ', 'ছেঁড়া তার', 'আলোছায়া', 'অন্য বসন্ত' ,'পরবাস', 'পালাবার পথ নেই ', 'আমি রাইকিশোরী', 'রঙিন পৃথিবী', 'জলছবি' ইত্যাদি। গোয়েন্দা কাহিনি রচনাতেও তিনি নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যে হাতেগোনা কিছু মহিলা গোয়েন্দা চরিত্রের মধ্যে তাঁর সৃষ্ট মিতিন মাসি অন্যতম। মিতিন মাসি ও তার সহকারী টুপুর পাঠকদের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মিতিন মাসি সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'সারান্ডায় শয়তান' । অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে আছে 'সর্প-রহস্য সুন্দরবনে', 'ঝাও ঝিয়েন হত্যারহস্য', 'দুঃস্বপ্ন বারবার', 'স্যাণ্ডর সাহেবের পুঁথি' ইত্যাদি। মিতিন মাসি সিরিজের গল্প-উপন্যাসগুলি ছোটোদের ভীষণ পছন্দের। তবে মিতিন মাসিকে নিয়ে তিনি বড়োদের জন্যও লিখেছেন। বড়োদের জন্য লেখা প্রথম উপন্যাস 'মারণ বাতাস' ।

তাঁর বেশকিছু রচনা ইংরেজি, হিন্দি, মরাঠি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম,

পাঞ্জাবি, গুজরাটি ইত্যাদি নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে সমাদৃত হয়েছে। ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনায় 'দহন', ঊর্মি চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'হেমন্তের পাখি', শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের পরিচালনায় 'অলীক সুখ' এবং 'ইচ্ছের গাছ' ছোটগল্প অবলম্বনে নির্মিত 'ইচ্ছে' দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে । সারাজীবনে সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ লাভ করেন বহু পুরস্কার ও সম্মান। ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে ব্যাঙ্গালোর ও দিল্লি থেকে পান নানজানগুদু থিরুমালাম্বা জাতীয় পুরস্কার ও কথা পুরস্কার। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে তারাশঙ্কর পুরস্কার, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে কল্যাণী থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পুরস্কার এবং ২০০২ খ্রিস্ট াব্দে ভাগলপুর থেকে শরৎ পুরস্কার লাভ করেন । ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদকে সম্মানিত করে। ঐ একই বছরে তিনি ভারতনির্মাণ পুরস্কার, সাহিত্যসেতু পুরস্কার এবং শৈলজানন্দ স্মৃতি পুরস্কারও লাভ করেন। মতি নন্দী পুরস্কার ২০১২ খ্রিস্টাব্দে এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে পান দীনেশ চন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার।১

শহুরে মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনকাহিনি সুচিত্রা ভট্টাচার্যের রচনার মূল প্রতিপাদ্য । বর্তমান প্রজন্মের মূল্যবোধের অবনমন , নানা সামাজিক অবক্ষয় , নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, বিশেষত সমাজ-পরিবারে নারীর অবস্থান তাঁর লেখায় বারবার ঘুরেফিরে আসে । নারীর আত্মিক সংকট, নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা, দৈনন্দিন সংগ্রাম-সংঘর্ষ তাঁর কথাসাহিত্যে এক ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে । বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য তাঁর অন্যতম নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস 'হেমন্তের পাখি' (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ)।

'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসে এসেছে গৃহবধূ অদিতির কথা। স্বামী সুপ্রতিম এবং দুই ছেলে পাপাই-তাতাইকে নিয়ে তাঁর সংসার জীবন পরিপূর্ণ। আরো আগে শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদরাও তার পরিবারভুক্ত ছিল। ক্রমশ দেওর-ননদরা বিয়ে করে পৃথক সংসার গড়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি মারা যান। বিবাহিত জীবনে অদিতি সুখী ছিল কি ছিল না— এ চিন্তা পূর্বে তাকে নাড়া দেয়নি। কেননা শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা, রান্না করা, ছেলেদের পড়াশোনা তদারকি করা ইত্যাদি সমস্ত একা হাতে সামলে নিজের কথা ভাবার কোনো সময় অদিতির ছিল না। বিবাহিত জীবনের তেইশটি বছর সে প্রবল ব্যস্ততার মধ্যেই পার করে ফেলে।

এতদিনে পাপাই-তাতাই কলেজে উঠে গেছে, সুপ্রতিমও চাকরিতে উন্নতি করেছে, বাড়িতে রান্নার লোক বহাল হয়েছে। তাই অদিতিও কিছুটা অবসর লাভ করে। ছোটো মামার বন্ধু হেমেনমামার উৎসাহে অদিতি তার পুরোনো অভ্যাসে ফিরে যায়। সে গল্প লেখা শুরু করে এবং হেমেনমামার ব্যবস্থাপনায় সেগুলি নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হেমেনমামা তাকে নানা সাহিত্যসভায় নিয়ে যান, তার বাড়িতেও নিয়মিত সাহিত্যের আসর বসে। এক অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ করে অদিতি। নিজেকে তথা নিজের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি-উপলব্ধিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্র খুঁজে পায় সে। সুপ্রতিমের স্ত্রী বা পাপাই-তাতাইয়ের মা হয়ে ওঠে লেখিকা অদিতি মজুমদার। সময় কাটানোর উপায় বা শখের লেখা হয়ে ওঠে তার সাধনা। লেখার মান বাড়াতে সে পড়াশোনাও শুরু করে। লেখার পেছনে আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় দেয়। শুধু দুপুরেই নয়, রাত জেগেও এখন সে লেখালেখি করে। কিন্তু বিবাহিতা

বাঙালি নারীর চলার পথ কি এতটা মসৃণ হওয়া সম্ভব? বোধ হয় না। অদিতির ক্ষেত্রেও তা হয় না। যতদিন অদিতি কেবল অবসর সময়ে লেখালেখি করতো এবং মাঝেমধ্যে সাহিত্যসভায় যেতো, ততদিন সুপ্রতিম তাকে উৎসাহিতই করেছে। লেখালেখিকে কেন্দ্র করে অদিতির যখন নিজস্ব বৃত্ত গড়ে উঠছে, অনিবার্য সংঘাত বাধে সুপ্রতিমের সঙ্গে। নিজ বিত্ত এবং স্ট্যাটাস সম্পর্কে সচেতন সুপ্রতিম আচার-আচরণ, কথাবার্তা, জীবন-যাপনে আধুনিক ভাবধারার পরাকাষ্ঠা হলেও মানসিকতা তথা চিন্তা-চেতনায় ভীষণভাবে পুরুষতান্ত্রিক। অদিতির রাত জেগে লেখা, হেমেনমামার সঙ্গে সাহিত্যসভায় যাওয়া বা বাড়িতে সাহিত্যের আসর বসানো সুপ্রতিম পছন্দ করে না। তার বক্তব্য, ''মেয়েদের একটু দূরত্ব রেখে চলাই ভাল। এতে সম্মান বাড়ে, সংসারেরও বনেদটা শক্ত থাকে।''[২] অদিতির চলাফেরার গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দিতে চায় সুপ্রতিম, ঠিক যেমনভাবে মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংসার-সম্মানের প্রলোভন দেখিয়ে, অসম্মান-লজ্জার ভয় দেখিয়ে নারীকে অন্তরিন করে রেখেছিল। সেই মধ্যযুগীয় মানসিকতা নিয়েই সুপ্রতিম মনে করে সংসারের খাঁচায় বন্দি জীবনেই নারীর সার্থকতা-সম্মান। নারী যেন প্রাচীন বর্ণবিভাজিত সমাজব্যবস্থার চতুর্থ বর্ণ শূদ্র, অন্য বর্ণের সেবাতেই যাদের জীবনের চরম সার্থকতা। শ্রেণিপরিচয়েই তারা পরিচিত, ব্যক্তিমানুষের পরিচয় বা সম্মান তাদের প্রাপ্য নয়। নারীও অনুরূপভাবে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের প্রতিটি চাহিদা নিখুঁতভাবে পূরণ করে, তাদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানেই জীবনপাত করে; অথচ তাদের মনের খবর কেউ রাখে না বা রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। পাপাই-তাতাইয়ের পড়াশোনা, সুপ্রতিমের চাকরির টেনশন, প্রত্যেকের খাওয়া-দাওয়া, শরীর-স্বাস্থ্য, ভালো লাগা-মন্দ লাগা ইত্যাদি সমস্তদিকেই অদিতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কিন্তু অদিতির মান-অপমান-অভিমান-ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সুপ্রতিম বা পাপাই-তাতাইয়ের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। পাপাই-তাতাই নিজেদের জগতে ব্যস্ত, ভবিষ্যৎ-স্বপ্নে বিভোর। আর সুপ্রতিম চলে নিজের মধ্যযুগীয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা। স্ত্রীকে সে ক্রীড়নক মনে করে, ব্যক্তিমানুষের স্বীকৃতি দিতে পারে না। তার উপার্জনেই সংসার চলে, তাই সেই পরিবারে শেষকথা বলার অধিকারী। অদিতি তার সংসারে পেটভাতের দাস । সংসারের পেছনে অদিতির প্ররিশ্রমের কোনো অতিরিক্ত মূল্য তার কাছে নেই। সমাজে নারীর এই ট্র্যাজেডি চিরকালীন। নারী তার একান্ত নিষ্ঠা-পরিশ্রম-আন্তরিকতায় পরিপাটি করে সংসার গড়ে তোলে, তাকে সচল রাখে। বিনিময়ে কোনো পরিশ্রমিক সে পায় না। অথচ আমাদের সমাজে সব কাজেরই গুরুত্ব অর্থের মাপকাঠিতে বিচার্য। সেই কারণে সংসারে নারীর বেগার পরিশ্রমের গুরুত্বও সমাজে স্বীকৃত নয়। লিঙ্গ-বিভাজিত সমাজে পুরুষ অবতীর্ণ শাসকের ভূমিকায় , নারী শাসিতের। তাই অবলীলায় গর্জে ওঠে শাসক পুরুষের কণ্ঠস্বর—

''তোমার বাপ দাদা এই ফ্ল্যাট উইল করে দিয়ে যায়নি। এটা আমার রোজগারের টাকায় করা, বুঝেছ ?...

—চোপ । একটা কথাও নয় । মাগ্‌না খাটছ ? যা চাও তাই তো দেওয়া হয় । সুপ্রতিম অসংলগ্ন স্বরে চেল্লাচ্ছে ,—আমার ফ্ল্যাটে এ সব আর চলবে না ।''[৩]

লজ্জায়-অপমানে জেরবার হয়ে যায় অদিতি। তার তেইশ-চব্বিশ বছরের বিবাহিত জীবনের বিশ্বাসের ইমারত ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এতদিনের চেনা 'সাদা মনের মানুষ'[৪] সুপ্রতিমকে মনে হয় 'অচেনা দানব'[৫]। হেমেনমামাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয় সুপ্রতিম, অদিতির সাহিত্যসভায় যাওয়া নিষিদ্ধ করে। এছাড়া পাপাইয়ের অনৈতিক কাজকর্মে সুপ্রতিমের সমর্থন এবং অফিস সম্পর্কে তার মন্তব্যে অদিতি যেন নতুন করে তাকে চেনে—"সৎ কর্মঠ স্বামীকে নীতিহীন, শিরদাঁড়াবিহীন, চোরের বন্দনাকারী এবং অন্তঃসারশূন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছিল অদিতির।"[৬]

কেবল অদিতির মতো উপার্জনহীন মহিলাদের ক্ষেত্রেই নয়, উপার্জনশীল মহিলাদের ক্ষেত্রেও সংসারজীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। তাই দেখি অদিতির সহপাঠী সুজাতাকেও বিয়ের পর হাইকোর্টের প্র্যাকটিস ছাড়তে হয়। কেননা সিনিয়র উকিলের (অবশ্যই পুরুষ) সঙ্গে এক চেম্বারে দীর্ঘক্ষণ কাটানো এবং দেরি করে বাড়ি ফেরায় সংসারের কাজ করতে না পারা সুজার শ্বশুর-শাশুড়ি মেনে নিতে পারে না। স্বামীর সমর্থনও সুজাতা পায় না। সবদিক বজায় রাখতে সে হাইকোর্টের প্র্যাকটিস ছেড়ে রেলের চাকরি নেয়। শ্বশুরবাড়িতে তার উপার্জিত অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম, গুরুত্বহীন কেবল সে। চাকরিজীবী মহিলাদের একই সাথে ঘর-বাহির সামলাতে হয়। নারী-পুরুষের পাশাপাশি তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষ বাইরে কাজ করে কেবল অর্থ উপার্জনই করছে, সংসারের কাজে তার বিশেষ অবদান নেই। চাকরিজীবী নারীর কিন্তু বাড়ি ফিরেও রেহাই নেই। তাকে সঙ্গে সঙ্গে সংসারের কাজে লেগে যেতে হয় বা সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজের প্রতি নজর রাখতে হয়। তার বিশ্রামের কোনো অবসর নেই। সুজাতার পরিণতি কি আর পাঁচ জন চাকরিজীবী মহিলার ক্ষেত্রে সত্যি নয়?—আমরা ভাবতে বাধ্য হই। সুজাতার উপলব্ধি, 'ঘর বার দুটো একসঙ্গে সামলানো হল গিয়ে দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা,'[৭] 'সার্কাসের খেলা'[৮] দেখানো।

সুপ্রতিমের পাশাপাশি পাপাই-তাতাইকেও অদিতি নতুনভাবে আবিষ্কার করে। বাবার মতো দুই ছেলেরই জীবনের মোক্ষ অর্থ উপার্জন। অদিতিকে বিশেষভাবে হতাশ করে বড়োছেলে পাপাই। সে ভীষণভাবে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনায় মশগুল। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও চাকরির জন্য পাপাই বিদেশে যেতে চায় এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করার আকাঙ্ক্ষা রাখে। দেশ বা পরিবারের পিছুটান তাকে দুর্বল করতে পারে না। "অদিতির বড় দর্প ছিল তার ছেলেরা শুধু লেখাপড়াতেই ভাল হয়নি তাদের চরিত্রও দৃঢ়ভাবে গড়ে দিতে পেরেছে অদিতি"[৯]—নানা ঘটনা পরম্পরায় অদিতির এই বিশ্বাসও ভেঙে পড়ে। সে জানতে পারে, একাধিক মেয়ের সঙ্গে পাপাই সম্পর্কে রেখে চলে এবং প্রয়োজন ফুরোলে তাদের 'বাজে মেয়ের'[১০] তকমা দিতে এক মুহূর্তও চিন্তা করে না।

স্বামী বা সন্তান কারো সঙ্গেই অদিতির মানসিকতায় মেলে না। কেউই তার মনকে ছুঁতে পারে না। পরিবারের সকলের মাঝে থেকেও প্রবল নিঃসঙ্গতাবোধ সঙ্গী হয় তার। মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতায় কয়েকটি লাইন—

"সকল লোকের মাঝে ব'সে/ আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা।"[১১]

খবরের কাগজে নিজের লেখা বেরোনোর খবরে অদিতি যারপরনাই আনন্দিত হয়।

কিন্তু সেই আনন্দ সে পরিবারের কারো সঙ্গেই ভাগাভাগি করতে পারে না। আর তাই—

''পরদিন খুব ভোরে, গোটা ফ্ল্যাট যখন ঘুমিয়ে আছে, অদিতি বেরিয়ে পড়ল নিঃসাড়ে। বাড়িতে খবরের কাগজ আসার এখনও অনেক দেরি, তার আগেই নিজের গল্পটাকে একবার ছুঁতে চায় অদিতি। একা।"[১২]

নারীর একাকিত্বের পাশাপাশি অপর যে গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি লেখিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন, তা হল নারীর বিশেষত সংসারী নারীর লেখালেখির ক্ষেত্র। অদিতিকে সংসারের সবদিক সামলে, সকলের মন জুগিয়ে অবসর সময়ে লেখালেখি করতে হয়। অথচ লেখাকে নেশা করতে হলে তার পেছনে অনেক সময় দেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য দরকার অনেক পড়াশোনা, নিয়মিত অনুশীলন এবং সাহিত্যসভায় গিয়ে অন্যদের সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান। সংসারের নানা ঝামেলায়, বিশেষত সুপ্রতিমের অসহযোগিতা ও বিরোধিতায় অদিতি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। নারীর জন্য পুরুষের নির্ধারিত লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করার শক্তি হারিয়ে ফেলে সে লেখা ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । অথচ একজন পুরুষ লেখকের চলার পথটি কিন্তু এমন প্রতিকূল নয়। আমরা বুঝতে পারি, একজন নারীকে লেখিকা হয়ে উঠতে কতটা বন্ধুর পথ পেরোতে হয়। তবে এই নেতিবাচকতায় নয়, লেখিকা উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এক সদর্থক মনোভঙ্গির সঞ্চারে। খাঁচার পাখির দূর আকাশে উড়ে যাওয়া দেখে অদিতি নিজ সিদ্ধান্ত বদলায়।

আলোচ্য উপন্যাসে পাখি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে । সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই নানা প্রসঙ্গে বারবার পাখির কথা এসেছে। চরিত্রের পাশাপাশি উপমা, রূপক, চিত্রকল্প হিসেবে তা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। আলোচ্য উপন্যাসের নামকরণে পাখির প্রসঙ্গ এসেছে। গল্প লেখা ছাড়া অদিতির অপর শখটি হল পাখি পোষা। ইতিপূর্বে সে ময়না ও মুনিয়া পাখি পুষেছিল। কিন্তু কেউই তার ইচ্ছাপূরণ করতে পারেনি। এবার সে বেশ দাম দিয়ে একটি টিয়াপাখি কিনে আনে এবং তাকে কথা বলানোর, শিস দেওয়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যায়। দীর্ঘদিন পাখি কথা না বলায় অদিতিকে স্বামী-সন্তানের কাছে 'বেইজ্জতের একশেষ।'[১৩] হতে হয়। তবে টিয়া তার সম্মান রাখে। এক হেমন্তে অদিতি তাকে কিনে আনে এবং ঠিক এক বছরের মাথায় পরের হেমন্তে গিয়ে তার মুখে বুলি ফোটে। একটিই শব্দ পাখি বলতে শেখে– 'খুকু', যে নামে অদিতিকে ডাকে তার দাদা অলকেশ। পাখির এই ডাক যেন অদিতির মনে দিয়ে যায় স্নেহের কোমল স্পর্শ।

দুপুরবেলার অনেকটা সময় অদিতি টিয়ার সঙ্গে কাটায়। তাকে কথা বলানোর চেষ্টা করে, তার সঙ্গে মনের কথা বলে। পাখির বুনো স্বভাব ধীরে ধীরে দূর হয়। বাড়িতে সবার মধ্যে টিয়া অদিতিকেই চেনে সবচেয়ে বেশি। দুপুরবেলায় অদিতিকে দেখতে না পেলে চিৎকার শুরু করে। আবার অদিতি সামনে গেলেই টিয়া চুপ, যেন এক নিমেষে সমস্ত মান-অভিমান-অভিযোগ ভুলে সে শান্ত-স্থির।

এই উপন্যাসে খাঁচায় বন্দি টিয়া পাখি যেন একটি প্রতীক হিসেবে উঠে এসেছে । তা যেন সংসারের খাঁচায় নিঃসঙ্গ অদিতির বন্দিদশাকেই ব্যঞ্জিত করছে। টিয়ার ওপর

হুলোবেড়ালের অতর্কিত আক্রমণ আর অদিতির প্রতি সুপ্রতিমের অভব্য আচরণকে লেখিকা যেন মিলিয়ে দিয়েছেন। হুলোবেড়ালের আক্রমণে খাঁচার টিয়া ভীষণভাবে আহত হয়, গভীর ক্ষত তৈরি হয় তার বাম ডানায়। যন্ত্রণায় খাঁচার ভিতর পাখি টলতে থাকে। অন্যদিকে হেমেনমামা এবং তরুণ লেখক রঞ্জনকে বেডরুমে বসানোর জন্য সুপ্রতিম ছেলেদের সামনেই অদিতিকে অপমান করে, অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হয় অদিতি। সুপ্রতিম ও পাপাই-তাতাইয়ের সেবায় ধীরে ধীরে সেরে ওঠে পাখি। অদিতিও মনের কষ্ট ভুলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এক বছর পরে হলেও এবং একটি শব্দ হলেও পাখির মুখে বুলি ফোটে। পাখি প্রমাণ করে যে সে বোবা নয়। অদিতিও দীর্ঘদিন লেখালেখি বন্ধ রাখলেও হেমেনমামার উৎসাহ ও তাগাদায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে এসে গল্পলেখা শুরু করে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। অদিতি লেখার শখকে সাধনায় পরিণত করে। তাই শুধু দুপুরে নয়, সারাদিন সে লেখার কাজে ব্যস্ত থাকে। সংসারের কাজে বেশি সময় ব্যয় করে না। সুপ্রতিমের দেওয়া আঘাত ভুলে লেখার কাজে ব্যস্ত অদিতির সাবলীলতাকে লেখিকা খাঁচায় বন্দি পাখির তেজের প্রতীকে ব্যঞ্জিত করেছেন —

''পাখির আজকাল তেজও বেড়েছে। খুব ডানা ঝাপটায়, ঝটপট ঝটপট শব্দে তোলপাড় হয় খাঁচা। চট করে দেখে মনেও পড়ে না কোন ডানাটা কমজোরি হয়েছিল টিয়ার, কোথায় বা থাবা বসিয়েছিল বেড়াল।"[১৪]

ছেলেবেলার গল্প লেখার সমস্ত পুরোনো খাতা, স্কুল-কলেজের ম্যাগাজিন হাতে পেয়ে অদিতির আনন্দ বাঁধ ভাঙে। তার মনের সীমাহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে লেখিকা কুবো পাখির ডেকে চলার সঙ্গে তুলনা করেছেন —

''অদিতি আঙুল বোলাচ্ছে পাতায়, অক্ষরগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছে। অক্ষর, না প্রাণ? অক্ষর, না সময় ? অক্ষর, না স্মৃতি? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাতারা বিবর্ণ, হলদেটে, নীল কালির আঁচড় ফিকে অনেক, তবুও কী মুখর! অসংখ্য স্মৃতি ছুটে এল টগবগিয়ে, তিরতির করে, দুলতে দুলতে। অদৃশ্য এক কুবো পাখি ডেকে চলেছে বুকে। কুব কুব কুব কুব।"[১৫] সাহিত্যরচনা সংসারের খাঁচায় আবদ্ধ অদিতির কাছে 'এক চিলতে প্রভাতী কিরণে'[১৬] র মতো, তা যেন এক প্রসারিত আকাশের বার্তা বয়ে আনে, যেখানে অদিতি স্বাধীনভাবে ডানা মেলার স্বাদ অনুভব করে। সুপ্রতিমের বারংবার অপমানে জীবনের প্রতি বিরক্ত-বিষণ্ণ অদিতি তার সবচেয়ে কাছের সঙ্গী টিয়াকে নিজের কাছছাড়া করে, তাকে খাঁচা থেকে মুক্তি দেয়। অদিতিকে অবাক করে দিয়ে প্রবল শীত উপেক্ষা করে দীর্ঘ এক বছরের অনভ্যাসকে কাটিয়ে উঠে দুর্বল ডানা মেলে টিয়া দূর আকাশে উড়ে যায়। টিয়ার কাছে অদিতি জীবনের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজ লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। তাই হেমেনমামাকে লেখা ব্যর্থতাসূচক চিঠি ছিঁড়ে কুটি কুটি করে শূন্যে ভাসিয়ে দেয় সে।

প্রাণবন্ত শরৎ ও জরা শীতের মাঝে শুষ্ক-নিশ্চেতন হেমন্ত যেন জীবনের প্রতিকূলতার প্রতীক। এক হেমন্ত থেকে আর এক হেমন্ত পর্যন্ত পাখি খাঁচায় বন্দিজীবন যাপন করে। হেমন্তের পাখি শীতে এসে আকাশে পাখা মেলে– এই প্রতীকে জীবনের যন্ত্রণা, অসহায়তা

তথা যাবতীয় প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সদর্থকতায় নারীজীবনের উত্তরণ ঘটিয়েছেন লেখিকা। গৃহবধূ অদিতি আত্মিক মুক্তি খুঁজে পায় সাহিত্যসৃজনে। সাংসারিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ডানা মেলে উন্মুক্ত সাহিত্যাকাশে।

তথ্যসূত্র :

১। Suchitra Bhattacharya, Retrieved from : https :// en. m. wikipedia. org > wiki>Suchi..., Accessed on : 05.12.17,Time 7.00 A.M.

২। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৮৫

৩। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৮২

৪। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৩৭

৫। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৫৪

৬। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৬৯

৭। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৪৬

৮। প্রাগুক্ত ।

৯। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৭১

১০। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৭৩

১১। দাশ, জীবনানন্দ, 'বোধ', জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দশম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১০/ আগস্ট ২০০৩, গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, কলকাতা-৭৩, পৃঃ ১৯

১২। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৭৮

১৩। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড , কলকাতা-০৯, পৃ. ৪০১

১৪। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৭৮

১৫। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৫৯-৪৬০

১৬। ভট্টাচার্য, সুচিত্রা, 'হেমন্তের পাখি', দশটি উপন্যাস, চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৫, সুবীরকুমার মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪৮৮

প্রসঙ্গ ঃ বাংলা ভাষা-সংস্কৃতি চর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পীযূষ কান্তি অধিকারী

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় এক দিক্‌পাল ব্যক্তিত্ব হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭)। যে প্রতিভার সূর্য ১৮৯০ সালের ২৬ শে নভেম্বর হাওড়ার শিবপুরে একদিন উদিত হয়েছিল, সেই দীপ্ত জ্যোতি ধীরে ধীরে দিগন্তের কোন ছেড়ে বিশ্ব ভাষা-সংস্কৃতিকেও আলোকিত করে। বাঙালি হিসেবে যা আমাদের বড় গর্বের বিষয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইংরেজী ভাষা সাহিত্যের উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স সহ ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে বি. এ পাস করেন এবং ১৯১৩ সালে ইংরেজী সাহিত্যে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাস করেন। ১৯১৬ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য তাঁর রচিত গবেষণামূলক নিবন্ধ 'An Historical Comparative Grammar of the Bengali Language' দিয়েই ভাষা-চর্চার জগতে পথচলা শুরু হয়। এরপর তাঁর প্রতিভার আলোয় একের পর এক উদ্ভাসিত হতে থাকলো বাংলা ভাষার নানা দিক-দিগন্ত।

আমরা জানি 'ভাষা' শব্দটি এসেছে 'ভাষ্' ধাতু থেকে। এই 'ভাষ্' ধাতুর অর্থ হল 'কথা বলা' (To speak)। সুতরাং বলাযায় আমরা যা বলি তাই ভাষা। ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে ভাষা বিজ্ঞান চর্চার গৌরব থাকলেও মধ্যযুগের শেষ দিকে তাতে ভাটার টান পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য আধুনিক যুগে অবিভক্ত বাংলায় ভাষা বিজ্ঞান চর্চায় যে নব জোয়ার আসে তাতে দু'টি ধারা দেখা যায়—(১) ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা, এবং (২) বর্ণনামূলক ও অন্যান্য আধুনিক ধারা। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় প্রথম ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। আর এভাবে তাঁর হাত ধরেই ভাষা বিজ্ঞান চর্চায় ভারতের প্রাচীন গৌরব পুনরুজ্জীবন লাভ করে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, এই বাঙালি মনীষীর হাতে ভাষাবিজ্ঞানে ভারতের প্রাচীন গৌরব পুনরুজ্জীবিত হলেও, তাঁর মধ্যে আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানক দৃষ্টিভঙ্গি দারুণভাবে লক্ষ্য করা যায়। ড. রামেশ্বর শ' যথার্থই বলেছেন : "প্রাচীন ভারতকে অন্ধ ধর্মীয় দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির মোহমুক্তি নিয়ে তার বিচার ও মূল্যায়ন করাও তাঁর পুনরুজ্জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই পুনরুজ্জীবনের অর্থ প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণের নবীভূত চর্চা নয়, নিজের মৌলিক সৃষ্টির দ্বারা স্বদেশী ঐতিহ্যের সমৃদ্ধি সাধন। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা বাংলার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ রচনা করেন। ভাষা বিজ্ঞানের মধ্যে যে শাখাটি সবচেয়ে বেশী বৈজ্ঞানিক বিধিবিধানের আওতায় পড়ে তা হল ধ্বনি বিজ্ঞান (Phonetics)। এবং সেই ধ্বনিবিজ্ঞানেই আধুনিক পদ্ধততে শিক্ষালাভ করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন সে-যুগে, এবিয়ে পাশ্চাত্যে যিনি সবচেয়ে বেশী গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করেছিলেন সেই ডানিয়েল্ জোন্‌সের (Daniel Jones) কাছে।"[১]

ইংরেজী ভাষায় সুপরিচিত সুনীতিকুমার রাজ্য সরকারের সংস্কৃত পরিষদের বৈদিক সংস্কৃতে 'মধ্য' পরীক্ষা পাস করায় ভারতীয় ভাষা-সাহিত্যের মূল উৎসের সঙ্গেও তাঁর

 Vol. IV Issue-VII / ISSN : 2394-4889

নাড়ীর যোগ প্রাণের সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচ্যবিদ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত সুনীতিকুমার এরপর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন, ১৯২১ সালে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়ে ছিল—'Indo-Aryan Linguistic–The Origin and Development of the Bengali Language." এটিই ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবর্ধিত পরিমার্জিত হয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়। এই অমূল্য গ্রন্থ রচনায় তিনি একজন অগ্রণী আচার্য জ্যুল্ ব্লকের (Jules Block) কাছে ঋণী ছিলেন। জ্যুল ব্লকের মারাঠী ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ 'Formation de la Langu Marathe'-এর কাঠামোটি তিনি তাঁর গ্রন্থে গ্রহণ করেছিলেন।[২]

"পাশ্চাত্যে শিক্ষালাভ করতে গিয়ে সুনীতি কুমার সে সময়ের বিশ্ববিখ্যাত বেশ কয়েকজন মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি শিক্ষক হিসেবে পান জ্যুল ব্লক, ডি. এল. বার্ণেট, ডেনিয়েল জোন্‌স, আঁতোয়া মেইয়ে প্রমুখকে। এই সকল বিশ্ববরেণ্য ভাষা বিজ্ঞানীর সাহচর্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আনে গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং বিশ্বব্যপ্তি। শুধু ভাষা বিজ্ঞানই নয় নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজ বিদ্যায়, প্রাচীন ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। তিনি ব্যাপ্তিতে যেমন দেশের সীমা অতিক্রম করেছেন, তেমনি তিনি বিজ্ঞান-নিষ্ঠায় ধর্মের গণ্ডি অতিক্রম করেছেন। তাইতো আমরা দেখি অতি শ্রদ্ধার বশে বালগঙ্গাধর তিলক স্বল্প যুক্তির উপর ভর করে বেদের ঋক্‌সংহিতার রচনাকাল ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলে ঘোষণা করলেও সুনীতিকুমার যুক্তির মানদণ্ডে ভর করে, ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঋক্-সংহিতার সূক্তগুলির রচনা কাল ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের আগে নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য হল :

"আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহাসিক বিচার, এই দুইটি হইতেছে বিভিন্ন পর্যায়ের বস্তু, ... অন্ধ বিশ্বাস প্রণোদিত একের সঙ্গে অপরের মিশ্রণে আধ্যাত্মিকতা ও ইতিহাস উভয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে, মানবীয় ভাষায় রচিত কোনও রচনা-সম্পুটের আলোচনা করিতে গেলে, উহাকে মানব-চিত্তের ও মানব-সংস্কৃতির প্রকাশত Human Science বা 'মানবী বিদ্যা' অথবা 'মানবিকী'র অংশ বলিয়াই ধরিতে হয়। প্রতিভার দিব্য দীপ্তি থাকিলে, ...মানবিকীকে যদি.... অপৌরুষেয় বলি, তাহাতে শ্রদ্ধা ও আস্থা এবং ধর্মবোধ তৃপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিতর্কমূলক বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিচার ও আলোচনার পথ তাহাতে অনেকটা রুদ্ধ হইয়া যায়।"[৩]

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার মধ্যভারতীয় আর্যভাষার বিবর্তনকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে তার চারটি উপ-পর্ব তিনি স্থির করেছেন :[৪]

ক) প্রথম পর্ব (Early Stage) : ৬০০ খ্রীঃপূঃ-২০০ খ্রীঃপূঃ;

খ) উৎক্রান্তি পর্ব (Transitional Stage) ২০০ খ্রীঃপূঃ-২০০খ্রীঃ;

গ) দ্বিতীয় পর্ব (Scond Stage) : ২০০ খ্রীঃ-৬০০খ্রীঃ এবং

ঘ) তৃতীয় পর্ব (অপভ্রংশ) (Third Stage) : ৬০০ খ্রীঃ—১০০০খ্রীঃ।

ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর সংক্ষিপ্ত অতি মূল্যবান এক আলোচনায় মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা-তত্ত্বের ক্ষেত্রে সুনীতিকুমারের আরো একটি সংযোজনার কথা উল্লেখ করেছেন।[৫]

তিনি দেখিয়েছেন, তাঁর Fortunavo's Law-এর পরিবর্ধন মাগধী প্রাকৃতে 'র্'-এর উচ্চারণ যে 'ল্' হয়ে যায় তার সঙ্গে র্-এর প্রভাবে দন্ত্যবর্ণের মূর্ধন্যভবনের যোগ রয়েছে। মধ্যভারতীয় ও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় অর্ধতৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার তাঁর বর্ণনা থেকেই আমরা প্রথম জানতে পারি।

ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে সুপরিচিত। তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language" গ্রন্থে তিনি শুধু বাংলা ভাষার ইতিহাস, ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) ও রূপতত্ত্ব (Morphology) নিয়ে দারুণভাবে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বাংলা ভাষার শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) এবং বাক্যগঠনতত্ত্ব (Syntax) নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি। আর এই আলোচনা না করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষা বিজ্ঞানী ড. রামেশ্বর শ' বলেছেন : " শব্দের অর্থ পরিবর্তন অনেকটাই মানবমনের খেয়ালখুশির উপরে নির্ভর করে, তাকে ধ্বনি-পরিবর্তনের মতো বৈজ্ঞানিক সূত্রে বাঁধা যায় না। এই কারণে আধুনিক ভাষা বিজ্ঞানে কেউ কেউ শব্দার্থতত্ত্বকে (Semantics) ঠিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত বলে স্বীকার করতে চান না, তাকে মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের এলাকায় সরিয়ে দিতে চান।.....আর বাংলা বাক্যগঠনরীতি (Syntax) সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করেননি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, রূপতত্ত্বের আলোচনাতেই তিনি এ সম্পর্কে কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন।"

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানী রূপে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার আমাদের কাছে বেশী পরিচিত হলেও তাঁর কিছু গ্রন্থে এককালিক বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ (Synchronic Descriptive Analysis) দারুণভাবে চোখে পড়ে। তাঁর 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' এবং 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থ দু'টিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও অনেকটাই ছিল বর্ণনামূলক। এই জ্ঞান—তাপস ভাষাবিজ্ঞানী সারাজীবন ২০টিরও বেশী ইংরেজী গ্রন্থ এবং অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থ পাঠককে উপহার দিয়েছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নামে এখানে দেওয়া হল ঃ

১। ODBL (১৯২১)
২। Bengali Self Taught (১৯২৭)
৩। A Bengali Phonetic Reader (১৯২৮)
৪। Bengali Phonetics (১৯২৮)
৫। বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২৯)
৬। ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৯)
৭। Indo Aryan and Hindi (১৯৪২)
৮। Language and the Linguistic Problems (১৯৪৩)
৯। ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা (১৯৪৪)
১০। Dravidian (১০৬৫)
১১। Phonetics in the Study of Classical Language in the East (১৯৬৭)

১২। বাঙ্গাঁলা ভাষা প্রসঙ্গে (১৯৭৫)
১৩। On the Development of Middle Indo Aryan প্রভৃতি।

তাঁর এসব অসামান্য গ্রন্থগুলির পরতে পরতে ভাষা বিজ্ঞানী ছাড়াও অন্য এক সুনীতিকুমারকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর Language and Litenatures of Modern India (১৯৬৩) গ্রন্থে তিনি আধুনিক ভারতীয় সমস্ত সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ইনিই হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যিনি প্রথম আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে প্রত্যেকটি সাহিত্যকে তার নিজের ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে 'যুক্ত করে', তার নিজস্ব লিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে যে বৈজ্ঞানিক বিধিবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন তা অন্যত্র দুর্লভ।

পরিশেষে একথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা যায় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ধরেই আধুনিক ভারতে নতুন উদ্যমে ভাষা সংস্কৃতি চর্চার পথা চলা শুরু হয়।

পরবর্তীকালে অন্যান্য মনীষীর প্রচেষ্টায় তাঁর এই সৃজনশীল ধারা আরো বেশী সমৃদ্ধ হয়। জুল ব্লকের কাঠামো অনুসরণ করে তিনি যে বিখ্যাত ODBL গ্রন্থ রচনা করেন, সেই পথই অনুসরণ করে ভারতের অন্যান্য নব্য ভারতীয় আর্যভাষারও বিশেষণ হতে থাকে। যেমন ড. উদয়নারায়ণ তেওয়ারী রচনা করেন 'The Origin and Development of Bhujpuri; ড. বাণীকান্ত কাকতী রচনা করেন 'Assames, its Formation and Development', ড. বাবুরাম সক্সেনা লেখেন 'Evolulion of Awadhi' এবং ড. সুভদ্র ঝা লেখেন 'The Formation of Maithili'। আর এভাবেই তিনি ভারতীয়দের মধ্যে ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার ঢেউ তুলেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই প্রাচীন ভারতের ভাষা-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ গৌরব পুনরুজ্জীবিত হয়। তাই তিনিই হলেন আধুনিক ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার পথিকৃৎ।।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ড. রামেশ্বর শ' 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা' ১৫ আগষ্ট ১৯৯২, পৃষ্ঠা ১৫৮
২। Dr. Suniti Kumar Chatterjee : The Origin and Development of the Bengali Language, London : George Allen & Unwin Ltd., 1970, Preface, P. XIII.
৩। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'সাংস্কৃতিকী', (২য় খণ্ড), ১৩৭২ পৃঃ ১৭৫
৪। Dr. Suniti Kumar Chatterji; 'The Origin and Development of the Bengali Language'. George Alen & Unwin, 1970, PP.18-19.
৫। Dr. (Mrs) Sukumari Bhatacharya : 'Suniti Kumar Chatterji : Scholarship and Personality' in Suniti Kumar Chatterji. The Schooler and the Man, Calculate : Jignase, 1970
৬। ড. পরেশচন্দ্র মজুমদার—আধুনিক ভারতীয় ভাষাপ্রসঙ্গে, ১৯৮৭
৭। ড. সুকুমার সেন—ভাষার ইতিবৃত্ত
৮। ড. প্রকাশ কুমার মাইতি—'আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা'।

সমাজভাষা : প্রসঙ্গ আধিপত্য

সোমনাথ চক্রবর্তী

মানবমনের ভাব প্রকাশের ভিত্তি হল ভাষা। প্রকাশিত ভাবের সামাজিক ক্ষেত্রে সঞ্চারও ঘটে থাকে ভাষার মাধ্যমেই। এমন কোনো মানবসমাজ কল্পনাতীত, যেখানে ভাষার মাধ্যমে ভাবের সৃষ্টি ও সঞ্চরণের অস্তিত্ব নেই। সমাজভাষার আলোচনার এলাকা মূলত প্রস্তুত হয় নানাবিধ সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে ভাষার আন্তসম্পর্ককে ঘিরে। সেক্ষেত্রে ভাষাকে একটি কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তা প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি চিহ্নসমষ্টির নির্মাণ। বৈচিত্র এর অন্যতম উপাদান ও নিয়ন্ত্রকরূপে সর্বদা সক্রিয় থাকে। আর সমাজভাষার ই বৈচিত্র্য নির্ধারণের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, এমনকি ভৌগোলিক পরিবেশের ও পরিস্থিতির বিভিন্নতাও কার্যকরী ভূমিকা নেয়। সমাজভাষাকে কোন সমাজের নির্দিষ্ট শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহের প্রতিনিধিত্বও করতে দেখা যায়। আর এই পরিসরটিই এর ব্যবহারিক দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যুক্ত করে দেয়—তা হল সমাজ তথা রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন কাঠামোর বিভিন্ন আদর্শ বা মতবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে ভাষাকে বেছে নেওয়ার প্রবণতা। সমাজের প্রভাবশালী বা আধিপত্যকামী গোষ্ঠীর ধারণা প্রতিষ্ঠা করা এবং তাকে সচল রাখার জন্য ভাষিক ক্ষেত্রগুলি যেভাবে ব্যবহৃত তা স্বাভাবিক ভাবেই সমাজভাষার আলোচনার মধ্যে এসে পড়ে। আধিপত্যের ধারণা কীভাবে সমাজভাষার বলয়ে ক্রিয়াশীল থাকে, তার আলোচনার পূর্বে আলোকপাত করা প্রয়োজন আধিপত্যবাদের সেই মডেলটির উপর, যা পৃথিবীর অধিকাংশ সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় গতিশীল থাকে।

আধিপত্য বা হেজিমনি (Hegemony) বিষয়ক ধারণাটিকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে এর তাত্ত্বিক নির্মাণ হয়েছিল ইতালিয় দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামসির হাত ধরে। যদিও এই বিষয়টির আভাস কিছুটা হলেও লেনিনের রচনায় ছিল। গ্রামসি তাঁর 'প্রিজন নোটবুকস' এ ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আধিপত্যের ধারণাকে যথার্থভাবে সামনে এনেছিলেন। এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে কীভাবে সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণি তার কর্তৃত্ব বা আধিপত্যের নির্ধারকগুলি নির্মাণ করে। তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজের পর্যবেক্ষণে তার উপলব্ধি ছিল যে সিভিল সোসাইটি বা তার ভিতরে থাকা বুর্জোয়াদের আধিপত্য অর্থনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যান্য সামাজিক স্তরেও প্রসারিত হয়। সামগ্রিকভাবে ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী বা শ্রেণি তাদের প্রভুত্বের নির্ধারকগুলিকে বৃহত্তর আঙ্গিকে তৈরি করে এবং তাকে বজায় রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, একে পুনরুৎপাদিতও করে থাকে। অর্থাৎ "আধিপত্য এমন একটি ধারণা যা আমাদেরকে কীভাবে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কের দ্বারা শ্রেণী সম্পর্কে তৈরি হয় তা বুঝতে সাহায্য করে। আধিপত্য তাই Class specific."[১] গ্রামসির ব্যাখ্যা অনুযায়ী যেকোনো রাষ্ট্রশক্তির ক্ষমতায় টিকে থাকার পিছনে বহুবিধ বলপ্রয়োগ সক্রিয় থাকে। রাষ্ট্রের জনগণের উপর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য কায়েম করতে রাষ্ট্রকে আধিপত্যের

প্রতিষ্ঠাও অনুশীলনের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। যার মাধ্যমে ক্ষমতাধারী গোষ্ঠীর মতাদর্শ, ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাচেতনা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রচেষ্টা থাকে। গ্রামসি ঠিক এই প্রসঙ্গেই সামাজিক মূল্যবোধ নির্মাণের কথা বলেন। যাতে দেখা যায় ক্ষমতাসীন শাসকের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক মূল্যবোধ এমনভাবে প্রচারিত হয়, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মান্য মূল্যবোধ হিসেবে মর্যাদা পায়। এইকথা আরও বেশি করে খাটে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। এর ফলে রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনগণের আনুগত্য অর্জন ও তাদের শোষণের পথ প্রশস্ত হয়। আধিপত্যের অনুশীলন যত নিখুঁত হয়, ততই সাধারণ জনগণ শাসকের চিন্তাচেতনাকে সমাজে প্রচলিত স্বাভাবিক বলে মেনে নেয় এবং পরোক্ষে শাসকের হাতকে মজবুত করে তোলে। তবে এই 'মেনে নেওয়া' কখনো স্বাভাবিকভাবে হয়, আবার কখনো তাতে প্রাতিষ্ঠানিক বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফরাসি দার্শনিক লুই আলথুসার যে মতাদর্শগত রাষ্ট্রযন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পারিবারিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইন বিভাগ ইত্যাদি। সেগুলি রাষ্ট্রের মতাদর্শ প্রসারের কাজে ব্যবহৃত হয়। আলথুসারের মতে পুলিশ, প্রশাসন, আইনসভা, সৈন্যবাহিনী, বিচারসভা ইত্যাদি দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পারিবারিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইন বিভাগ ইত্যাদি। সেগুলি রাষ্ট্রের মতাদর্শ প্রসারের কাজে ব্যবহৃত হয়। আলথুসারের মতে পুলিশ, প্রশাসন, আইনসভা, সৈন্যবাহিনী, বিচারসভা ইত্যাদি দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের পাশাপাশি মতাদর্শগত আধিপত্যের প্রসার জরুরি হয়ে পড়ে। আর এই ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় ভাষা।

ভাষা যেহেতু একটি সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়, সেহেতু এর মাধ্যমে আধিপত্যকারী মতাদর্শের বিস্তারের কাজ সহজ হয়। সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের ভিতরে অবস্থান করার ফলে ভাষার মধ্যে যে স্পেস পাওয়া যায়, তাকেই শাসকেরা কাজে লাগিয়ে থাকে। এর ফলে ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে যায় ভাষার একটি নিজস্ব মতাদর্শগত অবস্থান। এক্ষেত্রে ক্ষমতা কাঠামোর সাথে ভাষার আধিপত্যের ধারণার যোগ নিবিড়। যেকোনো শাসনকাঠামো ক্ষমতা বজায় রাখতে গেলে তাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভাষার বৃত্ত তৈরি করে নেয়। ফলে ভাষারও একটি প্রভাবশালী অবস্থান নির্মিত হয়ে যায়। আর তা থেকেই জনমানসের ভাবনা, মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। অর্থাৎ যেকোনো সমাজে জনগণের বৃহত্তর একটা অংশের মধ্যে যে চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি হয়, বলা ভালো উৎপাদন হয়, ক্ষমতাই তার প্রধান উৎপাদকের কাজ করে। আর তা হয় ভাষার মাধ্যমেই। এটি ঐতিহাসিক ভাবে সত্য। শুধু আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোতে নয়, প্রাচীনযুগে রাজতন্ত্রেও প্রভুত্বকারী অংশ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থে কর্তৃত্বের পথ মসৃণ করতে সমাজের উপর চাপিয়ে দিত নিজেদের ভাবনা, মূল্যবোধ। এখান থেকেই 'মতাদর্শ' শব্দটির সাথে আধিপত্যের যোগসূত্র। সমাজভাষার অন্তর্কাঠামো বিশ্লেষণে এর সঙ্গে অর্থনীতির গভীর যোগ ধরা পড়ে। সমাজভাষার প্রায়োগিক

স্তরে অর্থনীতি একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে। আর সেজন্যেই সমাজে প্রচলিত অর্থনীতির সমান্তরালে ভাষারও একটি অবয়ব গড়ে ওঠে, যেখানে বিনিময়, ভোগ এবং বন্টনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এখানে একটি প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় কীসের বিনিময়, কীসের ভোগ? একটি সমাজে ভাষা প্রতিনিয়ত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন রূপ নেয় এবং বিনিময় প্রক্রিয়ার ভিতরে প্রবেশ করে। তাহলে বলা চলে যে সেই ভাষায় কথা বলা মানুষেরা কখনো না কখনো ভোক্তার ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা ভাষার রসদ বা ধারণক্ষমতাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা ভাবে বন্টন করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে পুঁজির প্রসারের ব্যাপকতায় ভাষার এই ব্যাখ্যা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আর সেজন্যেই পুঁজিবাদী এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির হাতে কুক্ষিগত থাকার ফলে এই উত্তর ঔপনিবেশিক সময়েও ঔপনিবেশিক ভাষা সহজেই সমগ্র বিশ্বজুড়ে জাঁকিয়ে বসতে থাকে ক্রমাগত। ভাষার সঙ্গে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক আছে বলেই সমাজভাষাকে একটি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় নিরন্তর। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে, শিল্প-কৃষি-বাণিজ্য-পরিবহন-প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে, তার দাবি মেনেই সমাজভাষায় শব্দভাণ্ডার, প্রকাশভঙ্গি বদলে যায়। এই বদলে যাওয়ার পরিসরেই আধিপত্যকারী শক্তি ভাষার শরীরে নিজস্ব চিন্তাচেতনার বীজ পুঁতে দিতে সচেষ্ট হয়। পৃথিবীর যে কোনো সমাজেই শাসক গোষ্ঠীর যতই পরিবর্তন হোক না কেন, শোষণের মূলগত চরিত্র যেমন বদলায়না, তেমনি বদলায়না তাদের আধিপত্য কায়েমের প্রবণতা। নতুন শাসকের অর্থ নতুন মতাদর্শের আমদানি। স্বভাবতই তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহৃত হতে হয় ভাষাই।

আমরা যেসমস্ত শব্দ বা বাক্য প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার করে থাকি তা সবসময় একই অবস্থানে থাকেনা। রেজিষ্টার অনুযায়ী এর ভিন্নতার কথা বাদ দিয়েও বলা চলে যে বাচনের এলাকা বা যাকে ভাষাবিজ্ঞানে ডিসকোর্সের ক্ষেত্র বলা হয়, সেই স্তরে এসে বাক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। বাক পদ্ধতির যে সাধারণ তিনটি সূত্র সমাজভাষাবিজ্ঞানে স্বীকৃত, তার মধ্যে অন্যতম হল ভাষাবিজ্ঞানী আরভিন ট্রিপ কথিত বিকল্প সূত্র। যা অন্যান্য দুটি সূত্র (পারম্পর্য সূত্র এবং সঙ্গতি সূত্র) অপেক্ষা আধিপত্যকামী মতাদর্শকে বেশি সুযোগ করে দেয়। এই সূত্র অনুযায়ী বলা হয় ভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তির কাছে ভাষা ব্যবহারের যে বিকল্পগুলি থাকে, তার মধ্যে থেকে সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেকোনো একটিকে নির্বাচন করতে হয়। যা পরবর্তীতে তার ভাবপ্রকাশের, তথা মতপ্রকাশের মাধ্যম হবে। এই বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সমাজভাষার মূল ভিত্তি যেহেতু সমাজ, তাই সমাজের ভিতরকার কোনো লিঙ্গগত, জাতিগত অথবা বর্ণগত বিভেদ-বৈষম্য সমাজভাষার শরীরে প্রতিফলিত হয়। সেখানকার অবস্থানগত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভাষাকেও প্রভাবিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত ভাষার মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অবহেলা, অবদমন এবং শাসন

আকাঙ্ক্ষা অতি তীব্র ভাবেই তার অস্তিত্বের জানান দিয়ে যায়। সামাজিক লিঙ্গগত স্তরায়ন এভাবেই তার আধিপত্যের স্বাক্ষর রেখে দেয়। আবার সমাজভাষার আলোচনা যখন দ্বি-ভাষিকতার এলাকায় প্রবেশ করে তখনো ভাষার একটি অংশের উপর একই সমাজের অপর একটি ভাষার আধিপত্য সৃষ্টির প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে দুটি ভাষা অনেক সময় পাশাপাশি অবস্থান করে। তখন—"পাশাপাশি অবস্থানের ফলে তাদের ভাষা-ভাণ্ডারে পরিবর্তন ঘটে, কোনো কোনো সময় দুই ভাষাগোষ্ঠী একে অপরের ভাষা শেখে, কোনো কোনো সময় আধিপত্যকারী ভাষা ভাষা-সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শেখে"।[২] এরকম ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বা সংখ্যালঘু ভাষাটি নিজের স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং ক্রমশ প্রভাবশালী ভাষাটির অনুসারী একটি ভাষায় পরিণত হয়। একটি ভাষার আধিপত্যের প্রসারে অন্য ভাষার উপর তৈরি হওয়া সংকট বর্তমানে ক্রমবর্ধমান।

আধিপত্যের অনুশীলনে যখন ভাষা একটি সক্রিয় মাধ্যম হিসেবে কার্যকর থাকে, তখন উপভাষার উপর আক্রমণ নেমে আসে। মান্যভাষার ধারণা তৈরি করতে গিয়েই এর সূত্রপাত। সমাজভাষাগত বিচারে যেকোনো ভাষার যে কয়টিই উপভাষা থাক না কেন, তার কোনোটিকেই প্রধান বা মুখ্য বলা যায় না। রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে প্রতিটিরই স্বতন্ত্র অবস্থান থাকে। কিন্তু যখনই মান্য ভাষা তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখনই দেখা যায় কোনো একটি উপভাষাই প্রাধান্য পেতে পেতে ক্রমশ মান্যতা পেতে শুরু করে। বাকি উপভাষাগুলি তার অধীনস্ত উপভাষারূপেই পরিচিতি পেয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মান্যভাষার একটি বিভাজক ক্রিয়া (Separatist function)থাকে, যা অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এর বিরোধকে উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেয়। তখন একটি পৃথক একটি সত্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৩] আর এর পিছনে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কারণ সম্মিলিতভাবে সক্রিয় থাকে। বর্তমানে বাজার অর্থনীতির প্রসার, পুঁজির বাড়বাড়ন্তের ফলে সমাজের ক্ষমতা রূপ ও সামাজিক সম্পর্কের যে বদল ঘটে, তা সৃষ্টি করে নতুন এক আদর্শের। আর এর ফলেই তৈরি হয় মান্য ভাষার ধারণা বহু ভাষারূপের সামাজিক অস্তিত্ব বাজার অর্থনীতির ক্ষতি করে, লাভের হার কমিয়ে তাকে দুর্বল করে। পুঁজি তার নিজের স্বার্থেই লালন করে যাবতীয় এককেন্দ্রিকতার এবং সাধারণীকরণের প্রবণতাকে। ভাষাও এর থেকে বাদ পড়ে না। তৈরি হয় 'সকলের জন্য' একটি মান্যভাষা। এর সামাজিক-রাজনৈতিক কারণটিও গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিকভাবে শিক্ষা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভাবশালী বা তথাকথিত 'এগিয়ে থাকা' অঞ্চলের মানুষের ভাষাই স্বীকৃতি পায়। "মান্য ভাষা তৈরি হবার ছক এটাই। প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই মান্য ভাষা এভাবে তৈরি হয়েছে। আর এই যে প্রচলিত উপভাষাগুলির মধ্যে থেকে একটাকে মান্যায়ন (standardized) করে দেওয়া হয়, এর ফলে ঐ উপভাষাটা সমস্ত বাক সম্প্রদায়ের কাছে একটা অতি-ঔপভাষিক (supra-dialectical) জায়গা পায়। একে মনে করা হয় ঐ বাক্ সম্প্রদায়ের সমস্ত উপভাষা-সমাজোপভাষার ওপরে শ্রেষ্ঠ ভাষা। এই বুলি ব্যবহার করা ব্যক্তি, সামাজিক

সম্মানের অধিকারী হয়ে ওঠে। এইভাবে পুঁজিবাদ নিজের বাজারের প্রয়োজনে যে ভাষারূপকে মান্যতা দেয় তা আসলে হয় বাজারের স্বার্থবাহী ভাষা। মান্য ভাষাও এই বাজারে এক ধরনের 'পুঁজি (capital), যার ব্যবহারে অথবা যা থাকলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাজারের প্রতিযোগিতায় নামার যোগ্যতা পাওয়া যায়। একজন ব্যক্তি মানুষ বাজারে প্রবেশাধিকার পায়। সেই ব্যক্তি মানুষটার মুখের ভাষা, বা মায়ের মুখের ভাষারূপ বা বাড়িতে ব্যবহারের ভাষারূপ যাই হোক না কেন, বাজারের প্রতিযোগিতায় নামতে গেলে, বাজার-সর্বস্বতায় টিকে থাকতে গেলে শিখতেই হবে এই 'মান্যভাষা'র রূপতত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্ব"।[৪] বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাঢ়ি উপভাষাকে প্রায় অপরিবর্তিত রেখে মান্যভাষার নাম দেওয়া হয়েছে। বাংলার অন্যান্য উপভাষাগুলি ক্রমশ যেন তার অধীনস্ত হয়ে পড়েছে। সেই ভাষাটিও তার উপভাষাগত পরিচয়কে ছাপিয়ে 'মান্য চলিত বাংলা' হিসেবেই চর্চিত হয়ে চলেছে। এভাবেই মান্যভাষার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আধিপত্যের প্রসারের প্রক্রিয়া চালু থাকে। বাকি ভাষাগুলি ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে, প্রান্তিক হয়ে পড়তে থাকে। এই পর্যায়ে নিজেদের ভাষাকে অশিষ্ট বলে মনে করতে থাকেন সমাজের একটা বড় অংশ এবং তারা ধীরে ধীরে চলে আসেন মান্যভাষার ছাতার তলায়। এইভাবে তারা নিজেদের অজান্তেই আধিপত্যের অনুশীলনের শিকার হয়ে যান। এই পুরো বিষয়টিই অনুশীলিত হয় অত্যন্ত সংগঠিতভাবে। ভাষাবিজ্ঞানী আউনার হাউগেনের মতে কোন ভাষারূপ মান্যভাষা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর তার সংহতিকরণ, প্রয়োগ এবং প্রসার এই পর্যায়গুলির মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট ভাষাটির সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। মান্যভাষার লিপি তৈরির (ভাষাবিজ্ঞানে যাকে লিপায়ন বলে) কাজ সম্পন্ন হলে তার জন্য নির্দিষ্ট ব্যাকরণ তৈরি (ব্যাকরণায়ন) এবং শব্দ প্রয়োগবিধি (শব্দায়ন) তৈরি হয়, রচিত হয় মান্যভাষার অভিধান।[৫] এরপর সরকারি ক্ষেত্র, বিভিন্ন মিডিয়া, আইন-আদালত, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার্য একমাত্র ভাষারূপে মান্যভাষাটির ভাষাটির প্রয়োগ ঘটানো হয়। এই প্রক্রিয়া যত সংগঠিতভাবে হয়, ততই এর আধিপত্যগত বা বলা ভালো মতাদর্শগত অবস্থান শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

একথা ঠিকই যে মান্যভাষা একই ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে সংযোগের মাধ্যম হিসেবে সপলভাবে কাজ করলেও এই একীকরণের ফলে স্পষ্ট হয় আধিপত্যসূচক বিভাজন। কারণ সামগ্রিক সত্তার প্রতীক হয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে কখনো ক্ষুদ্র কোনো ভাষা, আবার কখনো বা উপভাষাগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অবদমনের ইতিবৃত্ত। তবে গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য কখনো কখনো আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উপভাষাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সেক্ষেত্রে স্থিতিশীল দ্বি-ভাষিকতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজভাষা এবং আধিপত্যবাদের পারস্পরিক সম্পর্কটি জটিল এবং একইসঙ্গে বহুরৈখিক। সমাজভাষা নির্মাণের বিভিন্ন পর্যায়ে আধিপত্যের ধারণারও নির্মাণ চলতে থাকে। এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। সামাজিক-রাজনৈতিক সমীকরণের প্রসঙ্গটিও। সমাজ, শাসক বা মতাদর্শের ভেদে

ভাষার উপর এই আধিপত্যের প্রকার হয়ত বদলায়, কিন্তু ভাষার পক্ষে আধিপত্যের প্রভাবকে সম্পূর্ণ পরিহার করা কার্যত কখনোই সম্ভব হয়না। ফলে সমাজভাষার আধিপত্যবাদের সম্প্রসারণ বহমানই থেকে যায়।

তথ্যসূত্র ঃ

১। চৌধুরী ফকরুল (সম্পাদিত)-'গ্রামসি : পরিচয় ও তৎপরতা', সংবেদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১২। পৃঃ-১৪৪।

২। নাথ মৃণাল—'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯। পৃঃ -২৪৫।

৩। নাথ মৃণাল-প্রাগুক্ত। পৃঃ ২৮০

৪। সরকার শান্তনু—'আধিপত্য ও বাংলা ভাষা', বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, সেপ্টেম্বর, ২০০৭। পৃঃ-১১।

৫। নাথ মৃণাল-প্রাগুক্ত। পৃঃ-২৭৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ঃ

চৌধুরী ফকরুল (সম্পাদিত)-'গ্রামসি : পরিচয় ও তৎপরতা', সংবেদ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০১২।

নাথ মৃণাল—'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯।

ভট্টাচার্য রামকৃষ্ণ—'বাংলা ভাষার ভূতভবিস্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ', অবভাস, কলকাতা, দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০৮।

সরকার পবিত্র-'ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৯।

সরকার শান্তনু—'আধিপত্য ও বাংলা ভাষা', বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, সেপ্টেম্বর, ২০০৭।